তিনশতকের রিষড়া
ও
তৎকালীন সমাজ চিত্র

প্রথম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

প্রথম প্রকাশ ঃ
গুরু পূর্ণিমা
৬ই শ্রাবণ, ১৩৮২

প্রকাশক ঃ
রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
পরিষদের পক্ষে —
যুগ্ম-সম্পাদক :
শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী,
শ্রীরমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।
প্রেম-মন্দির। ৫নং শ্রীমানি
ঘাট লেন, রিষড়া হুগলী।

প্রচ্ছদ পট :—
শিল্পী—শ্রীপশুপতি কুণ্ডু।

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীশ্যামল কুমার দেব।
স্মৃতি প্রেস।
৩নং জি, টি, রোড,
কোন্নগর, হুগলী।

ব্লক মুদ্রণ ঃ
অনিমা প্রিণ্টার্স,
রাজা রামমোহন শরণী
শ্রীরামপুর।

প্রাপ্তি স্থান :—
প্রেম-মন্দির, রিষড়া। ও
বাণী বিতান।
৩৬নং জি, টি, রোড, রিষড়া।

উৎসর্গ

ইতিহাস রচনার প্রেরণা ও অনুরাগী সহায়ক প্রাণাধিক কনিষ্ঠপুত্র

শ্রীমান সমিৎ কুমার পাকড়াশীর

— স্মৃতির উদ্দেশ্যে —

জন্ম : ৬।১২।৫৬ মৃত্যু : ১৫।৮।৭২

রিষড়া।
৩৫ নং দেওয়ানজী ষ্ট্রিট,
(হুগলী)
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৮২।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী "তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র" নামে যে মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার ভূমিকা লেখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বস্তুতঃ এ গ্রন্থের কোন ভূমিকার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি রিষড়াকে উপলক্ষ্য করে আমাদের দেশের সেকালের যে সমাজচিত্র তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন, তা একবার পড়তে বসলে রসিক পাঠক শেষ না করে উঠতে পারবেন না। তথাপি বন্ধুর উপরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না তাঁর অভিপ্রায় বোধহয় স্বরচিত গ্রন্থের সঙ্গে এই দীন লেখকের নামও সংযুক্ত করে আমাকে তিনি আপেক্ষিক অমরতা দান করেন।

যে জাতির অতীত অন্ধকার, সে জাতির ভবিষ্যতের আশাও খুব অল্প। বাঙ্গালীর অতীতই ছিল সমুজ্জ্বল। কিন্তু ইতিহাস বিমুখ বাঙ্গালীর অনাদরে উপেক্ষায় বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস আজ অজ্ঞাত বলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙ্গালীকে ইতিহাস রচনা করতে অনুরোধ করে যান। হাজার হাজার বছরের এই সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে মাত্র পাঁচশো বছর আগে আবির্ভূত একমাত্র শ্রীচৈতন্য দেব ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় বাঙ্গালীর নাম ভারত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? আমাদের অবহেলায় এই পাঁচ শতকের ইতিহাসও অধিকাংশ বিক্ষিপ্ত, আংশিক বিস্মৃত ও অবশিষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত। কৃষ্ণ বাবু সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে তাঁর জন্মভূমির তিন শতকের ইতিহাস উদ্ধার করে বাঙ্গালী মাত্রকেই আশ্বস্ত করেছেন। নিভৃত ক্ষুদ্র শহরে লোকলোচনের অন্তরালে থেকে পরিণত বয়সে তিনি যে রূপ নিবিষ্ট ভাবে পুরাতন পত্র-পত্রিকা-পুস্তকাদির সহায়তায় জন্মভূমির ঋণ পরিশোধের জন্য

বঙ্গবাণীর অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলী পাবার অধিকারী এ কথা নিঃসংশয়ে আমি বলতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক গেজেটিয়ার ও নীরস পাঁজি পুঁথি এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে পবিত্র জাহ্নবী তটে অবস্থিত রিষড়া তথা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞাতব্য — তা সে রিষড়া নামের উৎপত্তি থেকে, লোক বসতি, সাহিত্য-সৃষ্টি, সমাজ-বন্ধন, সামাজিক অবস্থা, পূজা পার্বণ, জমিদারী, কবি পাঁচালী, মন্বন্তর, নীলচাষ, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রসঙ্গ, দাসপ্রথা, ছাপা কাপড়ের কারখানা, প্রথম চটকল, বর্গীর হাঙ্গামা, বহুবিবাহ, অবরোধ প্রথা, হুগলীর পতন ও কলকাতার অভ্যুদয়, দামোদরের বন্যা, শিক্ষা-পদ্ধতি, পদ্য ও গদ্য সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন কথা ও কাহিনী— যাই হোক না কেন গ্রন্থকার ৪১০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে সে সব সুনিপুণ ভাবে সঙ্কলিত করে গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করেছেন। একদা দিনেমার-দের শ্রীরামপুরের মতন, গ্রীক বণিকদের এই ক্ষুদ্র শহরের অতীতে কি ছিল এবং বর্তমানে এই শহরের রূপান্তর কিভাবে এখন চলছে গ্রন্থকার তাও সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন।

রিষড়ার সঙ্গে গ্রীকদের ভূমিকা স্বল্পকালের হলেও উল্লেখনীয়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে গ্রীক বাঙলায় আসেন, তার নাম আলেক্সিও আরগিরি। তাঁর আদি নিবাস ফিলিপ্পোলিস। তাঁকে অনুসরণ করে পরে বহু গ্রীক এদেশে আসে। তারা ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসাদার। তাই ইংরেজ বণিকগণ ঠাট্টা করে তাদের বলতো ফেরিওয়ালা। তাদের সনদের জোর ছিল না বলে ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার তাদের সাহায্য করতো এবং তাদের কথামত দিনেমার বহির্ভূত এলাকা রিষড়ায় গ্রীকদের ঘাঁটি হয়ে ছিল। তখন এদেশে কোন বিদেশী বণিকদের প্রার্থনার জন্য পাদরী ছিল না। মিঃ আরগিরি সর্বপ্রথম আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী আনার গৌরব অর্জন করেন। তাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলকাতায় তাঁকে গ্রীকচার্চ করার

অনুমতি দেন। ধর্মের দিক থেকে তারা ছিল খুব রক্ষণশীল। তারা অন্যান্য বণিকদের মতন এদেশের কোন লোককে ধর্মান্তরিত করেনি বলে এদেশে তারা বাঁচেনি। পরে এ দেশের গ্রীক নরনারী ইংরেজ প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

পলিথিনের কারখানা ও চটকলের জন্য বিখ্যাত এই শিল্পশহর একদা নীরব পল্লীগ্রাম ছিল। সে গ্রামের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হলেও গ্রাম্য দেবী সিদ্ধেশ্বরী সেই ৮১১ সাল থেকে আজও বিদ্যমান। কৃষ্ণ বাবুর পূর্ব পুরুষ বলরাম পাকড়াশীকে নবাব রেজা খাঁ ১১৭৭ সালে ১৮ বিঘা জমিদান করেন বলে একটি তায়দাদে উল্লেখ আছে। সেই ঐতিহাসিক দলিলখানি উর্দু ও বাঙলা ভাষায় লিখিত একটি সম্পদ বিশেষ। সেকালের গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবে দলিলটি মল্লিখিত "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণবাবু সেই তায়দাদ খনি স্বযত্নে রক্ষা করেন এবং তাঁরই সৌজন্যে উহা আমার গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়।

উত্তরে শ্রীরামপুর ও দক্ষিণে কোন্নগরের সঙ্গে শতাধিক বছর আগেও রিষড়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে পৌর সভা স্থাপিত হলে এই দুটি গ্রামও শ্রীরামপুর পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই কোন্নগর-রিষড়ার কীর্তিকলাপের কথা তখন শ্রীরামপুরের মধ্যে গণ্য করা হতো। এদের পৃথক ভাবে তখন কেউ দেখতো না। কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র, ডাঃ কে, ডি, ঘোষ প্রভৃতির জন্মের জন্য যে পরিচিতি বাঙলাদেশে ছিল, রিষড়ার ভাগ্যে সে রকম হয়নি বলে শ্রীরামপুর কোন্নগরের মতন এর প্রতিষ্ঠা না হলেও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের হিজলীর নিমক মহলের দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম এম, ডি, ডাঃ চন্দ্রকুমার দে, রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ

ঘোষ, কৈলাস চন্দ্র আশ (কবিয়াল) প্রভৃতি যে সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এই স্থানকে পবিত্র করে ছিলেন, কৃষ্ণবাবু সেই সব প্রসিদ্ধ বংশের ও তার সুসন্তানদের কথা লিপিবদ্ধ করে যে মহৎ কাজ করলেন, রিষড়াবাসী সে জন্য তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রিষড়ায় অনেক কলকারখানা স্থাপিত হলে এখানে পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে রিষড়া সাধারণের গোচরীভূত হয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন নিভৃতে নির্জন ধর্মানুশীলনের জন্য এখানে 'সাধনকানন' প্রতিষ্ঠা করেন।

সেকালের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে অনেক কথা কৃষ্ণ বাবু উল্লেখ করেছেন, আমি বিলাত থেকে প্রকাশিত হাঙ্গারফোর্ড সাহেবের 'ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ থেকে একটি লাইন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

The most cultured races and indisputably the most intellectnally advanced are the Bengalees (with whom may be associated the Marhatta Brahmins) and the Parsis — India by Col. Sir Thomas Hungerford Haldich (London). Pp-214.

আর বাঙলা সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেবের উক্তিটিও উল্লেখনীয়। তিনি লিখেছেন :

Bengalla is described by Vertomannus in the year 1303 as a place that in fruitfulness and plentifulness of all kinds may in manner contend with any city in the world.

গ্রন্থকার 'তৎকালীন সমাজচিত্র' দেখাবার জন্য বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার পরিপূরক হিসাবে দুটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তিও আমি এখানে উল্লেখ করলাম।

কৃষ্ণ বাবু উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা লর্ড মিণ্টো সেকালের বাঙালীদের পুরুষোচিত অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন সুন্দর মূর্ত্তি ও সুস্থ সবল উন্নত দেহ দেখে যে সুখ্যাতি করেছিলেন (পৃষ্ঠা ১৭৯) সেটিরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে বাঙালী এখন কোথায়?

বাঙ্গালীর প্রতিভা, বাঙ্গালীর বল বুদ্ধি, বাঙ্গালীর হৃদয় কেন সঙ্কুচিত হলো? বেশী দিন নয়, মাত্র তিন দশক আগেও হুগলীর ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে বাঙ্গালী দেখেছিলাম আজ স্বাধীনতার পর সে বাঙ্গালী গেল কোথায়? কোন্ যাদুমন্ত্রে 'the most cultured race' আজ তোষামোদ-প্রিয়তা, স্বার্থসাধনায় কুট কৌশল শিক্ষা, সামাজিক অনুদারতা, ধর্মেবিরূপতা ও হৃদয়হীনতার পারদর্শী হয়ে উঠলো। সেটাই এখন বিচার করার প্রয়োজন বলে কৃষ্ণবাবু তাঁর গ্রন্থে বাঙ্গালীর পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধির কথা লোকসমক্ষে উপস্থিত করেছেন একটি আশায় এবং সে আশা বাঙ্গালীর সম্বিত যাতে আবার ফিরে আসে।

যে বাঙ্গালী একসময় সর্বত্র সমাদৃত, সম্মানিত ও পুরস্কৃত হতেন, সেই বাঙ্গালী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালী জাতির ক্রটির বিষয় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, সেই ক্রটিগুলি সংশোধনের জন্যই শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী মহাশয়ের এই প্রয়াস। কবি লিখেছেন:

"আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ক্রটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করাই আমাদের পলিটিক্স, নিজের

বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।"

আর ভূমিকার বিস্তার করতে চাই না। এই ভূমিকায় উক্ত বিষয় ও অন্যান্য বিষয় পাঠক মূল গ্রন্থে পাঠ করে যুগপৎ প্রীত-পুলকিত ও হয়তো বা দুঃখিত হবেন। এবং তিন শতকের দেশের সমাজচিত্রের একটা পরিচয় পাবেন। গ্রন্থকার দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য mission work হিসাবে প্রভূত অর্থব্যয় করে এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল সুখপাঠ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করে তাঁর কর্তব্য করেছেন; এখন আমাদের কর্তব্য গ্রন্থটি কেবল রিষড়া বা হুগলী নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে যাতে বহুল প্রচারিত হয়, তার ব্যবস্থা করা। আমি মা-সিদ্ধেশ্বরীর কাছে কৃষ্ণবাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করে কবি সত্যেন্দ্র-নাথের কথায় শুধু একটি কথা নিবেদন করছি "মধুর চেয়ে আছে মধুর, সে আমার এই দেশের মাটি; আমার দেশের পথের ধুলা, খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।"

২নং, কালী লেন, কলিকাতা।
মিত্রাণী।
১৫/৬/১৯৭৫

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

লেখকের নিবেদন

পরম কারুণিক শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় এবং গ্রামাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রদত্ত প্রেরণা ও শক্তির ফলে দীর্ঘ-ঈপ্সিত ও আকাঙ্খিত রিষড়ার তিন শতকের ইতিহাস মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হওয়ায় লেখক হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক।

ইতিহাস লেখা আমার নেশা বা পেশা নয়, তবে কেন রিষড়ার ইতিহাস লিখতে বসলাম সে সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ হল যে ছেলেবেলায় স্বর্গীয় পিতৃদেবের মুখে রিষড়ার প্রাচীন ব্যক্তি ও ঘটনা সম্বন্ধে বহু গল্প কাহিনী শুনেছিলাম। সেগুলো তখন নিছক গল্প বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে পারি যদিও সে সমস্ত ঘটনার নির্ভর যোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারিনি।

এর পর ১৩৪৮ সালে (ইং ১৯৪১ খৃঃ) 'দি রিষড়া ক্লাব'—"রিষড়ার উন্নতির মূলে কাহারা? তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করায় তাতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে রিষড়ার উল্লেখ অত্যন্ত সামান্য ও সংক্ষিপ্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধের কোন ঘটনা বা খ্যাতনামা ব্যক্তিদের উল্লেখ কোথাও নেই, অন্ততঃ আজও খুঁজে পাইনি। সে সময় যে টুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, তাঁর মূলে ছিল কোন্নগর নিবাসী ঐতিহাসিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রিষড়ার স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় নরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত উপদেশ ও তথ্য প্রমাণাদি সম্বলিত কয়েকখানি পুস্তকাদি সম্বন্ধে নির্দেশ। এর সঙ্গে পেয়েছিলাম তৎকালীন রিষড়ার কয়েকজন প্রবীন ব্যক্তিদের কথিত বিবরণ যার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল দেওয়ানজী বংশের ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডুলিপি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সেই উদ্যম ও আশাতিরিক্ত সাহায্য আমাকে উক্ত দুরূহ কার্যে অগ্রনী হতে সাহসী ক'রে তোলে। তাছাড়া পেয়েছিলাম উত্তরপাড়া থেকে বৈদ্যবাটী পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলির

কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তকের সাহায্য। পৌরসভার প্রাচীন নথীপত্রও কিছুটা কাজে লেগেছিল। নানা কারণে এইখানেই থেমে যায় আমার ঐতিহাসিক মালমশলা সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আমার লিখিত প্রবন্ধটি প্রথমস্থান অধিকার করে এবং বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয় সত্য কিন্তু অর্থাভাবে সেটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁদের হস্তলিখিত পত্রিকা 'মিলনীতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ ক'রেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় ১৯৬৫ সালে শ্রীরামপুর পৌর সভার শতবার্ষিকী উৎসবের পর থেকে। জন্মলগ্ন থেকে (১৯১৫-১৯৬৫) পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে রিষড়া পৌরসভা সেই সময় স্বুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন :— "১৮৫৪ খৃঃ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের রিষড়ার সাংস্কৃতিক ও উন্নতি মূলক ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী।" সৌভাগ্যক্রমে রিষড়ার তিনজন অধিবাসী ছাড়াও নবাগত পূর্ববঙ্গবাসী একজন ইতিহাস-রসিক যুবকও এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু মূল্যবান তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। যার ফলে তিনজন বিশিষ্ট পরীক্ষকের মতানুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে পুরস্কার প্রদত্ত হয় :— প্রথম, শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী (বর্ত্তমান লেখক), দ্বিতীয় :— শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস, তৃতীয় :— শ্রীমণীন্দ্রনাথ আশ এবং চতুর্থ :— শ্রীললিত মোহন হড় (তিনি অবশ্য চতুর্থ পুরস্কার গ্রহণে অসম্মত হন)

এইভাবে উৎসাহিত হবার পর সম্পূর্ণ অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করি এবং উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য তালিকাভুক্ত হয়ে বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে এবং পুরাতন সংবাদ পত্রাদি ও বিভিন্ন গেজেটিয়ারের সাহায্যে বর্ত্তমান 'তিন-শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজ চিত্র' নামক ইতিহাস গ্রন্থটি প্রণয়নে যত্নবান হই। এই সময় ১৯৭২ খৃঃ আকস্মিকভাবে প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যু এবং দীর্ঘ ৪১ বৎসর ব্যাপী পৌর সভার কর্মসংস্থান থেকে অবসর গ্রহণ করার ফলে সাময়িকভাবে ইতিহাস রচনার কাজ বাধা প্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো দৈব অভিপ্রেত এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হওয়ায়

মানসিক স্থৈর্য্য অবলম্বনে পুনরায় রচনা কার্যে আত্মনিয়োগ ক'রে শোকের হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করি। পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত হলে দেখা দেয় কাগজের ও ছাপাখানার অগ্নিমূল্যতা। বাধ্য হয়ে তখন দেশবাসীর কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাই। তদনুযায়ী ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী "রিষড়া সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে রিষড়া প্রেমমন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রধান শিষ্য সুশিক্ষিত শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী এবং দেওয়ানজী বংশের শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক, রামকৃষ্ণ আশ্রমাধ্যক্ষ অভিজ্ঞ ও সুপরামর্শদাতা স্বামী সোমানন্দ সভাপতি এবং প্রাক্তন পৌর প্রধান ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। সদস্য হিসাবে আছেন আরও প্রায় ত্রিশ জন রিষড়ার প্রাচীন ও বিখ্যাত বংশের সুসন্তানগণ। স্থানীয় কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক রয়েছেন পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসাবে। আরও রয়েছেন বর্ত্তমান পৌর-প্রধান শ্রীযুক্ত যদুগোপাল সেন এবং পৌর সদস্য ও সেবাসদনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ঘটক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪১খৃঃ থেকে ১৯৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনার কার্যে রিষড়া এবং রিষড়ার পার্শ্ববর্ত্তী সহরের বহু প্রাচীন ও নবীন অধিবাসীগণের সাহায্য গ্রহণ করেছি তাঁদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভবপর নয়, সে ত্রুটী অবশ্যই মার্জনীয়। স্বর্গতঃ নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল কিশোরী মোহন ঘোষালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

কাহিনী ও তথ্যাদি সংগ্রহে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী শিবদাস মান্না, হরেন্দ্র কুমার দত্ত, মনীন্দ্র নাথ আশ, হৃষিকেশ পাকড়াশী এবং রিষড়া পৌর সভার রেকর্ড-কিপার স্নেহভাজন শ্রীরঙ্গনাথ দাস। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে এই দীর্ঘ ইতিহাস রচনায় ভুলত্রুটী থাকা স্বাভাবিক; সুধী পাঠকবৃন্দ সেই অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদ সংশোধন ক'রে নেবেন ইহাই কামনা করি। প্রুফ সংশোধনে অনভিজ্ঞতা বশতঃ কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ

রয়ে গেল, সে ত্রুটী অবশ্যই স্বীকার্য। নানা প্রকার সাময়িক বাধা ও কর্ম-কুশলতার অভাব সত্ত্বেও কোন্নগর স্মৃতি প্রেসের স্বত্বাধিকারী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি কর্মচারী মুদ্রণ কার্যে সর্বোতোভাবে সহযোগিতা করার জন্য তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

যাঁরা আশীর্ব্বাণী, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন— পরমপুরুষ স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ তারানন্দ ব্রহ্মচারী এবং মাতৃস্বরূপা পূজনীয়া বারাকপুর সর্বমঙ্গলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী পরমসাধিকা গোবিন্দমাতা। সুসাহিত্যিক শ্রীবিনয় ঘোষ, ঐতিহাসিক ৺সুবোধ রায় এবং শ্রদ্ধাভাজন পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন, শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগ, দেবদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নামও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখনীয়।

এই অকিঞ্চিৎকর আঞ্চলিক ইতিহাসের ভূমিকা লিখে দিয়ে যিনি গ্রন্থের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন সেই পরম সুহৃদ বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্রের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন একথা বলাই বাহুল্য।

শেষ মুহূর্ত্তে রিষড়া পৌরসদস্যবৃন্দ পরিষদের আবেদন ক্রমে এক হাজার টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশের আংশিক ব্যয়ভার এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথ সুগম ক'রে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। জনশিক্ষা প্রসার কল্পে তাঁদের এই মহৎ অনুদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখনীয়।

পুস্তকখানির অগ্রিম মূল্য হিসাবে যে সমস্ত নাগরিকবৃন্দ অর্থ সাহায্য ক'রে সহায়তা করেছেন তাঁরাও ধন্যবাদের পাত্র। যে কয়েকজন বিশিষ্ট দাতা শতাধিক টাকা দান ক'রে এই গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের নামোল্লেখ ক'রে আমার ঋণের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।

রিষড়ার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অধিবাসীরা এই ইতিহাস পাঠে যদি কিছু-মাত্র আনন্দিত ও উপকৃত হন এবং ভবিষ্যৎ গবেষণাকারীদের পথ কিছুটা সুগম ক'রে তোলে তাহলে আমার প্রাণপাত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করব। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই সংকলনটি কোন মৌলিক রচনা নয়; ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাদি একত্র ক'রে একটা মালা গাঁথার কাজ করেছি মাত্র। যোগ্যতর ব্যক্তি যদি সুরভিত কুসুমরাজি চয়ন ক'রে দেশ মাতৃকার চরণে পুষ্পাঞ্জলী দেন তবেই হবে রিষড়া মাতৃকার যথাযোগ্য পূজোপহার।

তথ্যগত ভুলত্রুটী সংশোধনের জন্যে গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হয়েছে, সুধী পাঠক বৃন্দ তদনুযায়ী সাল তারিখ গুলো সংশোধন ক'রে নেবেন এই কামনা করি।

ইতি—

রিষড়া। বিনীত

৩০ শে জুন, ১৯৭৫। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল পাকড়াশী

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৩	১৬৪৮ খৃঃ	১৬৯৮ খৃঃ ১০ই নভেম্বর।
১৮০	১৭৮০ খৃঃ	১৭৮৪ খৃঃ ৫ই আগষ্ট।
৩৫১	একজন ইউরোপীয় মহিলার।	একজন খৃষ্টান মহিলার।
৩৫২	১১-১১-১৫	১১-১-১৫

কৈফিয়ৎ

অনিবার্য কারণে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আনুমানিক ব্যয়ের ভিত্তিতে সংগৃহীত অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী (অর্দ্ধেক ছাপা অবস্থায়) প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হল না। ব্লক সমেত দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রায় ২৫০ পৃঃ পৃথক ভাবে প্রকাশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ায় সর্বসাকুল্যে আরও প্রায় দেড় হাজার টাকা ব্যয় হবে। এই খণ্ডটীর মূল্য ধার্য হয়েছে ৫৲ টাকা মাত্র। তালিকাভুক্ত গ্রাহকবর্গের নিকট তাই সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন অবস্থা বিবেচনায় অতিরিক্ত ৫৲ টাকা হারে অগ্রিম মূল্য দান করে আমাদের প্রারব্ধ কার্য অচিরে সমাধা করতে সাহায্য করেন। যাঁরা ইতিমধ্যে ১৫৲ টাকা বা ততোধিক অর্থ সাহায্য করেছেন তাঁরা দুটি-খণ্ডই বিনামূল্যে পাবেন।

উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তি-বর্গের নাম সূচী ও পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হয়েছে।

শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীরমেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক।

সূচীপত্র

(ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী)

(অষ্টাদশ শতাব্দী)

প্রথম স্তবক

(অষ্টাদশ শতাব্দী)

দ্বিতীয় স্তবক

(ঊনবিংশ শতাব্দী)

রায় বাহাদুর গোপাল চন্দ্র দাঁ—পৃঃ ৩৩৫

শ্রীদিলীপ কুমার দাঁর সৌজন্যে।

পঞ্চানন্দ মন্দির—১৯০৭

গৌড়ীয় মঠ, ১৯৬০
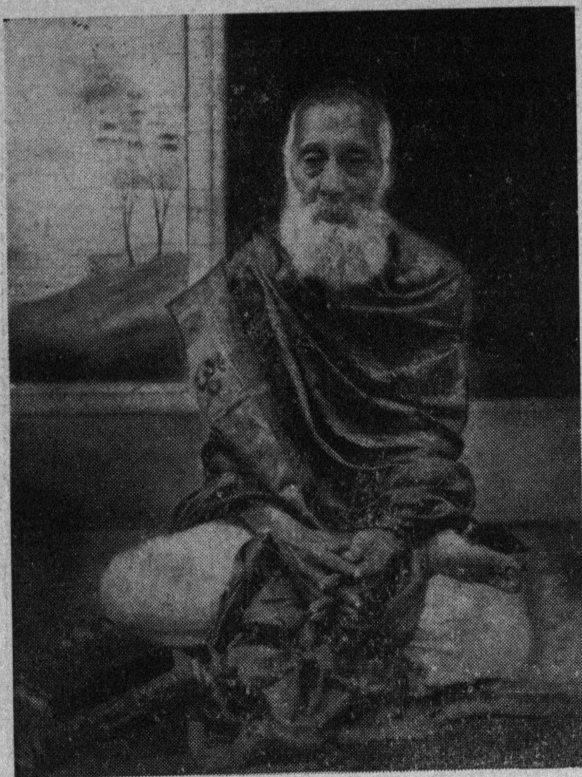
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে।
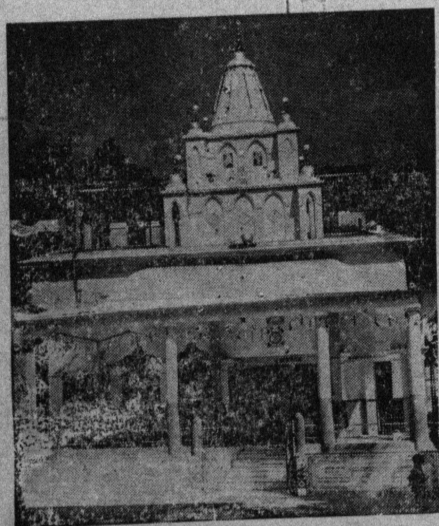
৺সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির
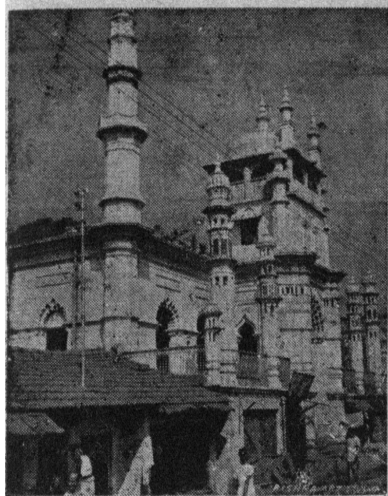
বড় মসজিদ ১৮৭০

বান্ধব সমিতির সাধারণ পাঠ মন্দির ১

অনাথ আশ্রম, ১৯০৮

পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যা
১৯৫৮ (চারবাতি)

কালীকুমার দে ঘাট, ১৮৯৩

কৈলাশ চন্দ্র লাহা ঘাট, ১৮৯৮
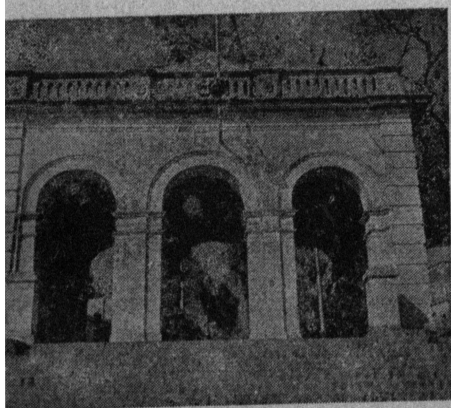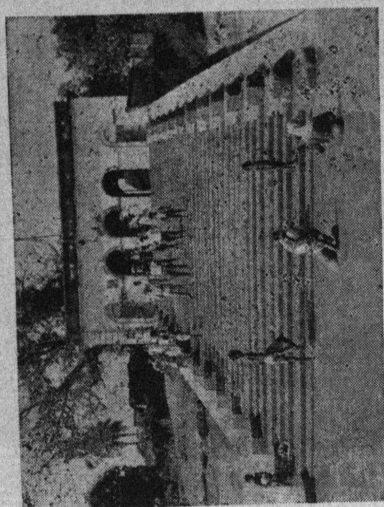
যদু পোদ্দার ঘাট, ১৮৯৭
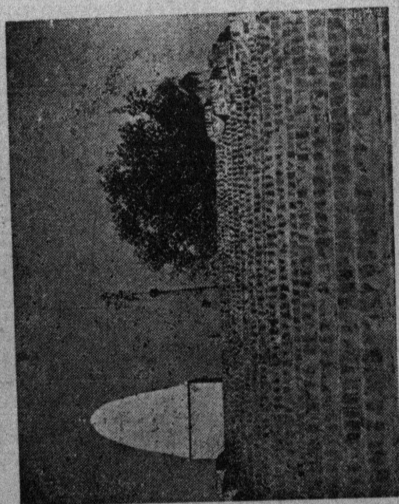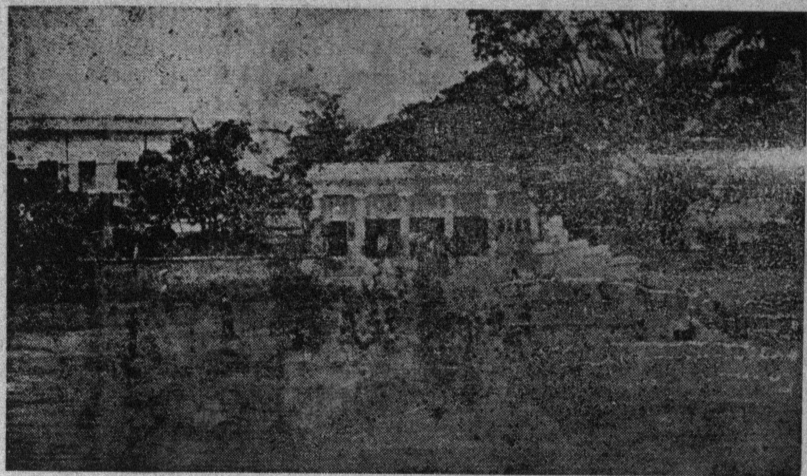
বিশ্বম্ভর সেন নির্মিত প্রাচীন ঘাট, (বর্ত্তমান রূপান্তরিত)

শ্মশান ঘাট, ১৯১৬

কালীকুমার দেবেক্সী কত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

বঙ্গ বিদ্যালয় ভবন, ১৮৫৭। পৃঃ ২৮০

পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির পৃঃ ৩১৪

৺বৈদ্যনাথ হালদারে পুত্রগণের সৌজন্যে
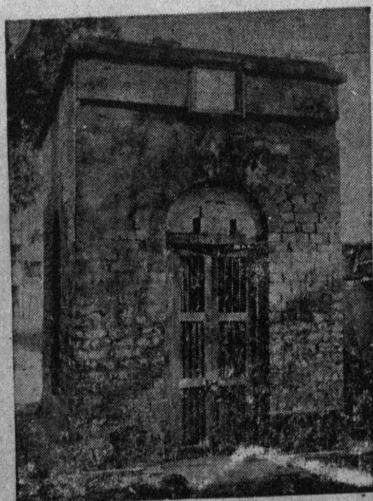
৺কালুরায় দক্ষিণরায় মন্দির, ১৯৩১

৺দ্বারিকানাথ দাসের ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করার সার্টিফিকেট
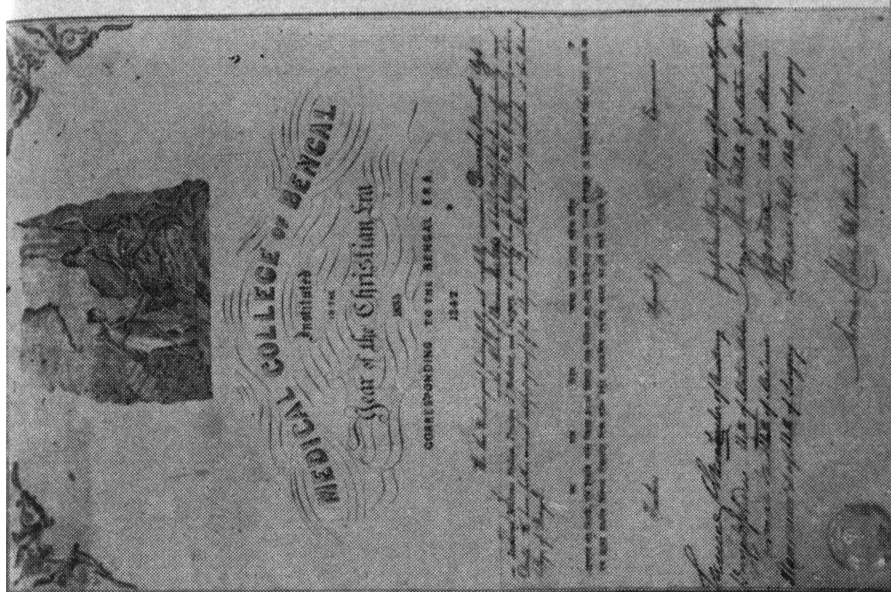
ডাঃ শ্রীবিশ্বনাথ দাসের সৌজন্যে—পৃঃ ৩৪৯

রায় সাহেব কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের সনদ—পৃঃ ৩৩৯
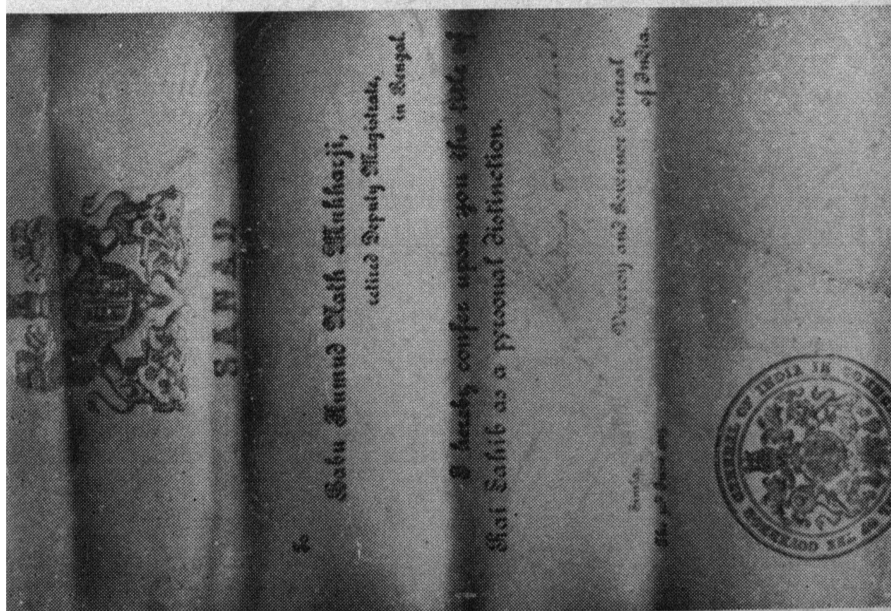
শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং পোষ্ট কার্ড

শ্রী হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

EAST INDIA POST CARD

THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

RAMPORE MUNICIPALITY.

...টার টেক্সের বিল।

বাসেন্দা, মেন

...টার ত্রৈমাসিক অর্থাৎ সন ১৮৭৩।৭৪ সালের এপ্রেল মে জুন মাহার

...কসের কিস্তি

টাকা আনা

শতকরা ৭।০ টাকার হিঃ

...রের দপ্তর।
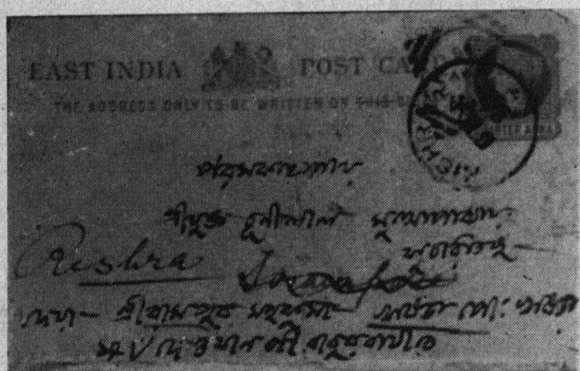
ডিমার ঘাটী লেন নামক ট্যাক্সবিল (১৮৭৩।৭৪) পৃঃ ১৫৬

ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র লাহা। পৃঃ ৩৫১

শ্রীধনঞ্জয় লাহার সৌজন্যে।

প্রাচীন মুদ্রা—পৃঃ ২৭০
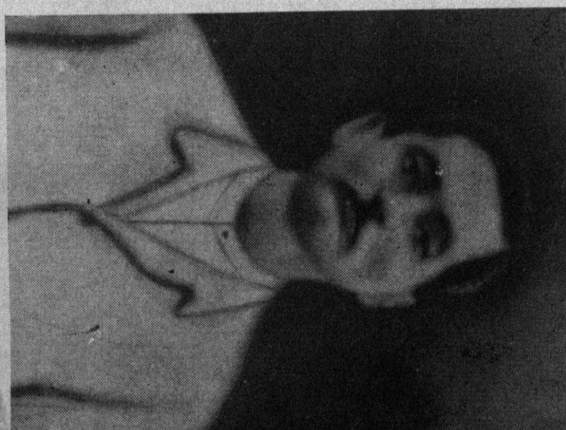
১, ২, ৩—নবাবী আমলের টাকা, ৪।৫ উইলিয়াম ফোর্থের মুদ্রা, ৬-৭ ভিক্টোরিয়ার টাকা,
-টেপুলি। ৯-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং পয়সা। ১০।১১ সিক্কা পয়সা। ১২-ডবল পয়সা। ১৩-আধ পয়স
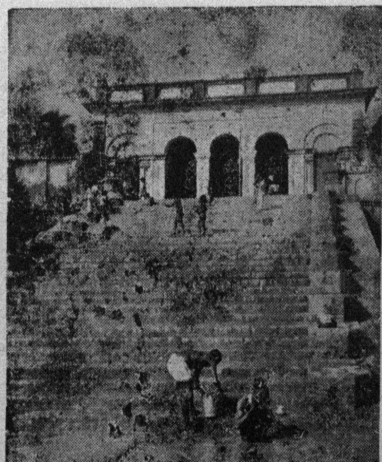
কৈলাসচন্দ্র লাহা প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান—পৃঃ ২৮৭
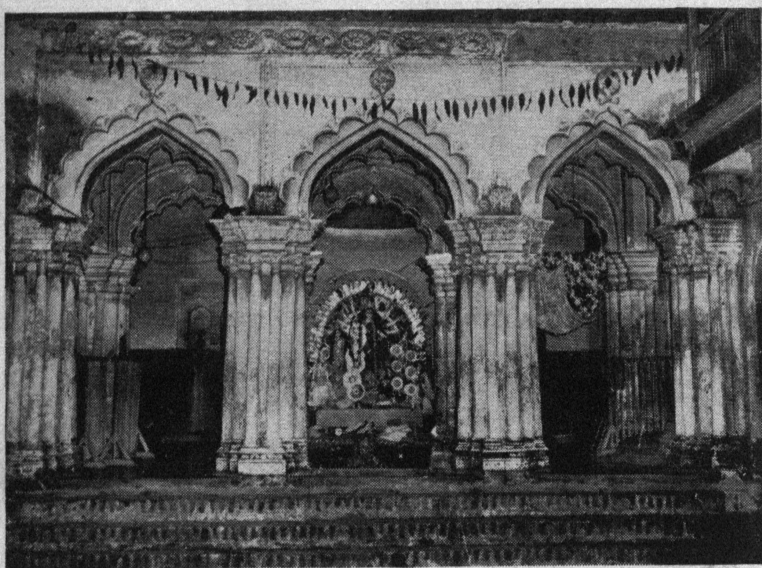
দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান— পৃঃ ১৭৪
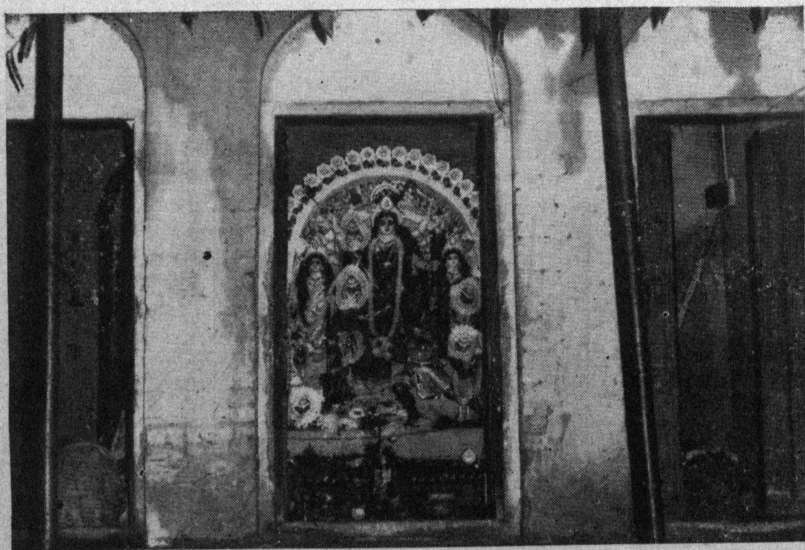
চট্টোপাধ্যায় বংশের পূজার দালান
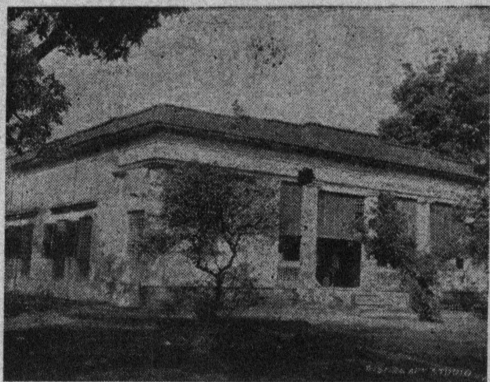
বিধানচন্দ্র কলেজ ১৯৫৭

ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬২

রিষড়া সেবা সদন, ১৯৫৬

পৌর প্রতিষ্ঠান পরিচালিত অবৈতনিক বিদ্যালয়
গান্ধী সড়ক, ১৯৩৮
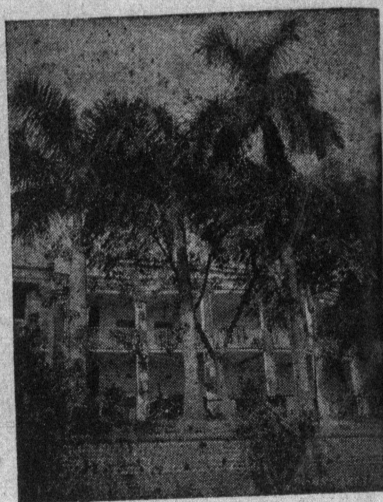
রিষড়া উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৩১
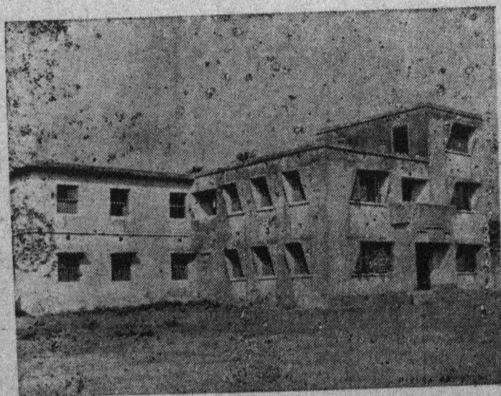
উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৫৭

বাঙ্গুর পার্ক, ১৯৪৮
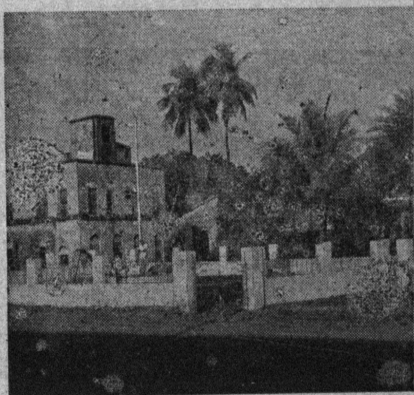
নারায়ণ রাধারাণী পার্ক, ১৯৬৪

রোটারি শিশু প্রমোদ উদ্যান, ১৯৬১
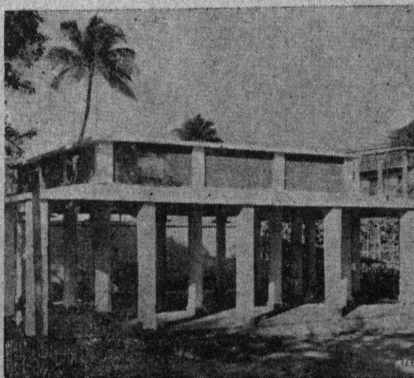
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভাগৃহ ১৩৭

ব্রহ্মা পূজার মন্দির ১৯২৭

পার্থ সারথি মন্দির, ১৯৬২
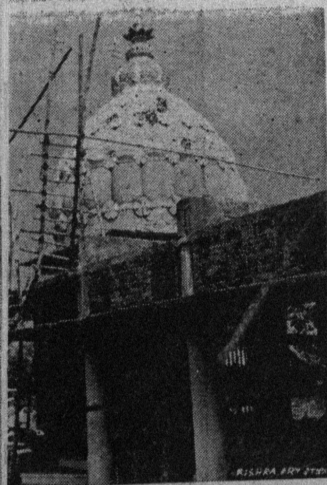
গোপাল জিউর মন্দির ১৯৬৯
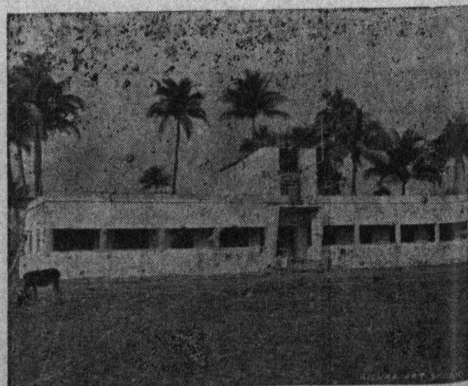
পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত মাতৃসদন (১৯৬

ভাগীরথীর পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।

রামায়ণের কাহিনী আমরা সকলেই জানি, এবং এও জানি যে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের উদ্ধার কামনায় কঠোর তপস্যা ক'রে ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত-লোকে এনেছিলেন এবং সাগর সঙ্গমে মিলিত ক'রে তাঁর বংশের শাপগ্রস্ত সগর সন্তানগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

মর্ত্তে গঙ্গাদেবীর অবতরণের সাল তারিখ লেখা না থাকলেও তিথিটি কিন্তু নির্দ্ধারিত। কোনও কোন পুরাণের মতে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া) আবার বরাহ পুরাণ মতে জ্যৈষ্ঠ্য শুক্ল দশমী (দশহরা)। এই দুই পুণ্য তিথিতেই লক্ষ লক্ষ নর-নারী গঙ্গা স্নান করে থাকেন। গঙ্গাদেবীর সাগর বক্ষে মিলিত হবার দিনটি কিন্তু সর্বসম্মত 'ভাবে পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি।

স্বর্গ থেকে অবতরণ সময়ে পৃথিবী গঙ্গার বেগ সহ্য করতে পারবেন না বলে মহাদেব স্বীয় জটাজাল মুক্ত ক'রে নিজশিরে প্রাথমিক বেগ ধারণ করেন। কবি তাই লিখেছেন :—

"আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি
পড়িলেন হরশিরে করি ঘোরধ্বনি ॥
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
একধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্তে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥"

আর্যাবর্ত্তে অবতরণের পর থেকে গঙ্গার স্রোত স্থানে স্থানে দিক পরিবর্ত্তন করেছে। কোথাও যুক্ত ত্রিবেণী আবার কোথাও মুক্ত ত্রিবেণী। এই মুক্ত ত্রিবেণীই ছিল একদিন এখানকার অধিবাসীদের নিকটবর্ত্তী তীর্থ। প্রাচীন ছড়ার মধ্যে তাই উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ—

"আলোচাল খেয়ে খেয়ে গলা হ'ল কাঠ।
কতক্ষণে যাবো রে ভাই তিরপানীর ঘাট।"

সপ্তগ্রাম বা ত্রিবেণীর নিকট থেকেই গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী এই তিনভাগে ভাগ হয়ে মুলধারা ছুটে চললেন সাগর সঙ্গমে, সামনে চললেন ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করতে করতে পথনির্দেশক হিসাবে। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে কপিল মুনির অভিশপ্ত সগর তনয়েরা মুক্তি পেলেন, চলে গেলেন বৈকুণ্ঠলোকে—

"যথায় আছিল ভস্ম সগর সন্তান।
পরশে পরমজল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥"

গঙ্গাই ভাগীরথী, ভাগীরথীই গঙ্গা, সে কথা বাল্মীকি ও শঙ্করাচার্য প্রণীত গঙ্গার স্তব থেকেই বেশ বোঝা যায়; বাল্মীকি কৃতস্তব ঃ -

"মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা শৃঙ্গার-হারাবলী,
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তী ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।"

শঙ্করাচার্যকৃত স্তব :—

"ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ।
তব-জল-মহিমা নিগমে খ্যাতঃ॥"

এই ভাগীরথীর সাগর সঙ্গম স্থানই সর্বভারতীয় তীর্থ-'গঙ্গা-সাগর।' পদ্মা বা অপর কোনও নদীর সঙ্গম এই রকম তীর্থে পরিগণিত হয়নি। গঙ্গা স্নান বলতে এই ভাগীরথী বক্ষে স্নানকেই বোঝায়।

যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে ভগীরথ খৃঃ পূর্ব ২৭৪১ অব্দে বর্ত্তমান

ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় ভূগোলবিদ্ ডঃ কানন গোপাল বাগচীর মতে ভগীরথ খৃঃ পূর্ব তেইশ শ' বছর আগে থাল কেটে গঙ্গাকে যে পথে নিয়ে এসেছিলেন, সেই নদী পথই গঙ্গার মূল পথ ও প্রাচীনতম ধারা। পদ্মা অবশ্যই গঙ্গার পরে সৃষ্ট এবং তার সৃষ্টি সম্ভবতঃ খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে।

উপরোক্ত কারণে, কোনও প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ থাক বা না থাক, গঙ্গার উভয় তীরবর্তী গ্রামগুলির অস্তিত্ব যে সুপ্রাচীন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যুগের ব্যবধানে নামরূপের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। যেমন ইংরেজ আমলে ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নামকরণ হয়েছিল 'হুগলী নদী'।

এই ভাগীরথীর পশ্চিমকূলেই রিষড়ার অবস্থান। রিষড়া-বাসীদের পরম সৌভাগ্য যে এহেন পবিত্র দেবনদীর কূলে তাঁরা বসবাস করেন। সুরধুনী-বিধৌত বায়ু সেবনে তাঁদের কর্মক্লান্ত শরীরের গ্লানি দূরীভূত হয়। গঙ্গার সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ইহকাল ও পরকালের। গঙ্গাই হলেন এখানকার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের প্রসবিনী। যুগ যুগ ধরে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল তাঁরই নাব্যতার মাধ্যমে।

চাঁদ সদাগরের সপ্ত মধুকরী ডিঙ্গাকে গল্প কাহিনী হিসাবে ধরে নিলেও একথা কেনা জানে যে অসংখ্য দেশী বিদেশী বাণিজ্যতরী থেকে আরম্ভ ক'রে ইউরোপীয় বণিকগণের রণতরী এঁর জলে ঢেউ তুলেছিল। কত তীর্থযাত্রীর নৌবহর কত প্রমোদতরণী কত জেলে ডিঙ্গী এই নদীর বুকে রং বেরংয়ের পাল তুলে গন্তব্য পথে যাতায়াত করেছে ও এখনও করছে।

রিষড়ার কত দেবদেবীর প্রতিমা হয়েছে বিসর্জিত, কত মাঙ্গলিক ঘট হয়েছে বারি পূর্ণ। তাঁরই বারি সেচনে শস্য হয়েছে সঞ্জীবিত। গৃহকার্যের নিত্য প্রয়োজনে, দেব সেবার নিমিত্ত কত অসংখ্য নরনারী গঙ্গার পবিত্র বারি কলস ভ'রে সংগ্রহ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এক কথায়, গঙ্গার জলই ছিল রিষড়াবাসীদের পানীয়, তার চাষবাসের, তার বাণিজ্যের সহায়ক, ধর্মজীবনের, ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। পরবর্ত্তী যুগে সুযোগ-সন্ধানী সাত সাতটা ইউরোপীয় বণিকের দল এঁরই পশ্চিম কুলে গড়ে তুলেছিল তাদের বাণিজ্য কুঠি, শিল্পসংস্থা, পুণ্যকামী ধর্মপ্রাণ নরনারী গড়ে তুলেছিল গঙ্গার ঘাট, কত দেবালয়, কত শিব মন্দির, কত বিদ্যায়তন।

'কলকাতার পর হুগলী পর্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম কূলবর্ত্তী এতগুলি প্রাচীন ও সুসমৃদ্ধ গণমান্য গ্রাম ও নগরীর পাশাপাশি অবস্থান বাঙলার অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ'।

— ঃ০ঃ —
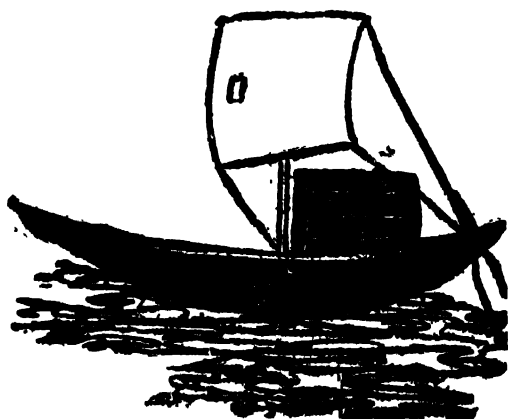
চৈতন্য যুগের প্রভাব

এই গঙ্গার তীরেই নবদ্বীপ ধামে জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে এক মহাপুরুষ। নাম তাঁর নিমাই। কেউ বা বলতেন গৌর বা গৌরাঙ্গ। গুরু প্রদত্ত নাম হল শ্রীচৈতন্য।

"ও ভাগীরথী! তুমি কি সেই ভাগীরথী সুরধুনী!
ও যার শ্যামল তটে নদের পথে গাইতো গৌর গুণমণি,
তুমি কি সেইগঙ্গা সুরধুনী।"

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এতদঞ্চলে নিম্নস্তরের তন্ত্রের প্রভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল 'কুক্রিয়ায়' সমাচ্ছন্ন। শ্রীচৈতন্য মনুষ্যত্ব লাভের যে পথ নির্দেশ করেছিলেন তা হল জীবে প্রেম, নামে রুচি, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান নয়, দম্ভের পরিবর্তে বিনয় ও ভক্তিই হল সেইপথ। তিনি বলেছিলেন যে 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চার যুগের মধ্যে কলিই শ্রেষ্ঠ। যাগ নয়, যজ্ঞ নয়, তপস্যা নয়, এইযুগে-ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র মুক্তির পথ।'

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের প্রভাব তখন প্রায় সবত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিষড়ার অধিবাসীদের মধ্যে সে প্রভাব কতখানি কার্যকর হয়েছিল তার সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাহেশ ও বল্লভপুর বৈষ্ণব সংস্কৃতির লীলাভূমি-রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

১৫১৫ খৃঃ থেকে ১৫৩৩ খৃঃ পর্যন্ত আঠার বৎসর চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে অতিবাহিত করেন এবং এই সময়ই তিনি তাঁর বিশ্বস্ত পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুকে বাংলা দেশে কৃষ্ণ নাম প্রচারের জন্যে প্রেরণ করেন।

চৈতন্য-আদিষ্ট নিত্যানন্দ বাংলা দেশে ফিরে এসে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে কৃষ্ণনাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং পানিহাটীতে নিজে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। মহাপ্রভুর আদেশেই তিনি দারপরিগ্রহ করেন, পণ্ডিত সূর্যদাসের দুইকন্যা বসুধা ও জাহ্নবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি রিষড়ার পরপারে খড়দহে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন এবং হরিনাম প্রচারে ব্রতী হন।

'খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া॥' (ভক্তি বিলাস)

তাঁর প্রেমোন্মাদ, তাঁর আচণ্ডালে প্রেমালিঙ্গন, খোল করতাল সহকারে ভক্তবৃন্দ সমন্বয়ে নাম সংকীর্ত্তন এই সমস্ত কাহিনী নিত্য নিয়মিত সুরধুনীর কলতানের সঙ্গে সঙ্গে এ কূলে এসে পৌঁছেছে। পারাপারের যাত্রীরা পল্লবিত ক'রে তুলে'ছে কত অলৌকিক কাহিনী। রিষড়ার জনমানসে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে কথা ইতিহাসে লেখা না থাকলেও, সে যুগের অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত সরলহৃদয় মানুষের মনে যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। আনুষ্ঠানিক ভাবে ফোঁটা তিলক বা কণ্ঠীধারণ ক'রে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত না হ'লেও সে যুগের প্রভাব সমাজ জীবনে ধীর ও মন্থর গতিতে প্রবেশ করেছিল। তন্ত্রোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ করলেও সন্তান সন্ততিদের নাম করণে বৈষ্ণব প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছিল। রিষড়ার প্রাচীন অধিবাসীদের অনেকেই তখন পুত্রদের নাম রেখেছিলেন—শ্রীধর, হলধর, স্বরূপ দাস, গোপাল, গোবিন্দ, নিমাই, নিতাই প্রভৃতি।

মাহেশে কমলাকর ও বল্লভপুরে রুদ্ররাম দুজনেই ছিলেন শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য এবং প্রায় সম সাময়িক।

শ্রীপাট মাহেশের গঙ্গাতটে বর্ত্তমানে যে স্থান জগন্নাথ ঘাট নামে পরিচিত সেই স্থানে একটি কুটিরে বিশিষ্ট ভক্ত সাধু শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী এই তিনটি বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই দারুমূর্ত্তিগুলি নির্মানের ইতিহাস বিচিত্র। অনেকের অনুমান পুরীর জগন্নাথদেবের সঙ্গে মাহেশে এই বিগ্রহ স্থাপনের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল এবং সেই কারণে উৎকল মতেই মাহেশের রথ যাত্রাদি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কালক্রমে ধ্রুবানন্দ মহারাজ বার্দ্ধক্য হেতু নিয়মিত পূজার্চ্চনায় অশক্ত হওয়ায় তাঁরই আকুল প্রার্থনায় চৈতন্যদেব উড়িষ্যাযাত্রার পথে তাঁর সহযাত্রী দ্বাদশ জন পার্ষদের মধ্যে অন্যতম কমলাকর পিপলাইএর উপর উক্ত বিগ্রহ তিনটির সেবা পূজার ভার অর্পণ করেন। সে হল ১৪১২ শকাব্দ বা ৯১০ বঙ্গাব্দের কথা। তদবধি শ্রীকমলাকর ও তদীয় বংশধরগণ বিগ্রহত্রয়ের সেবা পূজাদি নির্বাহ ক'রে আসছেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে শ্রীপাট মাহেশের উত্তর সীমায় 'আকনা' গ্রামের সংযোগ স্থলে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপর এক পার্ষদ ভক্ত শ্রীল রুদ্ররাম ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন চাতরা নিবাসী কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের ভাগিনেয়।

কাশীশ্বরের কার্যান্তরে গমন উপলক্ষে একদিন তাঁর অনুপস্থিতিতে রুদ্ররাম তাঁর মাতুলের প্রতিষ্ঠিত ৺মদন মোহন জীউর ভোগরাগাদি নিবেদন করেন। ইহাতে কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত কুপিত হন এবং তাকে কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করেন। ইহার ফলে রুদ্ররাম গৃহ পরিত্যাগ করে বর্ত্তমান বল্লভপুরের গঙ্গাতটে জনবিরল নির্জন স্থানে সাধন ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। কঠোর সাধন ভজনের ফলে তিনি তপসিদ্ধ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বাংলার নবাবের সিংহদ্বারের উপরিস্থিত প্রস্তর দ্বারা ইষ্টমূর্তি নির্মান করান। সেও এক বিচিত্র ও অলৌকিক কাহিনী। প্রথম যে মূর্ত্তিটি গঠিত হয় সেটি তাঁর মনোমত না হওয়ায় তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে শিল্পীকে দিয়ে দ্বিতীয় মূর্ত্তি নির্মান করান। এই মূর্তিটিই হল বর্ত্তমান রাধাবল্লভজীউ। ভাস্কর তখন অবশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড থেকে অনুরূপ আরও

একটি মূর্তি নির্মাণ করেন। ইহার পরেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা থেকে একটি গোপাল মূর্তি নির্মিত হয়।

উপরোক্ত তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হয় শুভ মাঘী পূর্ণিমার দিন। বহু ভক্ত সমাগম হয় দূর দুরান্তর হতে। খড়দহ থেকে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রও এসেছিলেন এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে।

"একটি মুরতি দেখি কহিলেন একি একি
খড়দহ গোঁসাই প্রবর।
বীরভদ্র যাঁর নাম সবিশেষ গুণধাম,
এযে মোর শ্রীশ্যাম সুন্দর॥"

তাঁর প্রার্থনানুযায়ী রুদ্রাম তাঁকে ঐ মূর্ত্তিটি দিয়ে দিলেন। অবশিষ্টটি দিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল সাঁইবোনা গ্রামে 'নন্দ দুলাল' নামে, সে হল আজ থেকে প্রায় চারশত বছর আগেকার কথা।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর সঙ্গে রিষড়ার অধিবাসীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না থাকলেও, ঘটনার অলৌকিকত্ব, প্রতিষ্ঠার মাধুর্য, সুঠাম দেববিগ্রহের অপূর্ব ভাবমূর্তি সে যুগের নরনারীকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করেছিল, ভক্তকে করেছিল তদগত চিত্ত। দীর্ঘকাল ধরে আজও পুণ্যকামী নরনারী উক্ত মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে ছুটে যায় বিগ্রহ তিনটিকে দর্শন লালসায়, দূরত্বের ব্যবধান অগ্রাহ্য করে, কখনও পদব্রজে, কখনও বা নৌকা যোগে।

নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র (নামান্তর বীরচন্দ্র) কর্তৃক 'শ্যামসুন্দর' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু নিজ গৃহে 'রাধা গোপীনাথ' মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নীলাচলে চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার সংবাদ আসার পর থেকে নিত্যানন্দের মনে দেখা দেয় ভাবান্তর—চৈতন্য বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ, কদাচিৎ বাহ্য হইলে চৈতন্য আলাপ", অবশেষে এসে গেল সেই দুর্দিন। সেদিন সকাল থেকেই নিত্যানন্দ ভবনে আরম্ভ হল

মধুর কীর্তন। নৃত্যরত নিত্যানন্দ পড়লেন একসময়ে মূর্চ্ছিত হয়ে। ভক্তগণের শত চেষ্টাতেও ভাঙ্গল না সে মূর্চ্ছা। (১৪৬৪ শক বা ১৫৪২ খৃঃ)।

নিতাই-শূন্য নিত্যানন্দ পরিবারে পরমেশ্বরের ভূমিকা হয়ে উঠে সকলের উর্দ্ধে। তিনিই তখন সর্বেসর্বা, মা জাহ্নবার দক্ষিণ হস্ত।

গৃহে তখন শিশুপুত্র বীরভদ্র আর কন্যা গঙ্গাদেবী।

মা জাহ্নবা তীর্থ পর্যটন করে ফিরে এলেন স্বগৃহে। কোলাহল পড়ে গেল খড়দহে। মা জাহ্নবার আনুকূল্যে খড়দহে অনুষ্ঠিত হ'ল এক মহামহোৎসব।

এই উৎসবের মধ্যে দেখা দিল এক মহাবিপত্তি। কদলীপত্রের অভাবে সমাগত বৈষ্ণবদের প্রসাদ দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। গঙ্গার ওপারের সমস্ত কদলীপত্র হল নিঃশেষিত। বিচলিত হলেন না নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর, কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত, তার উপর ঘাটে নৌকা নেই। "জয় নিত্যানন্দ বলি, গঙ্গাবক্ষে যায় চলি, ফিরে পত্র বোঝা মাথে লই।" (গৌরপদ তরঙ্গিনী—জগবন্ধু ভদ্র)। মাতা ঠাকুরাণী শুনলেন পরমেশ্বরের এই অলৌকিক শক্তির কথা, পদব্রজে গঙ্গা পারাপার হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল তৎকালীন রিষড়ার অধিবাসীদের মধ্যে, যেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছিল ঐ সমস্ত কদলী পত্র। উপরোক্ত ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সে যুগে খড়দহের সঙ্গে রিষড়ার সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে।

এরপর ভাগীরথীর স্রোত বয়ে গেছে বেশ কিছুদিন, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঢলে পড়েছে দিক চক্রবালের দিকে।

সহসা মা জাহ্নবার মনে খেলে গেল এক অদ্ভুত ভাবান্তর। পরমেশ্বরকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন "তোমার কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তোমাকে যেতে হবে এক অখ্যাত অবহেলিত গণ্ডগ্রামে। প্রচার করতে হবে সেখানে প্রভু গৌরাঙ্গের প্রেম অমিয়া। এই

নাও তুমি তোমার প্রভু নিত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত বিগ্রহ। সেবা করবে কায় মনপ্রাণে আর প্রচার করবে প্রভু চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমধর্ম।"

মায়ের আদেশ অনুযায়ী তিনি বুকে তুলে নিলেন রাধা-গোপীনাথের বিগ্রহ। সাশ্রু নয়নে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে বিদার নিলেন পরমেশ্বর।

খড়দহ থেকে গঙ্গা পার হলেন ঠাকুর পরমেশ্বর। রিষড়া থেকে পায়ে হাঁটা পথে চললেন মায়ের আদিষ্ট গ্রাম আঁটপুরে. মধ্যে পড়ল গরলগাছা গ্রাম। আঁটপুরে পৌঁছে চলতে লাগল রাধা-গোপীনাথের সেবা।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে একমাত্র বিপ্রদাস পিপলাই রচিত (১৪৯৫ খৃঃ) 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে রিষড়ার উল্লেখ ছাড়া অন্য কোন বিবরণ পাওয়া না গেলেও উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রিষড়ার তৎকালীন মুষ্টিমেয় অধিবাসীরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম-মাহেশ ও বল্লভপুর এবং খড়দহের বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং বিভিন্ন সূত্রে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল

ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বিভিন্ন চৈতন্য গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলা দেশের যে সব স্থানে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহিমা প্রচার করে বেড়িয়ে ছিলেন তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তার মধ্যে রিষড়ার নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল :— পাণিহাটি, খড়দহ, আকনা মাহেশ. চাতরা, কোতরং প্রভৃতি—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড।

মঙ্গলকাব্যের যুগ

চৈতন্য যুগেই জন্মলাভ করে মঙ্গল কাব্যগুলি। ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, মনসা মঙ্গল প্রভৃতি। এই কাব্যগুলির বিশেষত্ব যে প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যের দেবতা একান্ত অনিচ্ছুক ভক্তের কাছ থেকে এক প্রকার জোর ক'রে পূজা আদায় করেছেন।

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনায়, তিনি এতদঞ্চলের ভাগীরথী তীরবর্তী বহু গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার মধ্যে রিষড়ার নামোল্লেখ না থাকলেও বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল বা মনসা-বিজয় গ্রন্থে রিষড়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা মঙ্গল উভয় কাব্যেই বাণিজ্য-যাত্রার উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তৎকালে অর্থাৎ ৩৫০/৪০০ বৎসর পূর্বে সমুদ্রযাত্রার নিষিদ্ধতা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালাপানি পার হলে জাতিনাশের কোনও সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। অনেকে বলেন যে আরব-দের বাধা প্রদানের ফলে এবং পরে পোর্তুগালের হার্মাদদের অত্যাচারে এই সমস্ত বহির্বাণিজ্য ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, পরে ব্রাহ্মণরা বিধান দিলেন যে কালাপানি পার হলেই জাতিনাশ।

মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "মঙ্গল-কাব্যগুলি কেবল মাত্র কাব্যই নহে, উহা যেন বাংলা দেশের মধ্য-যুগের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতির এক একটি দর্পণ, বাংলার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু ঐ মঙ্গল কাব্যগুলিই ইতিহাসের অভাবকে অনেকখানি পূর্ণ করিয়াছে।"

কাব্যগুলিতে যাঁরা প্রাধান্য লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই শাপভ্রষ্ট দেবদেবী। কিন্তু ঐ সমস্ত দেবদেবীর আড়ালে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্খা এমন বাস্তব রূপ নিয়েছে যে কাব্যগুলি যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা মিলন সেতু রচনা করেছে।

বিপ্রদাস পিপলাই পূর্বোক্ত রীতি অনুসারেই তাঁর মনসা মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর বর্ণিত চাঁদসদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কাহিনী এবং বেহুলার পাতিব্রত্য এতদঞ্চলে সুপরিচিত। তাঁর বেদনাময় জীবন বহু শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে আবার তাঁর একনিষ্ঠ পতিভক্তি বহু নারীকে প্রেরনা জুগিয়েছে।

তখন এই সমস্ত কাহিনী পুঁথি হিসাবে প্রচারিত হত এবং চণ্ডীগান ও মনসার পাঁচালী বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, আলোচ্য যুগের রিষড়ার অধিবাসীরা এই সমস্ত ভাবধারা বা সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মত পাঠান যুগে হুসেন সাহের রাজত্ব ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি চৈতন্য প্রবর্ত্তিত পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহদাতা ছিলেন বলেও কথিত আছে। এই হুসেন সার আমলেই বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর কাব্য রচনা করেন বলে উল্লেখ করেছেন —"সিন্ধু ইন্দু বেদমহী শক পরিমাণ।

নৃপতি হুসেন সাহো গৌড়ের সুলতান,"

(গৌড়ের প্রধান পাঠান্তর)

অঙ্কস্য বামাগতি :— মহী—১, বেদ—৪, ইন্দু—১, সিন্ধু—৭, =১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃঃ। এই কাব্যে ভাগীরথী তীরবর্তী গ্রামগুলির নামোল্লেখ প্রসঙ্গে রিষড়ার নামও দেখতে পাওয়া যায়। মনসা মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বিপ্রদাসের রচনাই প্রাচীনতম বলে কথিত আছে।

ভাগীরথী বক্ষে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য তরীগুলি চলেছে সাগর উদ্দেশ্যে। সপ্তডিঙ্গার অধিকারী তিনি, ধনেজনে বাণিজ্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপুর্ণ এই সব বাণিজ্যপোত। এক একটির এক, এক নাম।

সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন চাঁদ অধিকারী। সেখানে তখন হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির অবস্থান। চারিদিকে অপূর্ব শোভা :

"অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতিঘরে কনকের ঝারা
নানারত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচচাল
গজমুক্তা-প্রলম্বিত ঝারা॥"

দু'দিন ধরে নগর দর্শনের পর বাণিজ্য পোতগুলি আবার যাত্রা সুরু করে। নদীর দু'পাশে দেখা যায় :—

"দিন দুইতথা রহি মেলিল বুহিত
কুমাবহট্ট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত।
ডাহিনে হুগুলি রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকীনাড়া।
মুলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর,
চাপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকি বাজার বাহিয়া জায় রঙ্গে
জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে
পূজিল নিমাই-তীর্থ করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম।
চানক বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।
খড়দহে শ্রীপাঠে করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত।

রিসিড়া ডাইনে বাহে বামে সুখচর
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।" ইত্যাদি।
এসিয়াটিক সোসাইটী সংস্করণ ১৯৫৩।

হুগলী জেলা বিবরণীতে মিঃ ওম্যালী সাহেব লিখেছেন :—

"**Rishra appears to be as old as Mahesh**, being mentioned **in the poem** of Bipradasa (1495 A. D.), **but first rose to importance during the early** days of **British rule.**"

"A century **earlier Bipradasa also gives a** similar **itinerary** in his **Manasamangala** (1495 A. D.) **and mention most** of the then **prosperous** places on either **side** of the **Ganges. These are :** Hooghly, Bhatpara--- Champdani...Mahesh, Khardaha, Rishra, Konnagar...and Hathiagar".

Calcutta Past & Present. Dr. P. C. Bagchi-P. 3

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী এতদঞ্চলের জনসাধারণের অন্তস্থল পর্যন্ত পৌঁছেছিল, যার ফলে প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গড়ে উঠেছিল দুর্গা-দালান আর মধ্যবিত্তদের গৃহের অপরিহার্য অঙ্গরূপে শোভা পেত চণ্ডীমণ্ডপ।

রাঢ় অঞ্চলে প্রণীত মনসা-মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনা বিখ্যাত। তাঁর রচনা অত্যন্ত সহজ, সরল ও মধুর এবং রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী। এতদঞ্চলে তাঁর কাব্য যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় লেখকের গৃহে অন্যান্য প্রচীন পুঁথিগুলির মধ্যে এই মনসা মঙ্গলের সযত্ন অবস্থিতি।

এই সমস্ত মঙ্গল কাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যে সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-চক্র পরিচালনার জন্যে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের নিত্য প্রয়োজন, প্রত্যেক গ্রামেই বিভিন্ন এলাকায় তাদের বসবাস ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর রিষড়ার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার ও

জীবনযাত্রা-প্রণালী যে একই ধরণের ছিল একথা সহজেই অনুমেয়। চালাঘরই ছিল গৃহস্থদের সচরাচর বাসস্থান, সাধারণ লোকের পরিধেয় ছিল মোটাধুতি ও গামছা। স্ত্রীলোকেরা একখানা শাড়ী কাপড়ে দেহের প্রায় সকল অঙ্গই আচ্ছাদন করতেন।

ঝাড, ফুঁক, গুণ, তুক, আর জলপড়া এইছিল একমাত্র সম্বল। ওষুধ বলতে বনৌষধি, গাছ-গাছড়া, ত্রিফলা আর তিন পাতার কাত। শিশিভরা ওষুধ তখন স্বপ্নের অগোচর।

ওঝারা টাকা পয়সার বদলে, চালটা মূলোটা বা একটা 'সিধার' বা ধনীদের গৃহে একখানা কাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট হত। এই সিধার বিনিময়েই তখন কথকতা, চামরঢুলান চণ্ডীগান, মনসার ভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। টাকা পয়সার ফুরান বলতে কিছু ছিল না। সাধ্যমত দু'এক পয়সা প্রণামী বা প্যালা যা পড়ত তাইতেই কথক ও গায়কদের জীবিকা নিবাহ হত।

বহুবিবাহ প্রথা এবং বিবাহ উৎসবে বাজনা বাদ্যি প্রভৃতি আড়ম্বর ছিল সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সে যুগে 'তঙ্কার' প্রচলন থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কড়ির প্রচলনই ছিল সমধিক। তা ছাড়া ছিল বিনিময় প্রথা, বহির্বাণিজ্য পর্যন্ত এই বিনিময় প্রথার মাধ্যমে পরিচালিত হত।

তৈল-সিন্দুরের ব্যবহার ছিল সার্বজনীন, প্রত্যেক শুভকার্যেই তৈল, হরিদ্রা ও সিন্দুরের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এর উপর ছিল কর্পূর সুবাসিত পানের ব্যবহার; স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আদরণীয়।

মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন গৃহে ভোজন বিলাসিতা ও রন্ধন পারিপাট্যের আতিশয্য ছিল। নিম্নমধ্যবিত্তরা অবশ্য শাকসব্জী আর মাছের ঝোল ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করত। দুধের স্বচ্ছলতার ফলে 'দুধভাত' আর নিতান্ত অভাব পক্ষে 'ঝোলভাত'। তাই কথা গুলো প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। আহারের পরিমাণও ছিল বর্তমান অপেক্ষা

৪।৫ গুণ বেশী, সে যুগের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে তাই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের উক্তিতে দেখতে পাওয়া যায় :— "ভিক্ষা করি প্রতিদিন ফিরি দ্বারে দ্বারে, সন্ধ্যাকালে দেড়সের লয়ে যাই ঘরে। দোঁহার দু'সের ভক্ষ্য দেড় সের মিলে, ক্ষুধায় অন্তর মোর প্রতিদিন জ্বলে।" উপবাস ও ব্রত নিয়ম পালন ছিল সে যুগের সর্বজন-কৃত্য। অবশ্য পালনীয় কয়েকটি উপবাসের কথা খনার বচনের মধ্যেই পাওয়া যায় :-

"শয়ন উত্থান পাশমোড়া। তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া॥
দুই ছেলের জন্মতিথি। অষ্টমী নবমী দুটি॥
পাগলার চোদ্দ, পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট॥
এও যদি না কর্তে পারিস। ভগার খালে ডুবে মরিস॥"

সে যুগে মেয়েদের বিবাহের বয়:সীমা ছিল সাত থেকে দশ বৎসর। এর ব্যতিক্রম ঘটলে লোকাপবাদ ও গঞ্জনার হাত থেকে নিস্কৃতি ছিল না। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কন 'খুল্লনার' দৃষ্টান্ত দিয়ে সে যুগের চিত্র অঙ্কন করেছেন :—

"শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
বার বৎসরের সুতা তব ঘরে অবস্থিতা
কেমনে আছহ সুস্থমতি॥
সপ্তম বৎসর কন্যা বিয়া দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করে সমর্পণ॥
নবম বৎসরে যদি বর আনি যথাবিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃকুলে পায় বহু মান॥
না বুঝাল কেহ তোমা সুতা হৈল দশ সমা
তথাচ না কৈলে কন্যাদান।

প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বসে
নবরস হয় একস্থান॥
না করিলা কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ কবিলা সঞ্চয়।
দ্বাদশ বর্ষের বেলা কন্যা হয় রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি কবে ভয়॥
পুষ্পিতা যাবত নয় তাবত পুরুষে ভয়
রহে সয়ে তাবত কামনা।
নর দেখি অভিরাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরকে যন্ত্রনা॥

মোগল যুগ

যে যুগের কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সময় যদিও দিল্লীর সিংহাসনে আকবর বাদশাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন বাংলার মসনদে কিন্তু তখনও শোভা পাচ্ছিলেন পাঠান নৃপতিগণ। এই পাঠান নৃপতিগণের মধ্যে হুসেন সাহের শাসন ব্যবস্থা ছিল একটা ব্যতিক্রম, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বংশ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়লে শেরসা হুসেনসার পৌত্র মামুদ সাকে গৌড় থেকে বিতাড়িত করেন, শেরসাহের ছুটি অক্ষয় কীর্তির মধ্যে একটি হল টঙ্কা বা তঙ্কা নামে নূতন মুদ্রার প্রচলন এবং দ্বিতীয়টি হল সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ, যার নাম এখন রিষড়ার মধ্যবর্ত্তী গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।

আকবর বাদশাহের আমল থেকে ভারতে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের আগমন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রুত উন্নতি হতে থাকে। যার ফলে রিষড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলো ক্রমশঃ ধনজন পূর্ণ হতে থাকে। আকবরের রাজত্বকাল ছিল অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী, অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃঃ থেকে ১৬০৫ খৃঃ পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গে বিরোধই বাংলার পাঠান রাজত্ব ধ্বংসের কারণ।

আকবরের আমলে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলনও হয়েছিল যার নাম আকবরী মোহর, খাঁটি সোনার তৈরী। এই মোহরের খ্যাতি ছিল সমধিক এবং রিষড়ার প্রায় প্রত্যেকটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই বংশানুক্রমে সেই মোহরের দু' একখানির অস্তিত্ব আজও বজায় রয়েছে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে বা অন্যত্র, যদিও তার প্রচলন বহুদিন পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছে।

আকবরের সময়েই বাংলা দেশের বিচারালয়ে পারসী ভাষার প্রচলন এবং তাঁরই আমলে বৈশাখ মাসে বঙ্গাব্দের গণনা আরম্ভ হয়। তিনি সৌরমতে বর্ষ গণনার পক্ষপাতী ছিলেন, সেইজন্যে তিনি যে বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই বৎসর থেকে হিজিরার চান্দ্র বৎসরের পরিবর্তে সৌর মানানুসারে গণনা করার আদেশ প্রচার করেন। ১৫৫৬ খৃঃ ছিল ৯৬৩ হিজিরা, তখন থেকেই বাংলা সন ও খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৫৯৩ বৎসরের তফাৎ চালু হয়।

দলিল দস্তাবেজে এখন যে আমরা বোরো পরগণা লিখি সেও তাঁরই আমলে সৃষ্টি। ১৫৮৩ খৃঃ মোগল সেনাপতি রাজা তোডরমল সুবে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং রাজস্ব শাসনের সুবিধার জন্যে তিনি সমগ্র বাংলাকে উনিশটি 'সরকারে' বিভক্ত করেন। প্রত্যেক 'সরকারকে' আবার কয়েকটি মহল বা পরগণায় বিভাগ করা হয়। এই পরগণার সংখ্যা ছিল মোট ৬১টি, বোরো পরগণার সৃষ্টি হয় সুবৃহৎ আর্বা পরগণার অংশ থেকে, রিষড়া এই বোরো পরগণার অন্তর্ভুক্ত।

আকবর বাদশাহের দরবারে তখন দেশী বিদেশী সব রকম ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকের অবাধ আনাগোনা, তাঁদের মধ্যে পর্তুগীজ পাদরীরাও ছিলেন। তাঁরা সম্রাটকে নানাভাবে তুষ্ট করে বাংলাদেশে ব্যবসার জাল বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে গোয়া, তারপর চট্টগ্রাম, শেষে তাদের দাপট ছড়িয়ে পড়েছিল সপ্তগ্রামে।

সপ্তগ্রাম তখন পৃথিবী বিখ্যাত প্রসিদ্ধ বন্দর। কত লোকের আনাগোনা, কত জাহাজ ভর্ত্তি মাল চালান হচ্ছে এই বন্দর থেকে। সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী ছিল অভিন্ন *

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান,
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণী-ঘাট' নাম ॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড।

নিকটবর্ত্তী তীর্থ হিসাবে এই ত্রিবেণী তখন এতদঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট সুপরিচিত। সেকথা গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাঁরা গঙ্গাসাগর যেতে পারতেন না তাঁরা এই ত্রিবেণীতে স্নান করতে সমবেত হতেন।

সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার ফলে ক্রমশঃ সপ্তগ্রাম বন্দরের সাতরঙ্গা দেউটি একে একে নিভে যেতে লাগল। বন্দর উঠে এল ঘরের পাশে হুগলীতে। সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে আর ব্যবসায়ের আকর্ষণে লোকারন্য ছুটে এল হুগলীর দিকে এবং তারই আশে' পাশে, ইউরোপীয় বণিকগণের আনাগোনা, বাণিজ্যপোতের সমাগম তখন থেকে হুগলীকে কেন্দ্র ক'রেই ভিড় জমাতে লাগল।

ব্যাণ্ডেলে আগে থেকেই পর্ত্তুগীজরা গুছিয়ে বসেছিল। গড়ে তুলেছিল তাদের বিখ্যাত গীর্জ্জা। সে হল ১৫৯৯ খৃঃ কথা, এই গীর্জাই ছিল তাদের দুর্গ, জল দস্যুতা, নিষ্ঠুর অত্যাচার, বে আইনী ব্যবসা, গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ, নবাবী সনদের প্রতি অসম্মান সবই চলত এই ভজনালয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে।

হুগলী তখন তাদেরই করায়ত্ব। ওরা হুগলীকে বলত 'ওগলা, ওগলি, ওগোল্কীন আর গঙ্গা নদীকে বলতো ওগলা বা ওগলী নদী, অর্থাৎ হোগলা বনের ধারে যে নদী, তারপর একদিন ইংরাজী উচ্চারণে ঐ ওগলা বা ওগলী নদীর নাম হয়ে গেল হুগলী নদী।' গঙ্গা বা ভাগীরথী নামটা তখন থেকেই কাগজে কলমে এবং বৈদেশিক ব্যবসায়ী মহলে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে গেল।

পর্ত্তুগীজদের ব্যবসা-বাণিজ্য যত বাড়তে লাগল তাদের অত্যাচারের বহর ততই বেড়ে যেতে লাগল। দিল্লীও গৌড় দুই দূর অস্ত্। কে তাদের বাধা দেবে? নদী তীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর থেকে মেয়েদের চুরি করে এনে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করা ছিল তাদের একটা মস্ত বড় লাভের ব্যবসা। ছোট ছোট ছেলেদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ক্রীতদাস করত। এই সমস্ত কারণে তখন গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদের যাতায়াত নিরাপদ ছিল না। অথচ গঙ্গার জলই ছিল তখন এতদঞ্চল বাসীদের পাণীয় হিসাবে নিত্য ব্যবহার্য। শুধু জল পথই নয় স্থল পথও নিরাপদ ছিলনা, সর্বত্রই দস্যুভীতি। ঘরে ঘরে তখন ছেলে মেয়ে ধবার ভয়, পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা কখন কার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দেবে এই আশঙ্কায় তখন সকলেই সন্ত্রস্ত।

উপরোক্ত কারণে রিষড়ার গঙ্গা তীরবর্ত্তী ভূভাগ হয়ে পড়েছিল জনশূন্য। অধ্যুষিত গ্রাম হিসাবে তখন মোড় পুকুরেরই প্রাধান্য। বিরল বসতির সুযোগে জন্ম নিয়েছিল, গাছ গাছড়া, বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃহৎ মহীরুহ। বড় রাস্তা বা বাদশাহী সড়ক (বর্তমান জি, টি, রোড) বরাবর ঐ একই অবস্থা। বড় বড় আম বাগান আর বন্য গাছ-গাছালী ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল সারাপথ। কচিৎ কখনও দু' এক জন রাহীলোক যাতায়াত করত এই পথে। পাড়ার ভিতরের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ, ছায়ায় ঘেরা শ্যামলিমার মধ্যে স্থানে স্থানে দু'এক ঘর নিম্নবর্ণের বাসিন্দাদের খড়ের ছাউনি মাটির ঘর, কৃষি আর কায়িক পরিশ্রমই ছিল তাদের একমাত্র উপজীবিকা। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার তখনও অনাগত। কামারশালা আর কোমরশালা এই ছিল তখন ব্যবসায়ের একমাত্র ভীত্তি।

নির্জনতার সুযোগে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতার অন্তরালে নানাবিধ পশুপক্ষী এবং বন্যপশুদের বিচরণ ছিল অবাধ ও নিঃশঙ্ক। শৃগাল, সাঁজারু, গোসাপ প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত বাগবাগিচার মধ্যে।

এক কথায় 'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ', এই ছিল তখন রিষড়ার আভ্যন্তরীন অবস্থা। পানকৌটি, পাতিহাঁস, ঘুঘু, টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষী কুলেরও অসদ্ভাব ছিলনা। এদের মধ্যে কতকগুলি ছিল আবার শিকারীদের বধ্য। মাংসাশীদের পরম প্রীতিকর খাদ্য।

লোক বসতি বিস্তার।

সুলেমান কররাণির পুত্র দাউদের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান অমাত্য বিক্রমাদিত্য তাঁর সহোদর বসন্তরায়ের সাহায্যে বনজঙ্গল কেটে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন যশোহরে। জায়গাটা ছিল দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ এবং নদীবহুল। তিনি ভূমি ও বৃত্তিদিয়ে গঙ্গার উত্তরকূল এবং দূরান্তর থেকে সকল জাতির লোককে একে একে নিয়ে গিয়ে বসবাস করিয়েছিলেন তাঁর সেই নূতন রাজ্যে।

রাজা বসন্তরায়ের আহ্বানে যাঁরা যশোহরে গিয়ে রাজপ্রসাদে সসম্মানে ভূসম্পত্তি আর বৃত্তি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পর্কটী গ্রামের পাকড়াশী বংশের একটি শাখা। কাশ্যপ গোত্রীয় মহাত্মা দক্ষের একপুত্র বনমালী তাঁর চতুষ্পাঠী-স্থাপন করেছিলেন এই পর্কটী গ্রামে এবং তাই থেকেই তাঁদের উপাধি হয়েছিল পাকড়াশী। সে হল দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা।

ক্রমশঃ বংশ বিস্তারের ফলে কেবলমাত্র যজন যাজন আর শিষ্যবর্গের প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তির উপর জীবিকা নির্বাহ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। তার উপর আবার কালা পাহাড়ের অত্যাচারে পাকুড়ের প্রসিদ্ধ বাসুদেবের মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছিল কয়েক বছর আগে। ইতিপূর্ব্বেই পাকড়াশী বংশের কয়েকটি শাখা রাঢ়ের বাসস্থান ত্যাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সমস্ত কারণে পর্কটী বা পাকুড়ে অবস্থিত অবশিষ্ট বংশধরগণ রাজা বসন্তরায়ের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন নি।

বনমালী দেবশর্ম্মা নিজ গাঁই (পর্কটী) অনুযায়ী পাকড়াশী উপাধি গ্রহণ করলেও তৎকালীন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রভাব বশতঃ

পণ্ডিতগণ ভট্টাচার্য উপাধিতে আত্ম পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন, বিশেষতঃ এই বংশে অনেক বিদ্বান ও সুধী ব্যক্তির উদ্ভব হওয়ায় ভট্টাচার্য উপাধি প্রচলিত হয়ে পড়ে।

যুবরাজ প্রতাপাদিত্য বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোগলের আধিপত্য অস্বীকার ক'রে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। গোড়ে তুললেন ভাগীরথীর তীরে কয়েকটি দুর্গ — উত্তরে জগদ্দল থেকে দক্ষিণে রায়গড় দুর্গ পর্যন্ত। শত্রুপক্ষ ভাগীরথী পথে অগ্রসর হলে যমুনার মুখেই বাধা দেবার জন্যে চাই দুর্ভেদ্য দুর্গ।

পিতার মৃত্যুর পর ১৫৮৪ খৃঃ প্রতাপাদিত্যের হল রাজ্যাভিষেক। তিনি ধুমধাটে নূতন রাজধানী স্থাপন ক'রে নিজের সৈন্যবল বিশেষ ক'রে নৌ-শক্তি বাড়িয়ে তুললেন। হয়ে উঠলেন বার ভুঁইয়ার মুকুটমণি।

আকবর সৈন্য পাঠালেন তাঁকে দমন করার জন্যে। কলকাতার কাছে বড়িশা বেহালা এবং তার নিকটবর্ত্তী স্থানেই হয়েছিল বাঙালী সৈন্যের সঙ্গে মোগলের যুদ্ধ এবং প্রতি যুদ্ধেই ভাগ্যলক্ষ্মী জয়মাল্য তুলে দিয়েছিলেন প্রতাপের কণ্ঠে।

কি কারণে জানিনা গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ইছাপুর গ্রাম নিবাসী হড় বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে এসে যমুনার ধারে ছাউনি ফেললেন। রাঘব পণ্ডিত ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয় মহাত্মা দক্ষের পুত্র 'কাকের' বংশধর; এবং একাদশ অধস্তন পুরুষ। কাক ছিলেন 'হড়' গ্রামী, তাই তাঁদের গাঁই অনুযারী উপাধি হয়েছিল হড় বা হড়চৌধুরী। ২৪ পরগণা জেলার গদখালি, কালিয়া প্রভৃতি স্থানে এই বংশের শাখা বিদ্যমান।

যাইহোক, হড় মহাশয় প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হয়ে দৈববলে তাঁর ছাউনিতে প্রবেশ করলেন অকুতোভয়ে পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে। নিজহাতে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখলেন

প্রতাপের পূজার সাজ, এমন নিখুঁত ক'রে কেউ কখনও তাঁর পূজার আয়োজন করে দেয়নি ইতিপূর্বে। রাজা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন সেই পূজা-আয়োজন। পূজা 'করে সেদিন অনুভব করলেন এক অনির্বচনীয় আনন্দ, মনে মনে প্রীত না হয়ে পারলেন না। কিন্তু কে এই আয়োজনকারী? অনুসন্ধানে দেখা পেলেন রাঘব পণ্ডিতের। তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে দাঁড়ালেন প্রতাপের সম্মুখে। তাঁর দর্শনে ক্রুদ্ধ প্রতাপের মনে সঞ্চারিত হল প্রীতিস্নিগ্ধ সদ্ভাব, উভয় পক্ষে অচিরে বিরোধের মীমাংসা ঘটে গেল। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়, প্রতাপকে মধ্যাহ্ন ভোজনের আহ্বান জানালেম কিন্তু প্রতাপ বললেন, তিনি পর রাজ্যে অন্ন গ্রহন করেম না। এমন কথা; পণ্ডিত মহাশয় তৎ-ক্ষণাৎ দলিল ক'রে ছাউনির স্থানটি প্রতাপের নামে দানপত্র ক'রে দিয়ে তাঁকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করেন। গোবরভাঙ্গার নিকট রেল-ওয়ে সেতুর দক্ষিণে যমুনার উপর 'প্রতাপপুর' নামক স্থানটি আজও সেই স্মৃতি বহন করছে।

সঠিক জানা না গেলেও অনেকের অনুমান উক্ত ঘটনার কিছু পরে হড়বংশীয় কয়েক ঘর এসেছিলেন এই রিষড়ায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাঁরাই যে রিষড়ার প্রথম অধিবাসী সে বিষয়ে বোধহয় মতভেদ নেই। কথায় বলে "হড় হাড়ি, হিজড়ে; এই তিন নিয়ে রিষড়ে"। এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে সে যুগের বসবাসকারীদের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হরিপালেও এই হড় বংশের একটি শাখায় অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায় হুগলী জেলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে। "সেখানকার রায় বংশের কুল পুরোহিত শ্রীঅমিয় কুমার হড় ভট্টাচার্য্যদের প্রতি-ষ্ঠিত কালীমন্দিরের সেবায়েত। তারাচাঁদ হড় এই বংশের আদি পুরুষ। পাণ্ডিত্যে ও অমায়িকতার জন্যে হড় বংশের পূর্বে খ্যাতি ছিল।"

কোষ্ঠীর ফল অনুযায়ী প্রতাপাদিত্য পিতৃহন্তা না হয়ে যে পিতৃব্য হন্তা হয়েছিলেন সেকথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। বসন্ত রায়ের হত্যার সাল তারিখ নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, কেউ বলেন ১৬০২ খৃঃ আবার অন্যমতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে ছিল ১৫৯৫ খৃঃ। সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে ছিল বেহালার নিকট সরিষা বা দ্বিতীয় সর্যুনার অন্তর্গত রায়গড় দুর্গে।

"তার খুড়া মহাশয় আছিলা বসন্ত রায়
রাজা তারে সবংশে কাটিলা,
তার বেটা কচু রায় রাণী বাঁচাইলা তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা" (রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র)

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর যে বসন্ত রায়ের আশ্রিত ও অনুগৃহীত জনগণের কতকাংশ প্রাণভয়ে স্থানত্যাগ করেছিলেন একথা যেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেমনই প্রতাপের পতনের পর দ্বিতীয় বার বহু প্রসিদ্ধ ও নৈষ্ঠিক হিন্দু পরিবার যশোহর রাজ্য ত্যাগ ক'রে ভাগীরথীর উভয়কূলে বসতি বিস্তার করেছিলেন তার বিবরণও পাওয়া যায় এতদঞ্চলের বিভিন্ন প্রাচীন পরিবার বর্গের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে।

প্রথমবার মানসিংহ প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সন্ধি করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ঘর সন্ধানীদের বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে অনায়াসেই যুদ্ধে জয়ী হন আর জয়ানন্দ, ভবানন্দ আর লক্ষ্মীকান্ত পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন 'মজুমদার' খেতাব আর বহু পরগণার জায়গীর, এইভাবে শৌর্যবীর্যের অধিকারী প্রতাপের স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, যশোহরের শাসন কর্তৃত্ব অর্পিত হল বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর হাতে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে।

যুদ্ধোত্তর অবস্থায় প্রজাদের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। চারিদিকে হাহাকার, স্থান ত্যাগের হিড়িক। প্রথমে অনেকেই স্থান করে নিলেন গঙ্গাতীরবর্তী আত্মীয়স্বজনের গৃহে। জগদ্দল, নৈহাটি

ভাটপাড়া, খড়দহ কলকাতা আর এদিকে চুঁচুড়া থেকে বালি পর্যন্ত বাস্তুহারার দল ক্রমশঃ বসবাস স্থাপন করে নিলেন।

যত দূর জানা যায়, পাকড়াশী বংশের জটাধর পাকড়াশী মহাশয়ও এসেছিলেন যশোহর সর্ষুনা থেকে সস্ত্রীক এই সব স্থান-ত্যাগীদের সঙ্গে মিলে। সঙ্গে ছিলেন ঘোষ বংশের স্তবল চন্দ্র ঘোষ, গুরু শিষ্য সম্পর্ক। পাকড়াশী মহাশয় উক্ত ঘোষের আত্মীয় মোড়পুকুর নিবাসী দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে রয়ে গেলেন। ভাগীরথী বক্ষে স্নান করলেন দুর্লভ অর্দ্ধোদয় যোগে। তিনি ছিলেন সাধক প্রকৃতির, তাই রিষড়ার নির্জনতা ও নৈসর্গিক শোভা সম্পদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সর্বোপরি নিত্য গঙ্গাস্নানের সুযোগ ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যেতে তাঁর মন চাইল না। কালক্রমে তিনি ঘোষ মহাশয়দের সহায়তায় বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোড়পুকুর থেকে নিত্য গঙ্গাস্নান করতে আসার অসুবিধা ঘটায় বর্তমান কালীমন্দিরের নিকটে আপন বাসস্থান নির্মাণ করেন।

মতান্তরে তিনি এসেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং ৮১১ বঙ্গাব্দে বা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রী ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির সংলগ্ন শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠা কাল ৮১১ বঙ্গাব্দ লিখিত আছে। যার ফলে, ষোড়শ শতাব্দীতে রিষড়া অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করতে পারেনি বরং বাধা প্রাপ্তই হয়েছিল।

রিষড়া ছিল তখন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার শাসন কার্য যদিও পরিচালিত হত হুগলীর ফৌজদার কর্তৃক; কিন্তু রাজস্ব বিভাগ ছিল খাস বর্দ্ধমানে। বর্দ্ধমান ছিল তখন নাম করা ঐতিহাসিক সহর। "On the grant to the East India Co. in 1765 of the Dewani of Bengal Bihar and Orissa, Hooghly took its place in the English

Revenue history as one of the districts administered from Burdwan'—Toynbee.

বর্দ্ধমানের সঙ্গে জলপথে সংযোগ থাকলেও পদব্রজে যাতায়াত করা সে যুগে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটিকে এতদঞ্চলে আকর্ষনীয় করে তুলেছিলেন তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে।

রিষড়ার আয়তন ছিল পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে চম্পাখাল, দক্ষিণে বাঘখাল বা বেগের খাল এবং পশ্চিমে বর্ত্তমান বামনআড়ি, রাজাধরপুর ইউনিয়ন। সরকারী মৌজা ম্যাপে উপরোক্ত স্থানগুলি রিষড়ার অন্তর্ভুক্ত বলে দেখান আছে।

রিষড়া নামের উৎপত্তি

রিষড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একথা সর্বজন বিদিত যে নদী মাত্রই তার দুকূল সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়, কাজেই ভাগীরথী যেদিন জহ্নুমুনির কর্ণের ছিদ্রপথ থেকে মুক্তি পেয়ে (মতান্তরে জানুদেশ ভেদ করে) জাহ্নবী নাম ধারণ করে সাগর বক্ষে মিলিত হয়েছিলেন সেদিনও রিষড়ার অস্তিত্ব ছিল এবং আজও বর্ত্তমান।

কিম্বদন্তী বলে, পূর্বে এখানে মুনি ঋষিদের বাসস্থান ছিল বলেই ঋষিরা বা ঋষিড়া নামের উৎপত্তি, প্রাচীন পুঁথিপত্রে এবং পুস্তকে ঋষিড়া বানান দেখা যায়, পরবর্ত্তী যুগে 'ঋ'-র স্থানে 'র'-এর প্রচলন শুরু হয় এবং সে যুগে 'স' এর ব্যবহার ছিল ইচ্ছাধীন, তাই একই পুরাতন দলিলে তিনটি 'স' এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়—রিসিড়া, রিশিড়া, রিষিড্যা এবং ঋষড়া, ব্যাকরণের অনুশাসন প্রাচীন পুঁথিপত্রে কেহই বিশেষ মেনে চলেন নি, 'ঝ'— এবং 'য'-এর ব্যবহারও ছিল স্বেচ্ছাধীন।

কিন্তু 'রিষড়া' নামটির ব্যুৎপত্তি আজও সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত O. D. B. L. নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের—বাঙ্গালীর ইতিহাসে 'ড়া' উপান্ত গ্রামের নামগুলিকে 'দ্রাবিড়ীয়' শব্দ বলা হয়েছে, যেমন রিষড়া, হাওড়া, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া প্রভৃতি।

এতদঞ্চলে যে একদিন আদিবাসীদের বাসস্থান ছিল সে কথা আজ আর অজানা নয়, তাদের মধ্যে দ্রাবিড়রা ছিল বিশেষ উন্নত। এদের বহু শাখা আর্য-অভিযান কালে (বা কোন এক প্রাচীন যুগে) দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। তাদের পূজিত বহু দেব দেবী এবং ভাষার অপভ্রংশ পরবর্ত্তী সভ্যতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। দ্রাবিড় জাতির বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণের বিশদ বিবরণ আছে 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে।

ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন—রিষড়ার প্রাচীন রূপ—'ঋষি পাঠক' অথবা 'ঋষিবাটক'। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসা মঙ্গল কাব্যে ঋষি ঘাট ও ঋষি গ্রাম এই দুটো কথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—"ত্রিধারা গঙ্গার ঘাট গেল এড়াইয়া, ঋষি নামে ঘাট তথা উত্তরিল গিয়া।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ত্রিবেণীর পর (মুক্ত ত্রিবেণী) ঋষড়া ছাড়া আর কোনও গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তীর রচনার মধ্যে' রিসিবাটী' নামক গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়:—

"পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়,
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।
বন্দিব বড়খাঁ গাজী রিসিবাটী গাঁ
নিজবাটী বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ।
ত্রিপর্নির ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী
তাঁহার মোকামে বন্দো ষোলশত কাজী"। ইত্যাদি।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কি কারণে জানি না রিষড়ার বানান লেখেন 'রিশড়া' হুগলী, কাজেই একথা বলাই বরং ভাল যে :—

কোন্ দূর শতাব্দীর কোন এক অখ্যাত দিবসে
হে ঋষড়া জননী,
তব নাম উচ্চারিল কেবা সেই কোন্ মহাজন
জানি নাহি জানি ॥" (লেখক)

পাঠান যুগে সাহিত্য সৃষ্টি

পাঠান আমলেই রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের অমর কীর্ত্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, যার আদর ছিল ঘরে ঘরে। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালী সমাজে তখন এই গ্রন্থের (পুঁথির আকারে) পঠন পাঠন ছিল সুবিস্তৃত। রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসীদের কাছে এই গ্রন্থ ছাড়া আর কোনও গ্রন্থের অস্তিত্ব ও সমাদর যে ছিল না একথা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রা, ভাগবত পাঠ ও কথকতা এই যুগের সমাজ জীবনে একটা নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করে, সমবেতভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তনও এই যুগেরই অবদান।

এরপর আসে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। বহু পণ্ডিতই সত্য নারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন তার মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী রচিত পাঁচালীই প্রাচীনতম বলে মনে হয়।

পীর ও ফকিরদের প্রভাবে মুসলমান ধর্মপ্রচার বেশ কিছুটা সার্থকতা লাভ করেছিল। মুসলমান পীরদিগের সিদ্ধাই সাধারণ লোকের মধ্যে একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তিভাবের উন্মেষ করেছিল, যার ফলে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ কাহিনীর মধ্যে দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা সামাজিক রফার প্রচেষ্টা হয়েছিল সত্য, যেই পীর সেইত জানিহ নারায়ণ) কিন্তু এ প্রচেষ্টা হিন্দুদের দিক থেকে যতখানি

অগ্রসর হয়েছিল মুসলমানদের দিক থেকে ততখানি প্রশ্রয় না পাওয়ায় সে মিলন প্রচেষ্টা কার্যকর হতে পারে নি। পীরদের মধ্যে পাঁচ পীরের প্রসিদ্ধিই ছিল সমধিক।

চম্পাখাল ও চম্পাবিবি

এখন সে যুগের এই পীর গাজীদের কাহিনী বিজড়িত রিষড়ার উত্তর সীমানায় অবস্থিত চম্পামাই বা চম্পাবিবির দরগা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

রিষড়া ও মাহেশের সংযোগ স্থলে যে চম্পাখাল আজ অবলুপ্তির পথে তার উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থে, সরকারী রিপোর্টে এবং নক্সায় দেখতে পাওয়া যায়। এই চম্পাখালের পাশেই রয়েছে 'মাই চম্পাবিবির' আস্তানা বা সমাধিবেদী।

যতদুর জানা যায়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ষোড়শ শতাব্দীর একটি বিস্মৃত প্রায় ইতিহাস, একটি সকরুণ কাহিনী। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আজও অনেকেই এই সমাধি বেদীতে পূজা দিয়ে থাকেন; কেউবা মানত করেন সিন্নি, কেউবা ঢালেন দুধ, গঙ্গাজল। নববধূর প্রথম আগমন কালে নবদম্পতীকে প্রদক্ষিণ করান হয় এই বেদী—তাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায়। হিন্দুরা বলেন 'চম্পা মাই আর মুসলমান ভায়েরা বলেন 'চম্পাবিবি'। অবিবাদে চলে আসছে উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক এঁর পূজার্চ্চনা। সন্ধ্যায় কেউবা জ্বেলে দেন একটা বাতি, কেউবা একটা ধুপের কাঠি। হিন্দুমুসলমান সংস্কৃতির মিলন সেতু এই চম্পাবিবির স্মৃতি চিহ্ন এই স্থানটিতে কিভাবে এল, কেইবা তার বাহক সে কথা বলা আজ সহজ নয়।

এই সমাধিবেদীর পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল একটি সুবিস্তৃত খাল গঙ্গা পর্যন্ত আর পশ্চিমে কৃষি ও আবাদি জমি পর্যন্ত প্রসারিত। কালক্রমে নানা কারণে সে খাল হয়েছে আজ পরিবর্তিত এবং সঙ্কুচিত।

প্রাচীনতার দিক থেকে এর ইঙ্গিত ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান হুসেন সাহের রাজত্ব কালের পীর ও গাজী সাহেবদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্ময়কর প্রাধান্যের দিকে। গাজী সাহেবদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং মুসলমান ধর্মের প্রচারক। মন্ত্রবলে তাঁরা মানুষকে পশুরূপে পরিণত করতে পারতেন, তাঁদের বাহন ছিল বনের হিংস্র শার্দ্দূল। এইরূপেই চিত্রিত হয়ে আছেন গাজী সাহেবরা প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে, মুসলমানী করচায়। পরবর্ত্তীকালে এঁরা স্থান পেয়েছেন লৌকিক দেবতাদের মধ্যে, এঁদের পূজা হাজোতে ছিল না কোন সাম্প্রদায়িকতা বা জাতি ধর্ম্মের ভেদাভেদ। তাই তাঁদের পূজান্তে ফকিররা সুর ক'রে বলতেন :—

"গাজী মিঞার হাজোত, সিন্নি সম্পূর্ণ হল।
হিন্দুগণে বল হরি, মোমিনে আল্লা বল॥"

সে যুগের সাধারণ মানুষই যে কেবল তাঁদের ভয়ভক্তি করত তাই নয়, আমির ওমরাহগণও তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং জাতীয় ধর্মের সম্মানার্থে সুলতানগণও তাঁদের পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য হতেন।

মুকুট রায় ছিলেন সে যুগের একজন সামন্ত নৃপতি। তাঁর রাজত্বকাল গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন সাহের আমলে। শাসন সু-ব্যবস্থার জন্যে মুকুট রায়ের রাজত্বের উত্তর ভাগ ছিল তাঁর নিজের শাসনাধীন, আর দক্ষিণ ভাগ বা ভাটীমুল্লুকের শাসনভার ছিল তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি দক্ষিণ রায়ের হাতে। তিনি ছিলেন নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ এবং অত্যন্ত বলবান পুরুষ।

মুকুট রায়ের স্ত্রীর নাম ছিল লীলাবতী। তাঁর সাত পুত্র আর এক কন্যা চম্পাবতী, 'সবে মাত্র এক কন্যা, রূপে গুণে বহু ধন্যা।' চম্পাবতীর অপূর্ব রূপলাবণ্যের কথা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে (বিশেষ ক'রে মুসলমানী কেতাবে)

এই চম্পাবতীর রূপ লাবণ্যের আকর্ষণে তাকে লাভ করার আশায়। মতান্তরে মুসলমান ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে গাজী সাহেব মুকুট রায়ের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব ক'রে পাঠান, কিন্তু মুকুট রায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখান ক'রে কালুগাজী নামক দূতকে কারারুদ্ধ করেন। এর ফলে গাজী সাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সময় মত নৌসেনাপতি দক্ষিণ রায়ের সৈন্য সাহায্য এসে পড়ায় মুকুট রায় সে যুদ্ধে জয়ী হন। পরাস্ত গাজীসাহেব সুলতানের কাছে কালুগাজীর কারারুদ্ধ হওয়ার কথা এবং মুকুট রায়ের মুসলমান বিদ্বেষের কাহিনী অতিরঞ্জিত করে ব্যাখ্যান করার ফলে হুসেন সাহ তাঁকে সৈন্য সাহায্য করতে সম্মত হন।

গাজী সাহেব সহসা গুপ্তভাবে মুকুট রায়কে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে সংবাদ না পাওয়ায় দক্ষিণ রায় এসে পৌঁছবার আগেই অতর্কিত আক্রমণে মুকুট রায়ের বহু সৈন্য নিহত হয়। অপরদিক থেকে গৌড়েশ্বর-সৈন্যবাহিনী কালু গাজীর কারামুক্তির অভিপ্রায়ে এসে সে যুদ্ধে যোগদান করে। উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মুকুট রায় সহজেই পরাজিত হন। তাছাড়া তাঁর রাজপুরি মধ্যে 'মৃত্যু-জীব কূপের' সন্ধান পেয়ে গাজী সাহেব গোপনে তার মধ্যে নিষিদ্ধ রক্ত মাংসাদি নিক্ষেপ ক'রে পূর্ব্বেই সেই কূপের জলের 'মৃত-সঞ্জিবনী' শক্তি বিনষ্ট ক'রে দেন। যার ফলে এবার আর মুকুট রায়ের মৃত সৈন্যদের পুনর্জীবিত করা গেল না। এইভাবে পরাজিত হয়ে রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের অনেকেই কূপের জলে প্রাণ বিসর্জন করেন। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র এবং কন্যা চম্পাবতী হন শত্রু হস্তে বন্দী। বিজেতা পক্ষ তাঁদের উভয়কেই করেন ধর্মান্তরিত।

কেহ কেহ বলেন গাজী সাহেব বন্দিনী চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। আবার অন্যেরা বলেন বন্দিনী অবস্থায় থাকার কিছুদিন পরেই তিনি কৌশলে মুক্তিলাভ ক'রে সাতক্ষীরার গণ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চম্পাবতী তাঁর অবশিষ্ট জীবন জাতিধর্ম নির্বেশেষে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁর যা কিছু ধনরত্ন ছিল তা সবই পরহিতব্রতে উৎসর্গ ক'রে দেন। তাঁর মাতৃসুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন ও ভক্তি শ্রদ্ধা করতে থাকেন। মুসলমানরা বলতেন 'চম্পাবিবি' আর হিন্দুরা বলতেন 'চম্পামাই'। উভয়ে মিলিত হয়ে তাঁর নাম হল 'মাই চম্পাবিবি', এই ভাবেই হয়েছিলেন তিনি লোক পূজ্যা। তাঁর দেহরক্ষার পর তাঁর ভক্তবৃন্দ স্থানে স্থানে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে 'এক-গম্বুজ' মন্দির বা 'দরগা' নির্মাণ করে দেন।

জি, টি, রোডের ধারে আমাদের নিত্য দেখা 'মাইচম্পাবিবি'র সমাধি বেদী হয়তো সেই মহীয়সী রমণীর স্মৃতি বহন করছে। যুগে যুগে, কালে কালে, পূজা হাজোত পেয়ে আসছেন হিন্দু ও মুসলমান ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে অবিবাদে স্বমহিমায়।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ 'যশোহর-খুলনার' ইতিহাস পাঠে এই কাহিনীর পরিপূর্ণ বিবরণের পরিচয় পাবেন।

আকর গ্রন্থরাজি

১। বালকাণ্ড— বাল্মীকি রামায়ণ।

২। কবিকঙ্কণ চণ্ডী— মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

৩। গঙ্গা সাগর— শম্ভু মহারাজ।

৪। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস— বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

৫। বর্দ্ধমান পরিচিতি— শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সেন, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

৬। মাহেশ মঙ্গল— শ্রাদ্ধানন্দ শর্ম্মা।

৭। প্রভু রুদ্ররাম ও তিনঠাকুর— হরিহর চক্রবর্ত্তী।
৮। আঁটপুরে প্রভু নিত্যানন্দ সেবিত শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও শ্রীশ্রীপরমেশ্বর ঠাকুর :— শ্রীমুরারি মোহন ঠাকুর।
৯। বাংলায় ভ্রমণ (প্রথম খণ্ড) ই, বি, রেলওয়ে প্রচার বিভাগ।
১০। সম্বন্ধ নির্ণয় (প্রথম খণ্ড) (৩য় পরিশিষ্ট) লালমোহন বিদ্যানিধি।
১১। মনসামঙ্গল বা মনসাবিজয় বিপ্রদাস পিপলাই (ডঃ সুকুমার সেন সংকলিত এসিয়াটিক সংস্করণ ১৯৫৩)
১২। প্রশ্নোত্তরে বাংলা সাহিত্যের কথা প্রঃ এস ব্যানার্জি।
১৩। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির শ্রীকানাই ঘোষ, যুগান্তর ২৪।১১।৬৭
১৪। হুগলী জেলার ইতিহাস শ্রীসুধীর কুমার মিত্র।
১৫। কবিয়াল কৈলাস বারুই শ্রীমনীন্দ্রনাথ আশ।
১৬। বাংলার লৌকিক দেবদেবী শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু।
১৭। কী করে কলকাতা হলো শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী।
১৮। যশোহর খুলনার ইতিহাস সতীশ চন্দ্র মিত্র।
১৯। A Sketch of the Administration of the Hooghly District. George Toynbee.
২০। ভানুমতীর নবরঙ্গ। সমরেশ বসু

সমাজ বিস্তারের অন্তরায়

যে সমস্ত কারণে ষোড়শ শতাব্দীতে বিরলবসতি রিষড়ার পূর্বাঞ্চলে ভাগীরথী তীরস্থ ভূভাগে লোক বসতি বিস্তার অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে মোড়পুকুর গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন বংশ বসবাস স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত কারণ গুলিই প্রধান :—

প্রথমতঃ— বাংলা প্রবাদ—'নদীর কূলে বাস, ভাবনা বার মাস।' কখন কি হয় বলা যায় না। ভাগীরথীর জলস্ফীতি বা ভাঙ্গনের ফলে বিপদাশঙ্কা।

দ্বিতীয়তঃ—পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচার, নারী ও বালক হরণ, মগ জলদস্যু ভীতি।

তৃতীয়তঃ—গঙ্গার ন্যায় পবিত্র নদী তীরে বসবাস করলে গার্হস্থ্য ধর্মানুশীলনে নানা প্রকার ধর্মবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠানে মহাপাপের ভয়। ধর্মভয় ছিল তখন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবল, উচ্চ শ্রেণীর ত' কথাই নেই।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে যে পর্যন্ত গঙ্গার জল উঠে, ততদূর পর্যন্ত গঙ্গা গর্ভ। আর গর্ভ থেকে দেড়শ' হাত (২২৫ ফুট) পর্যন্ত তীর এবং তীর থেকে দু'ক্রোশ পর্যন্ত ক্ষেত্র। এই গঙ্গা ক্ষেত্রে দান, ধ্যান, জপ ও হোম করলে যেমন সীমাহীন ফল হয়, তেমনই আবার গঙ্গাতীরে প্রতিগ্রহও ছিল নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত কারণেই, অর্থাৎ গঙ্গানদীর ভাঙ্গনের ফলে তীরভূমি পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসায় বল্লভজীউর গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীন মন্দির পরিত্যাক্ত হয়েছিল :—

'In process of time, the encroachment of the river brought the temple within the limits of 3 hundred feet of the edge of the water, and it became necessary to seek some other abode for the Gods because no brahman is allowed to receive a professional gift or meal within that distance of the sacred stream. It is in reference to this injunction of the Shastras that wealthy natives guard against erecting their houses on the immediate banks of the river."

Calcutta Review Vol. IV. 1845-P-490

এছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল ঘনিষ্ঠতর। সে যুগের মানুষ ছিল প্রধানতঃ কৃষি-নির্ভর, চাষবাসের জমি ছিল সবই প্রায় পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ মোড়পুকুর বামুন আড়ির দিকে। আর সংযোগ পথ ছিল প্রধানতঃ একটিই। এই পথ বেয়েই আসত তখন শস্যও পণ্যবাহী গরুর গাড়ী এবং বারুনী, দশহরা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ,

মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে অগনিত নর নারীর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে গমনাগমন। হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ রাস্তা গুলির মধ্যে এই "রিষড়া-বামুনআড়ি রোড" ছিল অন্যতম। *

*হুগলী জেলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রিষড়ার প্রাচীন বংশগুলি সুপরিকল্পিত ভাবে গঙ্গাগর্ভ থেকে দেড়শ' হাত বা ২২৫' ফুট দূরে তাঁদের বাসভূমি নির্ব্বাচন করেছিলেন।

রিষড়া ও মোড়পুকুরের বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারগুলি অধিকাংশই বহিরাগত। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। মোড়পুকুরের ঘোষবংশও এসেছিলেন সেই যুগে, তাঁদের বংশ তালিকা সেই কথাই প্রমাণ করে। মোড়পুকুরের প্রাচীন বংশগুলির মধ্যে ঘোষ, দত্ত ও সেন বংশই প্রধান।

সমাজ বন্ধনের সূত্রপাত

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই রিষড়ায় সমাজ দেহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সমাজে বাস করতে হলে চাই সকল শ্রেণীর সমাবেশ, চাই ধোপা, নাপিত, কামার, কোমর প্রভৃতি জাতির স্ব স্ব বৃত্তি অনুযায়ী কর্মের সংযোগ। তখন বৃত্তিই ছিল জাতির পরিচায়ক, কেউ কারও বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করলে সামাজিক দণ্ড ভোগ করতে হত। এখনকার মত ইচ্ছানুযায়ী বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা সে যুগে ছিল না।

এখন এখানে বংশ বিস্তারের সুযোগ সুবিধা কি ভাবে ঘটেছিল সেই কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

হুগলী বন্দরকে কেন্দ্র ক'রে তখন ব্যবসা বাণিজ্য চলতে থাকে। সেখানে তখন পর্তুগীজদের ষোল আনা দহরম মহরম। জাহাঙ্গীরের পর যুবরাজ খুরম সিংহাসনে বসেন, নাম হয় সম্রাট সাহজাহান,

যুবরাজ হিসাবে তিনি যখন বর্দ্ধমানে এসেছিলেন তখনই পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে শুনে গিয়েছিলেন। তিনি কাশিম খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন পর্ত্তুগীজদের দমন করার জন্যে।

১৬৩২খৃঃ (বাং ১০৩৯ সাল) এদতঞ্চলে একটা স্মরণীয় বৎসর। কাশিম খাঁ পর্ত্তুগীজদের আক্রমণ করেন হুগলীতে। কিন্তু খুব সহজ হ'ল না দুর্গ জয় করা, শেষ পর্যন্ত বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন দুর্গ প্রাকার। পর্ত্তুগীজরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে শ্রীরামপুরের নিকটে গঙ্গাবক্ষে নৌ-সেতু বন্ধন করা হয়েছিল কিন্তু তা সত্বেও পর্ত্তুগীজরা কযেকখানা জাহাজে করে পালাবার চেষ্টা করে। গোলাবর্ষণে জ্বলন্ত জাহাজগুলো রিষড়ার ধার ঘেঁসে দক্ষিণ অভিমুখে ছুটতে থাকে। পলায়মান পর্ত্তুগীজদের পিছু পিছু মোগল নৌবহরও ছুটতে থাকে। গোলা বারুদের শব্দে সচকিত রিষড়ার অধিবাসীরা কেউ কেউ গাছেব মাথায় উঠে দেখেছিল সেই জ্বলন্ত জাহাজগুলোকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে।

উপরোক্তভাবে পর্ত্তুগীজ দলনের পর থেকেই রিষড়ার বিভিন্ন অধিবাসীরা ভীতিমুক্ত হয়ে ক্রমশঃ গঙ্গার তীর ঘেঁসে ঘর বাঁধতে শুরু করে দিল। দিশী জেলে ডিঙ্গীগুলো আবার ভাসল গঙ্গার জলে, নির্ভয়ে জীবিকা অর্জনের তাগিদে। নদীতীরস্থ গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল দু'একখানা কুঁড়ে ঘর।

হুগলী থেকে পর্ত্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পর থেকে সেখানে ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপিত হল। সম্রাট ও বাংলার সুবাদারের সুনজরকে অবলম্বন করে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলল। গ্রামের অভ্যন্তরেও তাদের কেনা বেচার কারবার ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজবলহাট, হরিপাল প্রভৃতি স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্সি স্থাপিত হয়েছিল।

এই ব্যবসায়ের সূত্র ধরেই রিষড়ায় এসেছিলেন সপ্তগ্রামের পাল বংশ এবং অন্যান্য বৃত্তিধারী পরিবারবর্গ। যশোহর ত্যাগ করার পর কিছু কিছু বারুজীবী নানাস্থান ঘুরে শেষ পর্যন্ত রিষড়ায় এসে ঘর বাঁধেন। বন জঙ্গল কেটে আরম্ভ করে দেন পান চাষ। এর ফলে সৃষ্টি হয় একটা নূতন ব্যবসায়। *

* 'Originally it was a big centre of betel cultivation carried on by people of the Barujibi caste who had a large settlement here.' Hooghly Dist. Gazetteer- A. K. Banerjee 1972.

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ দে বংশের প্রথম আগমনকারীও প্রথমে রিষড়াতে বসবাস স্থাপন করেন এবং হড়বংশীয়দের পৌরোহিত্যে বরণ করেন। সে সম্বন্ধ আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

এই সমস্ত পরিবারবর্গ স্ব স্ব বৃত্তিঅনুযায়ী ছিল এক একটি হস্ত শিল্পের কারিগর এবং তাদের আবাস ভূমিই ছিল তাদের কারখানা; আর পরিবারের আবালবৃদ্ধ বণিতা ছিল সেই কারখানার শ্রমিক। যোগ্যতা অনুযায়ী সকলেই শ্রমদান করত সেই শিল্পকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার কাজে।

কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে একটু পরিস্ফুট করে তোলা যাক:—

মৃৎশিল্প:— কোমর,—হাঁড়ি, কলসী, খুরি, কুঁজো প্রভৃতি গড়ে তুলতে যে মাটির তালকে চাকে ঘুরিয়ে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত ক'রে তোলে, সেই মাটির পাট করতে সাহায্য করে তার স্ত্রী তার পুত্রকন্যা, তুলি দিয়ে রং করা, ছাঁচে ফেলে পুতুল গড়া আবার খেলা ঘরের হাঁড়ি, কুঁড়ি, জাঁতা, শিল, নোড়া সবই কোমরের পরিবারের লোকে-রাই তৈরী করত।

তখনও বিদেশ থেকে চিনে মাটির বা কাঁচের পুতুল বা রং বেরংয়ের কাঠের পুতুল বা খেলনার আমদানি হয়নি, কাজেই হাটে বাজারে এবং রথ স্নান-যাত্রা ও খড়দহের রাসের মেলায় এইসব কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির আদর ছিল এবং বিক্রীও হত প্রচুর পরিমাণে।

কামার শালাতেও সেই একই দৃশ্য। ছোট ছেলেটি হাপরের দড়ি টানছে, কামারের নির্দেশ মত কখনও জোরে কখনও বা আস্তে। জোয়ান ছেলেটি নেহাইয়ের উপর অগ্নিতপ্ত লাল ডগ্‌ডগে্‌ লৌহ-পিণ্ডটাকে ভারি হাম্বর মেরে চেপ্‌টা করছে আর কামার নিজে এক হাতে শাঁড়াসী দিয়ে ধরে অপর হাতে হাতুড়ির ঘা মেরে সেই লোহাটাকে ইপ্সিত রূপ দিচ্ছে।

বাড়ির ভিতরে কামার গিন্নী বাবলা গাছের ডাল কেটে এনে জমা করছে ; কাটারি, কাস্তে প্রভৃতির বাঁট তৈর'র জন্যে।

হাটে যাবাব পথে কেউ বা তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সুযোগে এক ছিলিম তামাকও টেনে নিয়ে পাড়ার খোস খবর বিনিময় করে গামছায় মুখ মুছে গন্তব্য পথে চলে যাচ্ছে।

দু'একখানা গরুর গাড়ী হাঁড়ি কুঁড়ি বা অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বোঝাই করে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে রিষড়ার হাটের দিকে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে।

এই ছিল সে যুগের রিষড়ার বিরল বসতি পল্লীজীবনের চিত্র। উপরোক্ত ভাবে পরিবারের সকলের শ্রমদানের ফলে পণ্যউৎপাদণের ব্যয়ও যথা সম্ভব অল্প হত এবং বাপ ঠাকুরদা'র সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে কৌলিক কাজে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করার ফলে শিল্পের নৈপুণ্য পুরুষানুক্রমে উৎকর্ষ লাভ করত এবং প্রসারিত হত।

অবাঙ্গালী শ্রমজীবীদের সমাগম তখনও ঘটেনি, কাজেই সমাজের সকল প্রকার কাজই তখন নিষ্পন্ন করতো এইখানকারই মানুষ। বিলাস ব্যসনের স্বপ্ন তখনও তাদের মনকে বিষিয়ে তোলেনি ; প্রত্যেকটি পরিবারই ছিল, আপন আপন বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে সুখী।

ক্রমশঃ এক এক শ্রেণীর মানুষ এক একটা নির্দিষ্ট পাড়ায় বসবাস গড়ে তুলতে লাগল। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বামুন পাড়া, সদ্‌গোপ পাড়া, তুলে পাড়া, বাগদি পাড়া, হাড়ি পাড়া, বারুই পাড়া, কোমর পাড়া, গয়লা পাড়া, জেলে পাড়া, পাল পাড়া, চাষা পাড়া, ধোপা পাড়া প্রভৃতি। রাস্তার বিশেষ বিশেষ নামকরণের বালাই তখন ছিল না, লৌকিক গ্রাম দেবতাদের নামেও নামাঙ্কিত হয়েছিল কয়েকটা স্থান যেমন, পঞ্চাননতলা, ষষ্ঠীতলা, কালীতলা, বাবাঠাকুরতলা, শিবতলা ইত্যাদি।

সমাজ জীবনের অঙ্গস্বরূপ প্রায় প্রত্যেকটি জাতির বসবাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কেউ বা এসেছিলেন আত্মীয় স্বজনের আকর্ষণে অথবা বৈবাহিক সূত্রে। কেউবা ব্যবসা বাণিজ্য কিম্বা স্ব স্ব বৃত্তি অনুযায়ী কাজকর্ম লাভের আশায়।

সামাজিক অবস্থা ও রীতি নীতি

সমাজ জীবন যতই পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ততই অধিবাসীদের মধ্যে একটা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে উঠল। বাবাঠাকুর, দাদাঠাকুর, পালমশাই, খুড়ো, জেঠা প্রভৃতি।

উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষালাভের সহজাত সংস্কার থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থারও যে কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল সেকথা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা :—সে যুগে শিক্ষা লাভ হত পাঠশালা, চতুষ্পাঠী বা চৌপাড়ির মাধ্যমে কিন্তু রিষড়ার কোন্ কোন স্থানে বা কাদের দ্বারা উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রে তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে এদেশের মানুষের পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ছিল অত্যন্ত কম।

পরমার্থ লাভের আকাঙ্খাই ছিল অধিকতর, তাই সে যুগের মানুষেরা আত্মপরিচয় বা বংশ পরিচয় লিখে রেখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। পিতৃ পুরুষদের নাম গোত্র তাঁদের কণ্ঠস্থ ছিল; তর্পণ বিবাহাদি সংস্কারে যে গুলো সচরাচর ব্যবহৃত হত। বিদেশীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথাই ছিল সার্বজনীন।

তপনবাবু লিখেছেন—'যে দেশে মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে তার চিতাভস্ম পর্যন্ত জল ঢেলে সাফ করে দেওয়া হয় সে স্থলে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে দেশের মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উপর আস্থা কত কম।

মুসলমান আর ইংরেজরা সময়ের যথেষ্ট মূল্য দেন। সেই কারণে তাঁরা কালের একটা হিসেব রেখেও চলেন। তাছাড়া তাঁরা পার্থিব রাজত্বকে স্বর্গরাজ্যের চেয়ে ঢের বেশি কাম্য বলে মনে করেন। তাই মর্ত্যলোকের ঘটনাগুলো তাঁদের কাছে একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। পাছে এগুলো লোকের স্মৃতি পথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই ভয়েই তো সুযোগ পেলেই তাঁরা এগুলোকে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেন। শুধু তাই নয়—মরার পরও কবরের উপর ইমারত স্তম্ভ ফলক প্রভৃতি রচনা ক'রে আবার তার গায়ে জন্ম মৃত্যুর সন তারিখ নাম ধাম, পিতৃপুরুষ ও নিজের পরিচয় দিয়ে স্ব স্ব কীর্ত্তি কলাপের বিবরণ লিখে রেখে সর্বগ্রাসী কালকে জয় করতে চান।

তৎকালে কি ভাবে বিদ্যার্থীদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে ক্রমে ক্রমে যুক্তাক্ষর ও বানানে পারদর্শী করে তোলা হত, তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন দ্বিজ মাধব তাঁর 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে :—

"পড়য়ে কুমার শ্রীরপতি।
পুণ্যতিথি গুরুবারে
কঠিনী লইয়া করে
পূজা করিয়া সরস্বতী;
'ক' বর্গ যে পঞ্চাক্ষর

লেখি দিল ক্ষিতিতল,
প্রতি অক্ষর জানায়ে।”

উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে—সে যুগে গুরুমহাশয় প্রথমে ঘরের মেঝেতে অক্ষর লিখে পড়ুয়াদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিতেন। তারপর মোটামুটি শব্দের বানান জ্ঞান হয়ে গেলেই ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ হত। কবি লিখেছেন :—

পূজা করি সরস্বতী আরম্ভ করিল পুঁথি
জানিবারে সন্ধির প্রকার।
সূত্র সন্ধি করিয়া সুসম পদ্মেতে গিয়া
শব্দ সন্ধি জানিল অপার॥
চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকারে জানিল কারণ।
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পাবগ হইল ব্যাকরণ॥”

সে যুগে লেখা পড়ার মধ্যে লেখাটাই ছিল প্রধান। প্রথমে কলা-পাতে, তারপর তালপাতায় লেখা সুরু করত পড়ুয়ারা, কাজল ও কালির ঘরে কাজ করলে তার দাগ লাগা স্বাভাবিক তাই তো কথায় বলে:—

‘হাতে কালি মুখে কালি, বাছা আমার লিখে এলি,
হাতে কালি, মুখেকালি, কালি মাখা গায়,
লিখে এল বাছা আমার মায়ে ঝিয়ে কয়।’

পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকর্মের পরেই ছেলেদের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হত। তার আগেই শুভদিনে (বিদ্যারম্ভে গুরুশ্রেষ্ঠ) ‘হাতে খড়ি’ অনুষ্ঠান হত। তারপর পাততাড়ি বগলে, মাটির দোয়াতের গলায় দড়ি বেঁধে কঞ্চির কলম নিয়ে পাঠশালা যাতায়াত। ‘আগে লেখা, পরে পড়া, তাকেই বলে লেখাপড়া।’ গোলমাল, ঝগড়াঝাটি না হলে তবেই তো মনঃসংযোগ সম্ভব। তাই কথায় বলে—‘একে গুণ গুণ, দুয়ে পাঠ। তিনে গোলমাল, চারে হাট।’

লেখা পড়ায় উৎসাহ দেবার জন্যেও ছড়ার অভাব ছিল না। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে সে যুগের শিক্ষাচিত্র:—

'পড়লে শুনলে দুধভাতি, না পড়লে ঠেঙার গুঁতি ॥'

'লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চাপে সেই।'

ঘড়ির প্রচলন না থাকায়, প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক লক্ষণ থেকে সকলে সময়ের আন্দাজ করে নিত এবং সেইমত সংসারের কাজ গুছিয়ে রাখত। স্নেহময়ী জননীরা জানতেন যে 'ডাক পড়ার পর পাঠশালার ছুটি হবে তাই সব কাজ ফেলে রেখে ছেলের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করে রাখতেন—ঘরে ফিরেই ছেলে যে কিছু খেতে চাইবে:—

'আগে লেখা, পরে পড়া, তার পরে ডাক।
ঘরের ঝি বলে এখন বাইরের কাজ থাক ॥'

ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে লেখা পড়ার প্রবণতা ছিল সমধিক। কারণ, অন্য জাতের অন্ন সংস্থানের তবু একটা উপায় হতে পারবে কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরে মূর্খের খোঁটা পদে পদে:—

'বামুনেব ঘরে মূর্খ হলে, ক্রিয়া পণ্ড করে।
রোজার ঘরে মূর্খ হলে, রোগীর দফা সারে ॥'

লোকশিক্ষার প্রতি সাধারণ গৃহস্থ থেকে পণ্ডিত সমাজ সকলেই সমানভাবে সচেতন ছিলেন কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের শিক্ষার কথা কেউ চিন্তাও করতেন না। স্ত্রী-শিক্ষা একরকম উঠেই গিয়েছিল। সে যুগের লোকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে 'লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা বিধবা হবে।'

উপরোক্তভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা কিছু কিছু চালু থাকলেও রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসীরা যে অধিকাংশই নিরক্ষর ছিলেন সে-কথা অস্বীকার করা যায় না, তার কারণ, অল্প বয়স থেকে কৌলিক বৃত্তি অনুযায়ী শিল্পকার্যে পিতা বা অভিভাবকের সহকর্মী হিসাবে কাজ করার জন্যে বাল্য বয়সে বিদ্যা শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

লেখা পড়ার প্রসঙ্গে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি কি ধরণের ছিল তারও কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঠশালাতে বাংলা ভাষা এবং টোল বা চৌপাড়িতে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হত। পাঠশালায় পড়ুয়াগণ 'সিদ্ধিরস্তু' বলে পাঠ আরম্ভ করত এবং নাম্‌তা, শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাবুড়ির হিসাব, কাঠাকালি, বিঘাকালি, মনকষা প্রভৃতি মুখে মুখে অভ্যাস করত। শুভঙ্কর দাসের ছাপান ধারাপাত তখন ছিল না। যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হত বা পড়ান হত, তা সবই তালপাতায় লেখা পুঁথি থেকে।

মোগল আমলে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। টোডরমলের ব্যবস্থা মত সমস্ত সরকারী হিসাব পত্র পারসী ভাষায় রক্ষিত হত, তাই কায়স্থ সন্তানগণ সরকারী চাকুরী লাভের আশায় পারসী ভাষা শিক্ষায় অধিক আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলন। ব্রাহ্মণ সন্তানগণও অবস্থার চাপে পড়ে কিছু কিছু পারসীভাষা আয়ত্ব করতে আরম্ভ করেন। দু'একটা পারসী বয়েদ না জানলে ভদ্র সমাজে তখন মেশা যেত না। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী রচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী বাংলা ভাষায় রচিত হলেও তার মধ্যে পারসী শব্দের প্রাচুর্য সেই যুগের প্রভাবাধীন। ছড়ায় আছে :—

> "চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাকি জ্বালে বাতি।
> মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি॥"

কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের মত কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারতও পাঠ এবং শ্রবণ করা সে যুগে লোকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করত তাই কাশীরামদাস তাঁর ভণিতায় লিখেছেন :—

> 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
> কাশীরামদাশ কহে (ভণে) শুনে পুণ্যবান॥'

ছাপাখানার অভাবে তখন এই সমস্ত সুবৃহৎ মহাকাব্য পুঁথির আকারে লেখা হত এবং সে কাজ একমাত্র সংস্কৃত-অভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সমস্ত পুঁথি লেখা হত তখন বাংলা বা দিশী কালীতে যার উজ্জ্বলতা চির অমলিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঘরে ঘরে এই কালি প্রস্তুত করার পদ্ধতি বা ফরমূলা প্রায় সকলেরই জানা ছিল।

'তিল ত্রিফলা সিমূল ছালা, ছাগ দুগ্ধে ক'রি মেলা।
লৌহ পাত্রে লোহার খসি, ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি ॥'

তালপাতা ছাড়া তুলোট কাগজেও পুঁথিপত্র লেখা হত এবং সে কাগজ তৈরীর পদ্ধতিও লোকের জানা ছিল, কলে তৈরী কাগজের প্রচলন না হওয়ায় ঘরে ঘরে তুলোট কাগজও প্রস্তুত করে নেওয়া হত। এই পুঁথি লেখার কাজে রিষড়ার হড় বংশীয়েরা সমধিক পটুতা অর্জন করেন বলে জানা যায়। এই সমস্ত পুঁথির লেখাগুলি হত :—

'সমানি সমশীর্ষাণি, ঘনানি বিরলানি চ।'

পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতামুখী বিদ্যার কদর ও সুফল সকলে অনুভব করত। ছেলেকে প্রকৃতপক্ষে সৎ ও শিক্ষিত করে তোলাই ছিল সকলের কাম্য। তাই কথায় বলে :—

'পড়বি তো পড়া পো, না পড়াবি তো সভায় থো ॥'

সেখানে, অর্থাৎ সৎসঙ্গে আর কিছু হোক বা না হোক, সহবৎ শিক্ষাটা অন্তত লাভ হবে।'সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।'

তখন ছেলেদের কান বেঁধান ও মাথায় বড় বড় চুল রাখা প্রথা ছিল। ছেলেরা অনেক বয়স পর্যন্ত হাতে বালা বা বাজু পড়ত। কোন কোন ছেলের মাথার ঝুঁটিতে রূপোর বকুল ফুল বেঁধে দেওয়া হত। তখনকার প্রায় সকল স্তরের মধ্যবিত্ত ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ ;

টেকচাঁদ ঠাকুর তাঁর "আলালের ঘরে দুলাল' নামক পুস্তকে এই রকম বর্ণনাই দিয়েছেন।

"বালীর বেণীবাবু প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম সকল দেখিয়া পুস্তক লইয়া বিদ্যানুশীলন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক—গলায় মাদুলি—কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি গড় করিল।'

বেশভূষা :— দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের ফলে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে পোষাক পরিচ্ছদে খানিকটা মুসলমানি ঢং বা প্রভাব ঢুকে পড়েছিল, রূপার অলংকার ব্যবহারের রীতিও এই যুগেরই অবদান। মুসলমান রমণীদের 'বোরখার' অনুকরণে হিন্দু ঘরের স্ত্রীলোকেরাও ঘোমটায় মুখ ঢেকে. রাখতেন। বিশেষ করে গুরুজনদের বা পর-পুরুষের সামনে মুখের আবরণ উন্মোচন করতেন না, হঠাৎ কেউ এসে গেলে তড়িং গতিতে সলজ্জভাবে জিভ কেটে ঘোমটা টেনে দেওয়া মহিলা মহলে একটা আর্টের ইঙ্গিত করত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে বেলা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কোন মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস করে তার ঘোমটা নামত নাগের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ ক'রে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরুবার পাল্কিতেও।

অলংকার হীন দেহ কেউই রাখত না, অন্তত কোমরে একটা ঘুন্সী আর তাতে একটা চাবি বাঁধা থাকত। সধবারা হাতে খাড়ু, লৌহ চুড়ি, গালার রুলি, এবং সিঁথেয় সিন্দুর ব্যবহার করতেন। সাধারণ পোষাক ছিল আটপৌরে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি ও গামছা. মেয়েরা একখানা মোটা শাড়িতে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখতেন, বস্ত্রাঞ্চলই ঘোমটারূপে ব্যবহৃত হত।

বাবুয়ানা পোষক ছিল, গায়ে মেরজাই, মাথায় কামরাঙ্গা টুপি অথবা পাগড়ী, পরিধানে ধুতি, কাঁধে উত্তরীয় ও পায়ে পাদুকা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ধুতি উত্তরীয় এবং পায়ে খড়ম ব্যবহার করতেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই শিখা ধারণ করতেন, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি জল আচরণীয় সকল জাতিরই শিখা রাখার প্রথা ছিল। এখন

যেমন মাথার সম্মুখ ভাগের চুল বড় রেখে পিছন দিকের চুল ছোট ক'রে কাটা হয়, সে যুগে চুল কাটার রীতি ছিল ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ মাথার সম্মুখের কেশ ছোট করে পিছনে ক্রমশঃ বড় রাখা হত। দাড়ি ও গোঁফের তোয়াজ তদ্বিরও বড় কম হত না। টানা ভ্রূ তখনকার সখের জিনিষ ছিল, ছেঁটে কেটে বা ভ্রূহীন স্থানে ক্ষুর বুলিয়ে ভ্রূ গজিযে টানা ভ্রূ তৈরী করা হত।

একমাত্র রোগী ও শিশু ছাড়া সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা ত্যাগের প্রথা ছিল সার্ব্বজনীন, বাড়ীর মেয়েদের অন্ধকার থাকতেই উঠতে হত ; কারণ পায়খানা না থাকায় মলমূত্র ত্যাগের জন্য পুকুরের পাড়ে ঝোপ ঝাড়ের অন্তরালে অথবা বাঁশবনে পরিচিত স্থানে যেতে হত। তারপর প্রাতঃস্নান, কাপড় কাচা ইত্যাদি গৃহকর্ম প্রত্যেক ঘরেই মেয়েদের করতে হত। ধনী বা সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতেই ঝি বা চাকর থাকত। সূর্যোদয়ের পরও বিছানায় শুয়ে থাকা কেবল যে লজ্জার ব্যাপার ছিল তাই নয়, সে ছিল একটা অলুক্ষণে ব্যাপার। বিশ্ব কবির একটা গানে আছে :—

'যামিনী না যেতে' জাগালে না কেন,
বেলা হল, মরি লাজে।'

গৃহকর্ম বলতে গো-সেবা ও গো-শালার কাজও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল, গোপালন ছিল সে যুগে গার্হস্থ্য ধর্মের অন্যতম অঙ্গ। অপালন নিমিত্ত গোশাবক থেকে দুগ্ধবতী গাভীর মৃত্যুর জন্যে গৃহকর্ত্তা প্রায়শ্চিত্তার্হ হতেন। হিন্দুদের পক্ষে গরু বিক্রয় করা পাপ বলে পরিগণিত হত। এক একটি গরু ৩।৪ সের করে দুধ দিত বলে অনেক গৃহস্থই তখন দুধের সর তুলে তা থেকে খাঁটি গব্য ঘৃত তৈরী করতেন। দীন দরিদ্র ব্যতীত সেকালে সকলে দুধ ভাত, মাছ ও দাল আহার করতেন এবং সম্ভবতঃ নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করে পরিপাক করার ফলে শারীরিক বল লাভ হত।

বৈদ্য গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"আরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংস পয়ঃসু চ"

চলিত কথায় বলে :—

''ঘৃতে করে মজ্জা বৃদ্ধি, দুগ্ধে বৃদ্ধি বল, মাংসে করে মাংস বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল'।

একসের দুধ ধরে এমন বড় জামবাটি এখনও অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়। কোন্নগর নিবাসী ৺শিবচন্দ্র দেবের জীবনী থেকে এই প্রসঙ্গে একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

''কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসবে মহর্ষিদেব একাধিকবার আচার্যের কাজ করেছেন। একবার মহর্ষিদেব সন্ধ্যাকালে শিবচন্দ্রের বাড়িতে আসেন, সঙ্গে ছিলেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের গৃহ শিক্ষক অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ। বৈঠকখানার বদলে শিবচন্দ্রের বাড়ীর পুকুরের বাঁধানো ঘাটে মহর্ষি দেব বসলেন। * * * পুকুরের ঘাটে বিশ্রাম শেষে মহর্ষিদেবের জন্য একটি বড় জামবাটিতে করে প্রায় তিনসের পরিমাণ দুধ আনা হত। মহর্ষিদেব তা পান করতেন এবং রাতের আহার শেষ হত।'

লোকের পরিপাক শক্তি তখন অধিক ছিল, কাজেই দু'একসের দুধ খেতে কোনও ভাবনা চিন্তা হত না।

আমিষ ও নিরামিষ দু'রকমের আহারই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই নিরামিষ-ভোজী ছিলেন এবং প্রায় সকলেই পর্বদিনে, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ ভোজন করতেন না, বিধবাদের তো কথাই নেই।

অনেকেই একাহারী ছিলেন, রাত্রে খই মুড়ি ও দুধ খেতেন। দিনের বেলায় আহার ছিল এখনকার ৪।৫ জনের আহার, তাই নিমন্ত্রণের প্রথা হয়েছিল –'মধ্যাহ্ন ভোজনের আর রাত্রে জলপানের'।

তখন লুচি, মণ্ডা, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির এত চল ছিল না, ব্রাহ্মণেরা ফলার ভোজনেই অধিক তৃপ্তি লাভ করতেন, তাই

'ফলারে বামুন' বলে একটা কথার চল আছে। এই ফলার আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ ছিল। ঊণবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' নাটকে উক্ত ত্রিবিধ ফলারের বর্ণনা আছে; তার মধ্যে মধ্যম ও অধম ফলার হল নিম্নরূপ :—

মধ্যম ফলার :— "সরু চিড়ে শুকো দই, মত্তমান ফাকা খই
মাসা মোণ্ডা পাতা পোরা হয়
মধ্যম ফলাব তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে সবে,
দক্ষিণাদি ইহাতেও রয়॥

অধম ফলার :— গুমো চিড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই,
পেট ভরা যদি কিছু হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথাফাটে, হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়"।

ভোজনের পরিমাণ যেমন অধিক ছিল; তিথি ভেদে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিধি নিষেধও তেমনি কঠোর ভাবে পালিত হত। প্রাচীনা রমণীরা লেখা পড়া না জানলেও শুনে শুনে সেই সব বিধি নিষেধ মুখস্থ করে রাখতেন এবং তদনুযায়ী খাদ্য দ্রব্য পাক করতেন, বা পুত্রবধুদের সেই মর্মে নির্দেশ দিতেন।

"প্রতিপদে অর্থহানি কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে। দ্বিতীয়াতে বৃহতীতে বিহীন ভোজনে॥
শুক্রবৃদ্ধি হয় পটোল খাইলে তৃতীয়ায়। মূলাহারে চতুর্থীতে ধনহানি পায়॥
পঞ্চমীতে শ্রীফলে কলঙ্ক অতিশয়। ষষ্ঠীতে খাইলে নিম্ব পশুযোনি হয়॥
তালে শরীরের নাশ সপ্তমীর যোগে। অষ্টমীতে মূর্খ হয় নারিকেল ভোগে॥
অলাবু গোমাংস তুল্য নবমী তিথিতে। দশমীতে গোমাংস সদৃশ কলম্বীতে॥
সীমে মহাপাপ একাদশীর নিয়ম। দ্বাদশীতে পুঁই শাক ব্রহ্মহত্যা সম॥
ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকু যদি খায়। সন্তানের হানি হয় বিধানে জানায়॥
চতুর্দশী তিথিতে দিবসে নরগণে। চিররুগ্ন হয় মাসকলাই ভক্ষণে॥
অমাবস্যা পূর্ণিমায় যদি খায় মাংস। পূর্ণরূপে মহাপাপে প্রকাশে শাপাংশ॥"

ছড়ার এই সব বিধি নিষেধ প্রাচীনারা বৌ-ঝিয়েদের শেখাতেন এবং সেগুলি পালন করেও চলতেন। জ্যোতিষের অন্যান্য বহু বচনও তাঁদের ছড়ার আকারে মুখস্থ থাকত :—

"চতুর্দশী অমাবস্যা অষ্টমী পূর্ণিমা। সংক্রান্তি এই পঞ্চ দিন পর্বনামে সীমা॥
স্ত্রীগমন অধ্যয়ন তৈলমক্ষণ দেহে। আর গর্ভাধান নিষেধ জ্যোতিষেতে কহে॥"

হাঁচি, টিকটিকির ডাক ও স্থান বিশেষে জ্যেটি পতনের ফলাফলও তাঁদের কণ্ঠস্থ ছিল, আরও ছিল ডাক ও খনার বচন অনুযায়ী বৃষ্টি ও শস্য গণনার রীতি। কারণ সে যুগ ছিল শস্যগত প্রাণ। ক্ষেতের ফসলের উপরই ছিল সকলে প্রাণ ধারণের জন্যে নির্ভরশীল।

"কর্কট ছরকট সিংহ শুকা কন্যা কাণে কান। বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখবি ধান। জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা॥ যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি, তবে হবে ধানের সৃষ্টি॥ যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি। শস্যের ভার না সয় মেদিনী।"*

*কর্কট=শ্রাবণ সিংহ=ভাদ্র, কন্যা=আশ্বিন, তুলা=কার্তিক মাস।

"পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়। সেই বৎসর বন্যা হয়॥ আমে ধান, তেঁতুলে বান॥ বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান॥"

খনার বচন অনুযায়ী যাত্রার শুভ সময় :—

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা। রবিগুরু মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফাসাফ্সা। ডাকরে পাখী না-ছাড়ে বাসা। উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা, ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা। উড়ে পাখী খায় না, তখনি কেন যায় না॥"

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ আর খনার বচনের উপর তেমন আস্থা রাখে না, কিন্তু সে যুগে এই সমস্ত লক্ষণ দেখেই লোকে শস্যের তারতম্যের একটা পূর্বাভাস পেতেন এবং নৈসর্গিক উপদ্রব বা অনাবৃষ্টি মানুষের কৃত পাপের ফল বলে বিশ্বাস করতেন। তাই

প্রত্যেকটা বিধি নিষেধ তাঁরা যতদূর সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করতেন।

হুগলী বন্দরের পতন ও কলকাতার অভ্যুদয়

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রিষড়ার অধিবাসীরা যখন উপরোক্ত সামাজিক আচার আচরণ ও রীতি নীতির মধ্যে তাঁদের জীবন চর্যা পরিচালিত করছিলেন ঠিক সেই সময় রিষড়ার আশে পাশে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী একটা বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করে।

হুগলী থেকে পর্ত্তুগীজরা বিতাড়িত হবার পর থেকে ইংরেজরাই সেখানে জাঁকিয়ে বসেছিল। বেচাকেনার কারবার তখন তাদের বেশ জমজমাট।

জব চারনক তখন হুগলীর ইংরেজ কুঠীর এজেন্ট। আর শায়েস্তা খাঁ বাংলার নবাব। খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মধ্যে চলছিল মন কষাকষি। কাশিম বাজারে থাকা কালীন চারনকের বিরুদ্ধে তেতাল্লিশ হাজার টাকার ডিক্রি হয় কিন্তু তিনি সে টাকা না দিয়ে হুগলীতে পালিয়ে আসেন। রাগের চোটে শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের কাশিম বাজারের কুঠি দখল করে নিলেন।

উপরোক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক'রে হুগলীতে একটা খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে উঠে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। (বাং ১০৯৩) সে যুদ্ধে যদিও ইংরেজদেরই জয় হয়েছিল কিন্তু চারনক হুগলীতে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে মাস দু'একের মধ্যেই সমস্ত লোক লস্কর আর জিনিষ পত্তর নিয়ে জাহাজে চড়ে হুগলী ছেড়ে চললেন বালেশ্বরের দিকে। পথের মাঝে চোখে পড়ল সুতানটির কয়েকটা মাটির ঘর আর খড়ের চাল। সেইখানেই নেমে পড়লেন।

"Some unpleasant circumstances cropped up which render the continuance of the English at Hooghly almost impossible. Accordingly their chief Job Charnock, left

the place with mingled feelings of rage, regret and disgust and going down the river founded Calcutta. The founding of Calcutta gave a death blow to Hooghly".

Hooghly Past & Present- S. C. Dey. B. A. B. L.

শায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরেজরা কিন্তু সুতানটিতে সুস্থির হয়ে বসতে পারেন নি, পালাতে হয়েছিল হিজলীতে। সেখানের জল হাওয়া তাঁদের সহ্য হল না, ইংরেজরা পটাপট মরতে লাগলেন। এদিকে শায়েস্তা খাঁ বিদায় নিলেন, এলেন ইব্রাহিম খাঁ, তিনি অভয় দিলেন ইংরেজদের। দিয়ে পাঠালেন নূতন ফারমান, সাল সাল তিন হাজার টাকার মালগুজারি দিয়ে নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাও তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, কোনও ভয় নেই।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বহু ঘাটের জল খেয়ে চারণক সেই যে এলেন সুতানুটিতে আর উঠতে হয়নি। বসে গেলেন পাকাপোক্ত ভাবে। সুরু হয়ে গেল কলকাতার জয়যাত্রা। দেখতে দেখতে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সূর্য অস্তমিত হয়ে সেই যে পূর্ব গগনে উদিত হল তার আর কোনও হের ফের হয়নি আজও।

এমনি করেই হুগলীর বন্দর উঠে গেল কলকাতায়, বাণিজ্য জাহাজ আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, সপ্তগ্রামের পর হুগলীর বাড় বাড়ান্তর দিনও এমনি ক'রে ফুরিয়ে গেল। সবায়ের নজর পড়ল তখন সুতানুটি বা কলকাতার দিকে। দেশী বণিক কুলও তাঁদের বাস তুলে এগুতে লাগলেন কলকাতার দিকে। মধ্যপথে পড়ল রিষড়া, উত্তরে হুগলী আর দক্ষিণে কলকাতা প্রায় সমদূরবর্ত্তী। আবার একদফা লোক সমাগম হতে লাগল রিষড়ায়; কলকাতায় ব্যবসা বাণিজ্যের আকর্ষণে।

বিভিন্ন পণ্যবাহী দু'চারখানা নৌকা নিত্য যাতায়াত সুরু ক'রে দিল রিষড়া আর কলকাতার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। মাঝি মাল্লা-রাও বহন করে আনতে লাগল কলকাতা কালচারের কাহিনী।

সংবাদ পত্রের অভাবে সংবাদ পরিবেশন তখন লোক মুখেমুখেই প্রচারিত হতে লাগল।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ

পাঁচটা বছর শান্তিতে কাটতে না কাটতেই হুগলী জেলায় এসে গেল এক নূতন উৎপাত। ১৬৯৬ খৃঃ তালুকদার শোভা সিংহ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে লুটপাট করতে করতে বর্দ্ধমানে এসে উপস্থিত। বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায় তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধে নিহত হলেন, শোভা সিংহ রাজবাড়ী দখল করে রাণী আর রাজকন্যাকে বন্দী করে নিজেকে রাজা বলে জাহির করে দিলেন।

এরপর শোভা সিংহ সদলবলে লুঠতরাজ করতে করতে একেবারে হুগলী পর্যন্ত এসে হুগলী দখল করে বসলেন। কটক থেকে পাঠান সর্দার রহিম খাঁ এসে তাঁর দল ভারি করে তুললেন।

ইংরেজরা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার অজুহাতে কলকাতায় একটা সামান্য দুর্গও গড়ে তুললেন।

রিষড়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার অধিবাসীরা শোভাসিংহের দলবলকে ঘরের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহ দমনে নবাবের উদাসীনতার বিরুদ্ধে মুখে কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে গুমরাতে লাগলেন, দেশের লোকের প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি না থাকায় অনেকেই বিদেশী বণিকদের সাহায্যের আশায় তাঁদের মুখাপেক্ষি হয়ে উঠলেন। তাঁরা আপন আপন এলাকায় দুর্গ নির্মাণ করে প্রকারান্তরে এদেশবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষাকর্ত্তা রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

বাদশাহ আওরংজীব সংবাদ পেয়ে তাঁর পৌত্র আজিম উশ্মানকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনভার দিয়ে বিদ্রোহী দমনে পাঠিয়ে দিলেন।

শোভাসিংহ তার আগেই বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে প্রাণ হারালেন। বন্দিনী রাজ কুমারী সত্যবতীর ধর্মনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলে রাজকুমারী নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরে লুকায়িত তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে তাঁকে নিহত করেন এবং নিজেও আত্মঘাতিনী হন। মহিয়সী রমণীর সতীত্ব রক্ষার কাহিনী লোক-গাথার মাধ্যমে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন।

বাৎসরিক খাজনার বিনিময়ে ইংরেজরা এতদিন সুতানটিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাবার অধিকারটুকু ভোগ করছিলেন, কল-কাতার মালিকানা স্বত্ব ছিল সার্বন চৌধুরীদের হাতে। ওদিকে তখন কলকাতায় বহু ইংরেজ আসতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ইংরেজরা তাই পাশাপাশি তিনখানা গ্রাম—উত্তরে সুতানুটি, মধ্যে কলকাতা আর দক্ষিণে গোবিন্দপুর কিনে নিলেন ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর মাত্র তেরশো টাকায়, গ্রামগুলো কেনবার অনুমতি পাবার জন্যে তাদের অবশ্য নবাব সরকারের জিনিষপত্রে আর নগদে ষোলহাজার টাকা উপহার দিতে হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়ে গেল, একশোটা বছর গড়িয়ে গিয়ে ১৭০০ সালে পদার্পন করলো। কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার আদব কায়দা, নূতন কালচার সবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। যার ফলে এতদঞ্চলের শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক রীতি, নীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ ভাবেই প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিল।

অষ্টাদশ ও ঊণবিংশ শতাব্দীতে রিষড়ার সামাজিক জীবনে যে সমস্ত উন্নয়ণ মূলক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল তা সবই উপরোক্ত কলকাতা কালচারের সংমিশ্রনের উপর নির্ভরশীল, একথা আমাদের সব সময়েই স্মরণ রাখতে হবে।

আকর গ্রন্থরাজি।

১। স্মৃতি গ্রন্থ—রঘুনন্দন
২। হুগলী জেলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র।
৩। পাণ্ডুলিপি—পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪। নদীয়া কাহিনী—কুমুদ নাথ মল্লিক।
৫। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস—সতীশ চন্দ্র মিত্র।
৬। বাংলার ইতিহাস—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল।
৭। কী করে কলকাতা হল—পূর্ণেন্দ্র পত্রী।
৮। পুরাতনী—হরিহর শেঠ।
৯। পলাশীর যুদ্ধ—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়।
১০। প্রবাদে শিক্ষাচিত্র—গৌর হালদার (যুগান্তর—২০। ১১। ৬৬)
১১। মধ্যযুগে বাঙালীর বিদ্যার্থী সমাজ ও পাঠ্যতালিকা—শৈলেন্দ্র কুমার হালদার (আনন্দ বাজার—৮। ৮। ৭১)
১২। কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ।
১৩॥ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৪। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু।
১৫। প্রাচীন শ্রীরামপুর পত্রিকা—
১৬। বর্দ্ধমান পরিচিতি—শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সেন ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী।

অষ্টাদশ শতাব্দী

বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য কাল মুখ্যতঃ অষ্টাদশ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলী। কাজেই পূর্বোক্ত ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বিবরণ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে পারে, কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রিষড়ার সমাজ জীবনে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছিল তার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এবং রিষড়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে বর্ত্তমান আলোকোজ্জ্বল অবস্থায় উত্তরণের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়, কারণ পূর্বোক্ত দু'টী যুগের ইতিহাসই হল বর্ত্তমান যুগের পশ্চাৎপট।

বিভিন্ন বংশ পরিচয়

সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বণিক সমাজ ও নবশাখগণের সহ অবস্থান অপরিহার্য একথা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব অধ্যায়ে 'হড়' ও 'পাকড়াশী' বংশের রিষড়ায় আগমনের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে এবং শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ দে বংশের রামভদ্র দে মহাশয় কর্তৃক রিষড়ার কিছুকাল বাস করার কথাও বিবৃত হয়েছে। এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে গন্ধবণিক সমাজভুক্ত পাল বংশের গোপাল চন্দ্র পালের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁরা সপ্তগ্রামের পাল বংশ এবং গঙ্গাতীর চাকলার অন্তর্গত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইনি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে রিষড়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে গঙ্গার উত্তর-কূলেই গন্ধবণিকদের বাস ছিল—"গঙ্গার দুকূল

কাছে, গন্ধবেণে যত আছে, খুল্লনার যোগ্য নাহি বর।" দত্ত, দাঁ, বসু, লাহা প্রভৃতি উপাধিধারী গন্ধবণিকগণের উল্লেখও ঐ প্রসঙ্গেই দেখতে পাওয়া যায়।

রিষড়ার পশ্চিমভাগে মোড়পুকুরের ঘোষ বংশ তখন বেশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এবং বহু বিস্তৃত-জমি জায়গার মালিক। পরবর্ত্তী যুগে এই বংশের বহু বিস্তৃতির ফলে তাঁদের শাখা প্রশাখা অন্যত্র বসবাস স্থাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

'কায়স্থ পরিচিকা' নামক গ্রন্থ অনুযায়ী এই প্রাচীনতম ঘোষ বংশের যিনি প্রথম মোড়পুকুরে এসে বসবাস স্থাপন করেন তিনি হলেন দুর্গাচরণ ঘোষ।

'কায়স্থ পরিচয়' নামক পুস্তকে শ্রীবসন্ত কুমার বসু উল্লেখ করেছেন যে কুমারটুলির ঘোষ-মজুমদার বংশ একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ, ইঁহারা আকনা সমাজভুক্ত। ইঁহাদের পূর্ব নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী মোড়পুকুর নামক গ্রাম।

এই পুস্তকের অন্যত্র তিনি কলুটোলার বংশ পরিচয় প্রসঙ্গে ঐ একই কথা লিখেছেন। মকরন্দ ঘোষের বিংশতি পুরুষ অধস্তন নরহরি ঘোষ থেকে এই বংশের শাখা বংশক্রম আরম্ভ হয়। নরহরি শোভাবাজার রাজবংশের রামচরণ দেব ব্যবহর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ ক'রে শোভাবাজারে বসবাস করেন। সাবজজ নগেন্দ্রনাথ এই বংশের সন্তান। নরহরি তিনপুত্র রেখে পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন, মধ্যম শিবচন্দ্র (নিঃসন্তান) এবং কনিষ্ঠ কাশীনাথ। রাধামোহনের বংশধরগণ শোভাবাজার বালাখানায় বাস করেন। তাঁরা 'বালাখানার ঘোষ' নামে পরিচিত।

কনিষ্ঠ কাশীনাথের চার সন্তান, কালিকা প্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ ও ভগবতী প্রসাদ। শ্যামা প্রসাদ চারিপুত্র রেখে

১৮৭২ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তাঁর চার পুত্র হলেন যথাক্রমে —শ্রীনাথ, প্রিয়নাথ, ব্রজনাথ ও যদুনাথ।”

শ্রীবসন্ত কুমার বসু তাঁর “শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস” নামক পুস্তকে উপরোক্ত প্রিয়নাথ সম্বন্ধে লিখেছেন :—

“স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায় প্রিয়নাথ ঘোষ বাহাদুর শ্রীরামপুর নগরীর সম্ভ্রান্ত ঘোষ বংশের সন্তান। ইঁহার পিতার নাম শ্যামাচরণ (শ্যামা প্রসাদ) ঘোষ। ইঁহাদের পূর্বনিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত রিষড়া গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী মোড়পুকুর গ্রাম।

ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এল, এ, পরীক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন এবং এক বৎসর অধ্যয়ন করিবার পর রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্নমেন্টের ইরিগেশন বিভাগে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের কার্যে ব্রতী হন। পরে রেলওয়ে বিভাগে বদলী হন, ইনি শতদ্রু ও বিপাশার সেতু নির্ম্মান কার্যে সিদ্ধিলাভ করায় গভর্নমেন্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। তদবধি গভর্নমেন্ট ইঁহাকেই প্রধান প্রধান সেতু নির্মান কার্যে নিয়োগ করিতেন এবং ইনিও দক্ষতার সহিত সেই সকল কার্য সুসম্পন্ন করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং পরে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ হইতে এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ারের পদে উন্নীত হন এবং ইঁহার বেতনও মাসিক সহস্র মুদ্রা হয়। ১৮৮৬ খৃঃ মহামান্য ভারত গভর্নমেন্ট ইঁহাকে প্রথমে রায়সাহেব ও পরে রায়-বাহাদুর উপাধি প্রদান করতঃ সম্মানিত করেন।

তিনি বিনয় সৌজন্য ও দানশীলতায় সর্ব্বজন প্রিয় হইয়া ‘প্রিয়’ নাম সার্থক করিয়াছিলেন”—ইত্যাদি।

দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয় যখন মোড়পুকুরে এসে বসবাস স্থাপন করেন, সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা কেমন ছিল সে কথা অনুমান করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। শতাধিক বর্ষ পূর্বে রচিত গ্রন্থাদিতে বিরল বসতি জঙ্গলাকীর্ণ এই স্থানের যে উল্লেখ

পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে কাঁচাপথ এমনকি প্রধান রাস্তা, যেটি জি. টি. রোড থেকে বামুনআড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত তার কর্দমাক্ত অবস্থার ফলে বর্ষাকালে গরুর গাড়ীর চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। লোকে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী হাটে বাজারে যাতায়াত করত। দুধারে ছিল বাঁশবাগান ও অন্যান্য বড় বড় গাছপালার জঙ্গল ও পান বরজ। তার উপর ছিল আবার শ্বাপদভীতি। সর্পাঘাতে এবং কখনও কখনও চিতাবাঘের আক্রমণে ঘটত অকাল মৃত্যু। এই কারণেই সে যুগে 'বেঘোরাঁড়ি' বলে একটা কথা প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ যে সমস্ত স্ত্রীলোকদের স্বামী বাঘের হাতে প্রাণ হারাত তাদের ঐ আখ্যা দেওয়া হত।

শোনা যায়; উপরোক্ত কারণেই নাকি কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সাধের 'সাধন কানন' বিক্রি করে দেন।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে ঐ মোড়পুকুর সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"বিশবৎসর পূর্বে রিষড়া শুধু নিছক পল্লী গ্রাম নয়, এককথায় নীরব পল্লীগ্রাম ছিল। ষ্টেশনের পশ্চিমদিকে মোড়পুকুর গ্রামে শুধু বনজঙ্গল, পানের বরজ আর শাকসব্জীর বাগান ছিল। এখন সে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, এখন সেই জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পত্তন হইয়াছে বিরাট এক ইস্পাত কারখানা, কাপড়ের কল, সুতার কল আর গ্লাস ফ্যাক্টরী। এখন চিমনির ধোঁয়া, ড্রিল মেশিনের শব্দ, আর ভিউটির বাঁশি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। উঁচু-নীচু জলাজমির সংস্কার করিয়া এখন অনেক বড় বড় বাড়ির পত্তন হইযাছে।"

দেওয়ানজী বংশ

মোড়পুকুরের উপরোক্ত ঘোষ বংশের আহ্বানেই দেওয়ানজীদের পূর্বপুরুষ দুর্গারাম মুখোপাধ্যায় খড়দহ থেকে রিষড়ায় এসে বাস

স্থাপন করেন বলে জানা যায়। সে হল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। ইনি ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় কুলীন বংশোদ্ভব। এঁরা হলেন খড়দহ মেলের অন্তর্গত। ইঁহার তিন পুত্রের মধ্যে শ্রীনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরগণ রিষড়ায় বসবাস করছেন। তাঁদের কথা পরে আলোচিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে রিষড়ায় যে দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ এসে বসবাস করেন তাঁরা ছিলেন 'শ্রোত্রিয়'। কুলিন ব্রাহ্মণের অভাব হেতুই ঘোষ মহাশয় দুর্গারাম মুখোপাধ্যায়কে বসবাসের উপযোগী ভূসম্পত্তি দান করে রিষড়ায় বসবাস করতে সম্মত করান বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন বল্লাল সেন। 'নবধা কুল লক্ষণম্' অর্থাৎ তাঁর বিচারে যাঁরা 'আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান,' এই নয়টি গুণের অধিকারী তিনিই কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হন।

কালক্রমে এই কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন দোষ সংক্রামিত হওয়ায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দেবীবর ঘটক বিভিন্ন দোষে দুষ্ট কুলীনদের ছত্রিশটি মেলে বিভক্ত করেন। "দোষান্ মেলয়তি ইতি মেলঃ।"

বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হবার পর ব্রাহ্মণগণ, কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌন কুলীন, বংশজ ও শপ্তশতী শ্রেণীতে বিভক্ত হন। রিষড়ায় প্রায় সব শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরই বসবাস দেখতে পাওয়া যায়।

কৌলীন্য প্রথার কুফল সমাজে কি ভাবে বিভিন্ন দোষের আকর হয়ে উঠেছিল তার বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধু এইটুকু বলা চলে যে কুলীন কন্যার কুলীন ছাড়া অপর শ্রেণীতে বিবাহ হলে কুলক্ষয় হবে বলে অনেক সময় আশী বৎসরের বৃদ্ধ বর একই লগ্নে দশ বৎসর থেকে ষাট বছরের কুড়ি পঁচিশটি কুমারীর পাণিগ্রহণ করতেন এবং

বিবাহের কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলে তাঁর সকল স্ত্রীই বিধবা হতেন। এর উপর আবার ছিল সহমরণ প্রথা।

উক্ত প্রকারে নাম মাত্র বিবাহের পরেও বিবাহিতা কন্যা পিতা-মাতার গৃহেই তাঁদের গলগ্রহ হ'য়ে দুঃখময় জীবন যাপন করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারত চন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে কুলীন স্বামীর রুষ্ট মুখকে 'সূতা বেচা কড়ি' দিয়ে তুষ্ট করার কথা উল্লেখ করেছেন :—

"দু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার,
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার।
সূতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়,
তবে মিষ্ট মুখ নহি রুষ্ট হয়ে যায়॥"

সাধারণ কুলীন কন্যাদের বিবাহ দিয়ে পরণে শুধু একখানা কাপড় আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত এর বেশী আকাঙ্খা করবার মত সে যুগে আর কিছু ছিল না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে এই দুর্গতির চিত্র এঁকেছেন :—

"কুলীনের পো-কে অন্য কি বলিব আমি,
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেটভরি ভাত,
প্রীতি করো যেমন জানকী রঘুনাথ॥"

সম্পন্ন কুলীন ব্রাহ্মণরা তাই কন্যার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে ভূসম্পত্তি দান ক'রে স্বগ্রামে বসবাস স্থাপন করার ব্যবস্থা করতেন। বিত্তশালী শ্রোত্রীয়গণও কুলীন জামাতা পাবার লোভে এবং স্বদৌহিত্রে কৌলিন্য স্থাপন করার ইচ্ছায় বহু অর্থ ব্যয়ে এবং ভূসম্পত্তি প্রদান করে কুলীন পুত্র সংগ্রহ করায়, কুলীনগণ একাধিক বিবাহ করতে আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ দেশে বহু-বিবাহ প্রচলিত হয়, যার ফলে যজন, যাজন ও অধ্যয়ন, অধ্যাপনার পরিবর্তে কুলীন ব্রাহ্মণের বৃত্তি হয়—'বিবাহ'। সুখের বিষয় ত্রিষড়ার কুলীন

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার (২/৩টির বেশী) কুফল প্রসার লাভ করতে পারেনি।

অপর দিকে বংশজদের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। তাঁরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহ করতে পারতেন না, কারণ কন্যা সংগ্রহ করতে বহু টাকার পণ দিতে হত। এই সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বংশজদের জন্যে কন্যা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে নিম্নশ্রেণীর কন্যা এনে মিথ্যা পরিচয়ে মূল্য নিয়ে বিবাহ দিয়ে দিত। নৌকা বা ভরা করে এই সব মেয়েকে আনা হত বলে এদের 'ভরার মেয়ে' বলত। এই ধরণের প্রতারণা ও দেশাচারের ফলে কুলীন কন্যাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতৃগৃহে অনূঢ়ার মত থাকত, এবং বংশজ সন্তানগণ কন্যাভাবে ও অর্থাভাবে আজীবন অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হতেন।

শ্রোত্রীয়রা ছিলেন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : সিদ্ধ বা শুদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট। যাঁরা আদান ও প্রদান উভয় বিষয়েই সাবধান তাঁরা হলেন সিদ্ধ, যাঁরা কেবল প্রদান বিষয়ে সাবধান, তাঁরা সাধ্য আর যাঁরা উক্ত উভয় বিষয়েই অসাবধান তাঁরা হলেন কষ্ট।

কুলীনদের মত বহু বিবাহদ্বারা জীবন ধারণের উপায় না থাকায় শ্রোত্রীয়গণ, ব্রাহ্মণের নির্দ্ধারিত ষট্ বৃত্তি অর্থাৎ—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারাই জীবিকা উপার্জ্জন করতেন এবং তন্নিমিত্ত ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও যাজনিক ক্রিয়ায় সমধিক ব্যাপৃত থাকতেন। শিষ্য সেবক প্রদত্ত বাৎসরিক প্রণামী ও বস্ত্রাদির দ্বারা তাঁরা সংসার প্রতিপালন করতেন।

প্রথমতঃ কুলীনেরাই কুলাচারী তান্ত্রিক ছিলেন এবং অন্য সকলকে শাক্তধর্মে দীক্ষা দিতেন, কিন্তু পরে পাকড়াশী গ্রামী শ্রোত্রীয়েরা বিশেষতঃ সর্ববিদ্যা বংশীয়েরা ও পূর্ণানন্দ বংশধরেরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাক্তধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ দীক্ষাদাতা গুরু বলে পরিচিত হন।

ফলকতা, শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে যেরূপ বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও বদান্যতার বাহুল্য দেখা যায়, অন্য বংশে তদ্রূপ দেখা যায় না। বোধহয়, তজ্জন্যই সিদ্ধ শ্রোত্রীয়গণ গোষ্ঠীপতির প্রধান, তান্ত্রিক দীক্ষায় শ্রেষ্ঠ, অধ্যাপনায় অদ্বিতীয় এবং সমাজ সংস্করণে অগ্রগণ্য।

রিষড়ায় প্রথম আগমনকারী তন্ত্রসাধক জটাধর পাকড়াশীর বংশে তাই আমরা দেখতে পাই রামরাম বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যারাম ন্যায়লঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গকে।

প্রায় সহস্রাধিক বর্ষপূর্বে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকেই পঞ্চ গোত্র এবং তাঁদের সন্তান বর্গের বসবাসের জন্য যে ছাপান্নটি গ্রাম প্রদত্ত হয়েছিল তাই থেকেই ৫৬টি গাঁই এর উৎপত্তি হয় এবং এই ৫৬টি গ্রামের নামানুসারে তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণের বংশ পরিচায়ক উপাধি অথবা 'গাঁই' এর উৎপত্তি হয়।

তাই ছড়ায় বলে :— "পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই।
ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই॥"

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রিষড়ায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, সে কথা রিষড়া নিবাসী মুখোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের মুদ্রিত বংশ তালিকা থেকেই জানতে পারা যায়।

কুল মিশ্রের গ্রন্থ থেকে জানা যায় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহর্ষি ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ, কাশ্যপ গোত্রীয় মহর্ষি দক্ষের সঙ্গে গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, বাৎস্য গোত্রীয় মহর্ষি ছান্দড়ের সঙ্গে মৌদ্গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং সাবর্ণ গোত্রীয় মহর্ষি বেদ গর্ভের সঙ্গে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র এদেশে আগমন করেন।

উপরোক্ত সময়ে রিষড়ার সমাজজীবন যখন একে একে পুষ্ট ও জনাকীর্ণ হয়ে উঠতে লাগল তখন আঞ্চলিক কারণেই রিষড়ার

অন্যান্য জাতির অর্থাৎ নবশাখাভুক্ত জাতি গুলির বসবাস আরম্ভ হয়ে যায়। প্রত্যেক বংশের আগমন সময় সঠিক জানতে না পারলেও, ৫/৬ পুরুষ ধরে তাঁরা যে এখানে বসবাস করছেন একথা তাঁদের বংশ তালিকা থেকেই বোঝা যায়। ঐতিহাসিকগণ তিন পুরুষে একশো বছর গণনা করে থাকেন।

নবশাখের মধ্যে আছেন :—

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

চলিত কথায় বলে—"তিলি মালী তাম্বুলী, গোপ নাপিত গোছালী।
কামার কুমার পুঁটুলী এই নবশাখাবলী॥"

এই 'নবশাখ' বা নবশায়কেরা আচারনিষ্ঠ ও জল আচরনীয়, ইহারা পূর্বতম বৈশ্য জাতি হতে অবতীর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী।

বল্লাল সেন সর্বজাতীয় লোকের উপরই তাঁর জাতি গঠন নীতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং এ থেকে নবশায়কেরাও বাদ পড়েন নি। যদিও এদের মধ্যে কেউ কুলীন আখ্যা পায়নি তবুও প্রামানিক বা পরামানিক (নরসুন্দর) প্রভৃতি নানা উপাধি তাদের মানের পরিচয় দিত।

'নাপিতগণের মধ্যে ব্রহ্মদাস বংশীয়গণ ভগবতীর বরে উত্তর কালে মোদক বৃত্তি অবলম্বন করেন। একারণ মোদক বা ময়রাসমাজ নাপিতের শাখা বলে গণ্য।

'কুম্ভকারগণ রাঢ়ী, চৌরাশী, দক্ষিণা ও খোট্টা এই চারিসমাজ ভুক্ত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভূমিদার, মালিকদার, কোলেদার প্রভৃতি নামে অভিহিত। সকলেরই উপাধি পাল। রাঢ়ীদিগের বাসস্থান রাঢ়, দক্ষিণাদিগের মেদিনীপুর, চৌরাশীদিগের নদীয়া যশোহর, খোট্টা কুম্ভকারগণ উত্তরপশ্চিমাগত।'

এই 'নবশাখ বা নবশায়ক'-দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দুটা মত প্রচলিত আছে তার মধ্যে :—

প্রথমঃ—পরশুরাম নিক্ষত্রীয় বিষয়ে গোপাদি যে নয়টি জাতির সহায়তা পেয়েছিলেন তাহারা নবশায়ক শব্দে অভিহিত হয়।

পরশুরাম স্বীয় পিতা ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কোন্ কোন্ জাতি বা ব্যক্তি অনায়াসে ও নিঃশঙ্কোচে গৃহস্থদের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে তাদের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হতে সমর্থ হয়?

তদুত্তরে ভৃগু বলেছিলেন স্ত্রীজাতি মাত্রেই এবং গৃহস্থের প্রয়োজন সাধক নয়টি জাতির পুরুষও সর্বত্র যাতায়াত করতে পারেন :

১) গোপ :—দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি বিক্রয়ার্থে।

২) মালী :—পুষ্পাদি বিক্রয় জন্য।

৩) তৈলী :—তিল সর্ষপাদির বিনিময় সাধনার্থে।

৪) তন্ত্রী :—বস্ত্রাদি বিক্রয় জন্য।

৫) মোদক :—মোদক ও লড্ডুকাদি মিষ্টান্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে।

৬) বারুজী :—তাম্বুল বিক্রয় নিমিত্ত।

৭) কুম্ভকার :—ঘটাদি বিক্রয় জন্য।

৮) কর্মকার :—অস্ত্রাদি গঠন পূর্বক গৃহোপকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন।

৯) নাপিত :—ক্ষৌরকার্য ও সেবার কৃতিত্ব প্রদর্শন জন্য লোকের সন্তোষ বিধান।

উপরোক্ত নয়টি জাতি ছাড়াও অপর দু'একটি জাতি গৃহস্থের প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে বটে কিন্তু তাহারা অস্পৃশ্য জাতি বলে পাশে বসে গল্প করার সুযোগ পায় না। গৃহস্থের কার্যসাধন সমাপ্ত হওয়া মাত্রই স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

পলায়িত ক্ষত্রিয়গণের সন্ধানবার্তা উপরোক্ত জাতিগুলি সরবরাহ করায় পরশুরাম ইহাদের 'শায়ক' নামে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয়ঃ—গৌড়ে পাল রাজত্ব থাকা কালে উত্তর ও পূর্ববঙ্গ বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্টপোষক 'সেন' নৃপতিগণের শাসনকালে আবার হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। এই সময়ে বৌদ্ধমতাবলম্বী যে সকল বণিক, শিল্পী ও কৃষক ব্রাহ্মণ্যধর্মের শরণাপন্ন হতে অনিচ্ছুক ছিল, তারা হিন্দু সমাজ-বাহ্য হয়ে রইল। তৎপরে মুসলমান রাজত্ব কালে যখন নীচ ও দরিদ্রগণকে ছলে বলে ও কৌশলে মুসলমান করা হতে লাগল তখন স্বর্ণবাণক প্রভৃতি কয়েকটি জাতি অনন্যোপায় হয়ে বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ চৈতন্যমত গ্রহণ করল। নিত্যানন্দ প্রভু এই সমস্ত জাতিকে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করে বঙ্গদেশের মহৎউপকার সাধন করেন। তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য বৌদ্ধগণ হরিনাম গ্রহণ করল।

ইঁহার বংশধরগণ পতিত, নীচ, পাপী, তাপী সকলকেই হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজকে বলবান করে তোলেন।

'জাত হারালেই বৈষ্ণব' কথাটা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে; বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতির বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল না এবং যারা হিন্দুর জাতি বন্ধন থেকে বিচ্যুত হয়েছিল তারাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ ক'রে হিন্দু হতে পারত। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেও দেখিয়ে গেছেন যে বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আমি ব্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত, আমি ধনী এই অভিমান দূর করে সকলেই ভাই ভাই, সকলেই সমান এই প্রেমের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এক পরিবারভুক্ত লোকের ন্যায় বসবাস করতেই চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম শিক্ষা দিয়ে এসেছেন।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতিদের কিভাবে সংস্কার সাধন করে পুনরায় হিন্দু করে তোলা হয় তার বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেনের মেয়ে' নামক গ্রন্থে, তিনি 'নবশাখা' ভুক্ত প্রায় প্রত্যেকটি জাতির পরিবর্ত্তিত রূপ ও ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।

এখন তৈলী ও গন্ধবণিকদের সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বিষ্ণুর দেহসম্ভূত তিল মনোহর পাল মুনি রক্ষার ভার পান, তাঁর দুই পুত্র—অকিঞ্চন ও ঘনশ্যাম। তিলী জাতি অকিঞ্চনের সন্তান।

তিলীগণ, ষোলখানা বা দ্বাদশ, পঞ্চকুলে, একাদশ এবং বেতনাই এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ষোলখানা বা দ্বাদশ তিলীগণ জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ।

পঞ্চকুলে তিলীগণের সমাজ শ্রীরামপুর, মৌড়ী, মনিরামপুর, বরাহনগর এবং পূর্বাঞ্চলে স্থাপিত আছে। এই শ্রেণী মধ্যে পাল, দে, শেঠ, শ্রীমানী কুলীন। মান্না প্রভৃতি মৌলিক।

"সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থে তিলীজাতির পরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে যে :

"তিল ব্রহ্ম বেচে কিনে তিলী নাম হয়।
জাত্যংশে সচ্ছূদ্র নবশায়ক নিশ্চয়॥
সবে জানে আছে সুধা চন্দ্রের নিকট।
তদ্রূপ তিলেও সুধা ধরায় প্রকট॥
অতএব তিলী হয় যজ্ঞরক্ষা হেতু।
রক্ষীবিনা কদাচ না হয় কোন ক্রতু॥
তুলাদণ্ড ধারণে ন্যস্তরক্ষণে পটু।
মিষ্টভাষী সত্যবাদী নাহি জানে কটু॥"

* * * *

"বৈদ্যপুর গ্রামে বাস বহুলা নদী প্রকাশ
উভয় তীরে নন্দীর অধিকার।
নামে মধুসূদন নন্দী দেব দ্বিজে আছে সন্ধি
সমন্বয়ে তিলীর করি বিচার॥

সমাজের প্রয়োজনেই তিল নিষ্কাসন করে তৈল প্রস্তুত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং সেকালে তৈল বলতে এই তিল তৈলকেই বোঝাত। কিন্তু তিল তৈল ব্যবহারে কতকগুলি বিধি নিষেধ থাকায় ক্রমশঃ সর্ষপ তৈলাদি ব্যবহার প্রচলিত হয়।

"প্রাতঃ স্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপ সমং তৈলং তস্মাদ্ তৈলং বিবর্জয়েৎ॥
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গে চ নিত্যশ:॥ স্মৃতি

* * * *

তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধে তু তিল তৈলং নিষিধ্যতে। প্রচেতা।

উপরোক্ত দিনগুলিতে এবং শ্রাদ্ধদিনে তিলতৈল মর্দ্দনই নিষিদ্ধ ছিল। সর্ষপ তৈল, পুষ্পাদি দ্বারা সুবাসিত ও পক্কতৈল ব্যবহারে কোন দোষ হয় না।

এখন গন্ধবণিক জাতি সম্বন্ধে 'যশোহর খুলনার' ইতিহাসে যেটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখযোগ্য :—

"অন্যান্য বিশিষ্ট জাতির মধ্যে বণিকেরা সর্বপ্রধান। তাঁহারা প্রকৃত বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত এবং পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহারা নবশাখার অন্তর্গত নহেন।

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মনিকারকঃ।
সুবর্ণ বণিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজ স্মৃতা॥" (ভার্গবরামকৃত—জাতিমালা)

অর্থাৎ গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি) কাংস্যবণিক (কাঁসারি) মনিকার ও সুবর্ণবণিক এই পাঁচটি জাতি এখনও পৈতৃক ব্যবসায় অক্ষুন্ন রাখিয়া লক্ষ্মীমন্ত ও ধন সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

ইহারা সকলেই এক সময় বৌদ্ধ ছিলেন; বল্লাল সেন যখন নিজে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা পরিত্যাগ করে হিন্দু তান্ত্রিক হন, তখনও ইহারা পূর্ববত অক্ষুন্ন রাখতে উদ্যোগী হন এবং ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন। পূর্বে সকলেরই বৈশ্যাচার ছিল, পরে হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রকোপেই

অনেকের বৈদিক যজ্ঞসূত্র বিলুপ্ত হয়। বল্লাল সেনের সময়ে যে বণিক সমাজ উপনয়ন বর্জিত হন, তা ঐতিহাসিক সত্য।

(বিশ্বকোষ ১৯শ, ৬৬০ পৃঃ)

"গন্ধবণিকেরা অধিকাংশই মশলা বা বেণেতি দ্রব্যের ব্যবসা করেন। পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনে যখন শৈব মতের প্রচার হয়, তখন ইহারা শিব ভক্ত হন (চাঁদসদাগর প্রভৃতি) এবং দেশ, সংঘ (অপভ্রংশ শঙ্খ) আবট, (অপভ্রংশ আউট) ও সত্রীশ (ছত্রিশ) এই চারি আশ্রমে বিভক্ত হইয়া পড়েন। সম্ভবতঃ যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ সংঘ বা বিহারে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেন, তাঁহারাই সংঘাশ্রম ভুক্ত। (গন্ধ-বণিক তত্ত্ব ২৩৭ পৃঃ) এই বণিকগণ এক সময়ে সমুদ্র পথে বহুদ্বীপ উপদ্বীপে গিয়া সাধারণ পণ্য বিনিময়ে বিদেশীয় ধনরত্ন আনিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এবং মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহাদের বিবরণ আছে ও ইঁহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :—

"সুবর্ণবণিকদের হুগলী জেলায় আগমনের বহুপূর্বে গন্ধবণিকরা এখানে আসিয়াছিল। তাহারা সুমাত্রা, যাবা দ্বীপ পর্য্যন্ত গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসা করিত। এই গন্ধবণিকরা শক্তির উপাসক ছিল। যখন তাহারা সমুদ্র যাত্রা করিত, তখন গঙ্গা ও সরস্বতীর দক্ষিণের সংযোগস্থলে বেত্রবন মধ্যে মঙ্গল চণ্ডিকা দেবীর পূজার্চ্চানা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিত। এই গন্ধবণিকরাই ঐ বেত্রবনস্থিত মঙ্গল চণ্ডিকার নাম দেয় 'বেতাই চণ্ডী' এবং ঐ বেতাই চণ্ডী হইতে বেতড় নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ দেবী অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন। (শিবপুর সানা পাড়ার দক্ষিণ, সাল্কিয়ার গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও আন্দুলের পথের সংযোগস্থলে 'বেত্রচণ্ডিকার' মন্দির আছে)।"

"বারুজী পদে বারুই ও তাম্বুলী বুঝায়। এই দুই জাতি একমূল হইতে উৎপন্ন, সুতরাং এক জাতি। পূর্বকালে ঐ দুইজাতি পৃথক ছিল না। যাহারা বরোজে থাকিয়া পান লতিকা বপন, রোপণ ও রক্ষণ করিত তাহারা বারুজী নামে বিখ্যাত হয় এবং ঐ জাতির যাহারা তাম্বুল লইয়া গ্রামে, নগরে ও বিপনীতে বিক্রয়রূপ ব্যবসায় মাত্র দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাই তৎকালে তাম্বুলী (বা তাম্বুলী) বলিয়া লোক সমাজে বিশেষ পরিচিত হয়। ক্রমে বরজিয়া ও তাম্বুলী পৃথক হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই দুই জাতির সাধারণ সংজ্ঞা তাম্বুলী। ভোজ্যান্নতা রহিত হইয়া যাওয়ায় বারুজী ও তাম্বুলী এই দুই উপাধিতে বিভিন্ন জাতিরূপে গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ এই উভয়ের আচার ব্যবহার একরূপ ; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

তখন রিষড়ায় পুষ্করিণীর সংখ্যাও ছিল বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী। পাতকূয়া, টিউবওয়েল প্রভৃতি আধুনিক জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় পুষ্করিণীর অবস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। মাছ চাষের জন্যেও পুষ্করিণীর আবশ্যকতা ছিল গুরুত্ব পূর্ণ। সম্পন্ন গৃহস্থ মাত্রেরই ছিল গোয়ালঘর, পুষ্করিণী (অভাব পক্ষে একটা ডোবা) এবং চণ্ডীমণ্ডপ। এর উপর ছিল ধানের মরাই আর গৃহসংলগ্ন ছোট খাট সব্জী বাগান। যে সমস্ত বড় বড় পুষ্করিণী আজও বজায় আছে তাদের পূর্বশ্রী বর্ত্তমানে লুপ্ত হলেও তাদের নামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার নামের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, কামারপুকুর, কোমরপুকুর বেনেপুকুর, বুড়িপুকুর, চুণরা, হেদো, ঘোষপুকুর, গোলা-পুকুর, দেপুকুর, ননীপুকুর প্রভৃতি।

'চুণরা' পুষ্করিণীর সঙ্গে সে যুগে চুণ প্রস্তুত প্রণালীর ইতিহাস জড়িত। 'চুণরীরা' তখন শামুক পুড়িয়ে চুণ তৈরী করত। সেই চুণই পান সাজায় এবং গৃহ নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হত পাথুরে চুণের ব্যবহার তখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। এই শামুকের চুণ দিয়ে পান সাজা হত বলেই আমিষের মধ্যে গণ্য হত এবং সেই কারণেই নিষ্ঠাবান

ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বিধবারা পান খাওয়ায় বিরত থাকতেন।

পুষ্করিণীর সঙ্গে ধীবর জাতি ও অন্যান্য কয়েকটি জাতির কথা প্রসঙ্গত: এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেনের মেয়ে' নামক পুস্তক থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধারযোগ্য :—

"বাঙ্গলা ত নদীর দেশ, জলের দেশ। মাছ ধরাই এখানকার অর্দ্ধেক লোকের জীবন। নানা জাতির লোক মাছ ধরে— যেমন কৈবর্ত্ত, তীওর, জেলে, মালা ইত্যাদি। ইহারা সকলেই নামে বৌদ্ধ, বলে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, কিন্তু কাজে কিছুই নয়। বৌদ্ধদের প্রথম শিক্ষা "প্রাণী হিংসা করিও না।' তা ত ইহারা দিনরাত করে। সেইজন্য বৌদ্ধ স্মৃতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তবে যদি ইহারা জাতি-ব্যবসায় ত্যাগ করে, তবে বৌদ্ধেরা উহাদিগকে শিক্ষা দিতে রাজি আছে। এইরূপ শিক্ষা পাইয়া অনেক জেলে হেলে হইয়া গিয়াছে।"

এই মাছ ধরার প্রসঙ্গে তখন বড় বড় জাল বোনা থেকে আরম্ভ করে বাঁশের বাঁখারির ঘুনি, পোলো, মাছ রাখা, ঝুড়ি, চুবড়ি কত জিনিষই তৈরী করা হত।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে রিষড়ায় উচ্চবর্ণের ও নবশাখদিগের আগমনের পূর্বে এখানে নিম্নবর্ণের কিছু কিছু জাতির বাস ছিল। এস্থান একেবারে জনশূন্য ছিল না। হাড়িরাও এখানকার বহু প্রাচীন বাসিন্দা। রায়, পণ্ডিত, শিউলি প্রভৃতি উপাধিধারী। তারা আবার ছিল দু'ভাগে বিভক্ত—তালকাটা হাড়ি ও নাড়কাটা হাড়ি। সন্তান প্রসবকালীন তখন যে সব ধাই মেয়েদের সাহায্য অপরিহার্য ছিল তারাই বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে নাড়ীচ্ছেদ করত। বলা বাহুল্য যে, তখন এখানে উক্ত কার্যের জন্য কোনও ডাক্তার বা নার্স কিম্বা প্রসূতিসদনের অস্তিত্ব ছিল না। 'ধাইমা' বলে তাদের আদর আপ্যায়ন বড় কম ছিল না।

তালকাটা হাড়িদের তাল, নারিকেল, খেঁজুর প্রভৃতি গাছকাটা, এবং রসনিস্কাসন কার্যে তাদের দক্ষতা ছিল বংশগত। বেত, বাঁশের চেঁচাড়ি, কঞ্চি প্রভৃতির সাহায্যে গৃহস্থদের ব্যবহারোপযোগী ধামা, কুলা, ধুচুণী, চালুণী, চাঙ্গারি এবং ছোট ও বড় আকারের চুবড়ি, ফুলের সাজি প্রভৃতি প্রস্তুত করা ছিল এক শ্রেণীর জাতিগত ব্যবসা বা জীবিকার উপায়। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তারা এই সমস্ত ব্যবসায়গত কার্য সম্পন্ন করত। ক্রেতা ও বিক্রেতা ছিল অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোক। পূজাপার্বণে, বিবাহাদি সংস্কারকার্যে, দুর্গোৎসবে এই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা ছিল সমধিক। খেঁজুর পাতা থেকে চেটাই বোনাও ছিল এদেরই কাজ। বসা, শোয়া, মুড়কি মাখা, ধান শুকান প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে এই সমস্ত চেটাই এর ব্যবহার ছিল সে যুগে নিত্য নৈমিত্তিক।

এই প্রসঙ্গে বর্ণ-ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী জড়িত আছে তা হল নিম্নরূপ :—

মহারাজ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের কুলমর্যাদা নির্দ্ধারণ করার পর একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং যজ্ঞশেষে ২৫ জন ব্রাহ্মণকে একটি সুবর্ণ ধেনু দক্ষিণা স্বরূপ দান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রাপ্ত স্বর্ণ ধেনুটিকে সুবর্ণবণিকের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে বিভাগ বণ্টন করে নেন। মহারাজ বল্লাল সেন এই সংবাদ পেয়ে উক্ত ব্রাহ্মণগণকে পতিত করেন এবং তৎসঙ্গে সুবর্ণ বণিক জাতিকেও পতিত করেন।

উল্লিখিত ২৫ জন ব্রাহ্মণ যাঁরা স্বসমাজে মিশতে না পেরে নিম্নশ্রেণীর পৌরোহিত্য প্রভৃতি গ্রহণ করে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করেন তাঁরাই বর্ণ-ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।

উপরোক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ছাড়াও সপ্তশতী, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের অস্তিত্বও সে যুগে রিষড়ার বর্ত্তমান ছিল।

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার নিকট থেকে যজ্ঞ

সম্পাদনার্থ ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

যজ্ঞ সম্পাদনের জন্যে ৪ জন ঋত্বিক হলেই চলে কাজেই পাঁচ-জনের প্রয়োজন সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন যে দক্ষিণদেশে যদিও তিনজনে যজ্ঞ হয়, ব্রহ্মাকে নিয়ে চারজন হতে পারে কিন্তু আর্যাবর্তে যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান অনুযায়ী পাঁচজন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। তার কারণ যজুর্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দু'খানা বেদ ধরলে এবং অথর্ব বেদকে বেদের মধ্যে ধরলে ৫ খানা বেদ হয়, কাজেই এই পঞ্চ বেদে অভিজ্ঞ পাঁচজন ঋত্বিকের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

আকর গ্রন্থরাজি।

১। পুরাতনী ...... হরিহর শেঠ।

২। পালবংশের বংশ পঞ্জি। (শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র পালের সৌজন্যে)

৩। কায়স্থ পরিচিকা — অজ্ঞাত।

৪। কায়স্থ পরিচয় — শ্রী বসন্ত কুমার বসু।

৫। শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস — ঐ ঐ

৬। বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে — কালিদাস মৈত্র (১৮৫৪)

৭। হুগলী জেলার ইতিহাস (৩য় খণ্ড) — শ্রী সুধীর কুমার মিত্র।

৮। দেওয়ানজী বংশ তালিকা— পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি।

৯। সম্বন্ধ নির্ণয় — লাল মোহন বিদ্যানিধি।

১০। বঙ্গীয় সমাজ — সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

১১। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ — বিনয় ঘোষ।

১২। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুল তত্ত্ব — কালীপদ ভট্টাচার্য।

১৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস — নগেন্দ্র নাথ বসু, প্রাচ্য বিদ্যার্ণব। (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ)

১৪। যশোহর-খুলনার ইতিহাস — সতীশ চন্দ্র মিত্র।

১৫। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস — বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।
১৬। বেনের মেয়ে — হর প্রসাদ শাস্ত্রী।
১৭। গন্ধবণিক তত্ত্ব — পণ্ডিত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৮। গন্ধবণিক পরিচয় — ডাঃ অজিত শঙ্কর দে।
১৯। হুগলী জেলার ইতিহাস — উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মাসিক বসুমতী ১৩৪২)।
২০। পূজাপার্বণ ...... যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
২১। নদীয়া কাহিনী ... কুমুদ নাথ মল্লিক।
২২। বাঙ্গালীর ইতিহাস — ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়।
(কিশোর সংস্করণ)

—:o:—

অষ্টাদশ শতাব্দী

(দ্বিতীয় স্তবক)

১৭০১ খৃষ্টাব্দে আজিম উশ্বান যখন বাংলার নবাব তখন মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ান হয়ে আসেন আর সাল সাল এক ক্রোড় ক'রে রূপোর টাকা বাংলা দেশ থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে দক্ষিণ ভারতে চালান দিতেন যেখানে বাদশা আওরংজীব শেষ জীবনটা যুদ্ধ করেই কাটিয়েছিলেন।

এরই ফলে বাংলাদেশে কেউ আর রূপোর মুখ দেখতে পায়নি, সোনার কথা ত দূরের কথা।

পিতলের অলংকার তখন মধ্যবিত্ত ঘরের সাজ গোজের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু অলংকার নয় তৈজস পত্র হিসাবেও পিতলের ব্যবহার প্রায় সার্বজনীন হয়ে পড়ে। একদিকে পাথরের থালা বা খোরা আর অন্যদিকে পিতলের থালা গেলাস এই উভয়বিধ তৈজসের ব্যবহারই তখন প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কাঁসার বাসন অশুদ্ধ বলে পরিগণিত হত।

পিতলের চুড়ি, বালা, মাকড়ি প্রভৃতি তখন থেকেই রূপোর অলংকারের স্থান গ্রহণ করে।

"পিতলের ঝুট্যা পায়, যাবক রঞ্জিত তায়,
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।
সর্ব্ব অঙ্গ সুধাময়, অনঙ্গ তরঙ্গ বয়,
মহামেঘে যেমন বিজুলী॥ —শিবায়ন, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

রিষড়ার কোনও প্রাচীন ইতিহাস লেখা না থাকলেও একথা সহজেই অনুমেয় যে রিষড়ার অধিবাসীরা উপরোক্ত সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন্নগর নিবাসী শিবচন্দ্র দেবের জীবনী থেকে একটা বাস্তব চিত্র উদ্ধারযোগ্য :—

"দেবগৃহিণী লোককে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন, অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোককে খাওয়াইয়া তিনি অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন।

একদিন বাটীতে কোনও ক্রিয়া উপলক্ষে অনেকগুলি মহিলার আহারের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল; দেবগৃহিণী দেখিলেন আহার স্থানে পাচকগণ যে রমণীর অঙ্গে যত বেশী অলঙ্কার তাহার পাতে তত বেশী ভাল দ্রব্য পরিবেশন করিতেছে। তখন পাচকগণকে সকলের অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন—'দেখ ঠাকুর! যার হাতে পিতলের বালা দেখিবে তাহার পাতেই মাছের মুড়া দিও।"

রূপার অভাব হেতু, মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির প্রচলন এমন ভাবে বৃদ্ধি পায় যে কড়ি ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না। জীবনের প্রায় সকল স্তরেই কড়ির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠে। শুধু বেচা কেনার ব্যাপারে নয়, খেলা থেকে আরম্ভ ক'রে দোলা, সিকে, আলনা পর্যন্ত কড়ির গতি ছিল অব্যাহত। এক থেকে নয় কডি পর্যন্ত নামের মধ্যেই ব্যবহৃত হতে থাকে। কথায় বলে—টাকা-কড়ি। 'ঘর করতে দড়ি আর বিয়ে করতে কড়ি।' লক্ষ্মীর সাজে বিচিত্র বড় বড় কড়ি হয়ে উঠে অপরিহার্য।

তখন, সিকি, আধুলী, দুয়ানির প্রচলন না থাকায় একটাকা ভাঙ্গালে একরাশ কড়ি পাওয়া যেত। সবচেয়ে অসুবিধা হল বস্তাবন্দী কডি দিয়ে খাজনা দেওয়ার বেলায় এবং মহাজনী কারবারে লেনদেনের ব্যাপারে।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কর্তৃক তামার ঢেপুয়া বা ঢেপুলি নামক মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় কড়ির বোঝা বওয়ার হাত থেকে প্রজাবর্গ কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পায়। এই ঢেপুয়া বা ঢেপুলির আকৃতির কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। এক ঢেপুয়া ছিল বিশগণ্ডা কড়ির সমান।

খুঁজলে রিষড়ার কোনও কোনও বাড়িতে এর অস্তিত্ব আজও দেখতে পাওয়া যাবে।

এখন অষ্টাদশ শতাব্দীর রিষড়ার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজাপার্বন, ধর্মকর্ম এবং তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

জনস্বাস্থ্য :— তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ না থাকায় এবং কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস দূষিত না হওয়ায়, রিষড়ার জল হাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল। পচা দুর্গন্ধময় পঙ্কিল ড্রেনের অস্তিত্ব না থাকায় মশার উপদ্রবও কম ছিল। তা ছাড়া লোক সংখ্যার প্রাচুর্য না থাকায় মোটা ভাত, মোটা কাপড় জুটে যেত, কোনও ক্রমে তেলটা নুনটা সংগ্রহ করতে পারলেই আহারাদির সংকুলান হয়ে যেত। তখন প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাসগৃহ সংলগ্ন ছোটখাট বাগান থাকায় শাকসব্জীর অভাব ছিল না। লাউ, কুমড়া, লঙ্কা, হলুদ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ কিনে খেতে হত না। এখনকার তুলনায় সে যুগে জীবন যাত্রা-প্রণালী ছিল অনেক নিম্নমানের একথা বলাই বাহুল্য। অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা না থাকায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় চাহিদার অভাব হেতু দ্রব্যমূল্য ছিল অত্যন্ত সুলভ।

ডাক্তার বদ্যির অভাব ত' ছিলই, বর্তমান গুপ্তবংশের রামজীবন গুপ্ত মহাশয় তখনও রিষড়ায় এসে বাস স্থাপন করেন নি, তাই তখন লোকে সামান্য অসুখে গাছ গাছড়া ও টোটকার ব্যবহার করতেন। মধু সংযোগে তুলসী পাতার রস ছিল শিশুদের পক্ষে ধন্বন্তরী। জ্বর বিকারে ও সান্নিপাতে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেকেই প্রাণ হারাতেন। প্রাচীনা রমনীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদ্যের অভাব পূরণ ক'রে দিতেন, বিশেষ ক'রে শিশু চিকিৎসায়।

গৃহ পালিত জীবজন্তুদের অসুখেও লোকে কতকগুলো টোট্‌কা ওষধু ব্যবহার করতেন, কারণ সময়মত অভিজ্ঞ গো-চিকিৎসক পাওয়া যেত না।

গবাদি পশুর সঙ্গে হাঁস ও ছাগল পোষা ছিল প্রায় প্রত্যেকটি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্যে সার্বজনীন প্রথা। এর দ্বারা যে শুধু

আহার্য দ্রব্যের অভাব পূরণ হত তাই নয়; পূজাপার্বণে পশুবলি ছিল সে যুগে অপরিহার্য অঙ্গ। এই পশু বলি বলতে সাধারণতঃ ছাগশিশুই নির্বাচিত হত, কাজেই ছাগশিশু বিক্রয় করেও উক্ত শ্রেণীর লোকেদের কিছু অর্থ সংস্থান হত।

গৃহ চিকিৎসার মধ্যে নানারকম পাঁচন প্রস্তুত প্রণালী তখন ছড়ার আকারে প্রচলিত ছিল:—

"চিরাতা, নাটার ডগা, পলতা ধনিয়া,
ক্ষেৎ পাঁপড়া; নিমছাল, শুলফ আনিয়া,
প্রত্যেক জিনিষ লবে ভরি পরিমাণে।
তিন সের জলে সিদ্ধ বিহিত বিধানে॥
ছটাকার্দ্ধ মাত্রা দিনে দুইবার খাবে।
যেরূপ হউক জ্বর অবশ্যই যাবে॥"

তখনকার দিনে উপরোক্ত অনুপান সংগ্রহ করা কষ্ট সাধ্য ছিল না, গাছ গাছড়া ঘরের আশে পাশে খুঁজে পাওয়া যেত, বাকি কতকাংশ বেনেতি মশলার দোকানেই কিনতে পাওয়া যেত।

হরিতকী, যোয়ান ও বিট লবণের চূর্ণ অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে আশু উপকার প্রদর্শন করত।

কোন্নগর নিবাসী শিবচন্দ্র দেবের পিতা ব্রজকিশোর দেব মহাশয়ের নিকট সর্বপ্রকার পাঁচনের উপকরণ সর্বদাই মজুত থাকত এবং প্রতিবেশীগণ আবশ্যক হলে ঐ সমস্ত দ্রব্য তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করতেন।

বেলগাছ, তুলসী গাছ, বাকস ও কার্পাস তুলোর গাছ প্রায় সকল গৃহেই বিরাজিত ছিল।

গৃহস্থের [illegible] ছিল উনানের পাড়ে [illegible]। [illegible]

[illegible]

[illegible]

কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠত, বৌ ঝিয়েদের কাঠের ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে যেত।

তার উপর ছিল দেশলাইয়ের অভাব। তখন গন্ধক মাখান কাঠি কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হত আর রাত্রে আহারাদির পর একটা মালসায় কিছু তুঁষের সঙ্গে আগুনের কণা মিশিয়ে রাখতে হত পরের দিন সকালে তাই থেকে গন্ধক কাটির সাহায্যে আগুন জ্বালাবার জন্যে। প্রদীপ জ্বালাও এখনকার মত সহজ সাধ্য ছিলনা।

পুরুষেরা চকমকি পাথরে পাতলা লোহার টুকরা ঘষে অগ্নি উৎপাদন ক'রে সোলার সাহায্যে আগুন প্রস্তুত ক'রে তাঁদের তামাক খাওয়ার কাজ চালিয়ে নিতেন।

এই তামাক খাওয়া ছিল ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সার্বজনীন অভ্যাস। জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমল থেকেই এই তামাকের প্রচলন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাদশাহের চিকিৎসকরাই নাকি হুঁকার আবিস্কার করেন— তামাকের বিষ-ক্রিয়া প্রসমিত করার অভিপ্রায়ে। এই তামাকের প্রশস্তি মূলক কত ছড়াই যে তখন সৃষ্ট হয়েছিল তার ইয়ত্বা নেই :— "দিবানিশি যেবা নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অন্তকালে চলি যায় কাশী, কবি রামপ্রসাদ কয়ে, তামাকু ইয়া'রি হয়ে ইন্দ্রপদ তুচ্ছ হেম বাসি।" হুঁকা কলকের গঠনের বৈচিত্র ও রূপার গড়গড়া ছিল ধনীদের মর্যাদার লক্ষণ।

সদর ও অন্দর মহল ভেদে বিশ্রম্ভালাপের তারতম্য ছিল বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। মধ্যাহ্নভোজনের পর মেয়েরা অন্দরে দু'দণ্ড বিশ্রাম ক'রে নিতেন। সেই ফাঁকে পাড়া বেড়ান 'ঠানদি' এসে পড়তেন। পাড়ার গুপ্ত ঘরের খবর আর খোস গল্প ক'রে দুপুর গড়িয়ে যেত। কেউ বা এই অবসরে দু'এক পিঠ তাস খেলে নিতেন। পাকা চুল তোলা বা পান দোক্তার ফরমাস ক'রে ঠান্‌দি নাতবৌদের আদি রসাত্মক দু'একটা কথা বলে তাদের কর্মক্লান্ত মনকে সরস ক'রে

তুলতেন। তখন, থিয়েটার, বায়স্কোপের বালাই ছিল না কাজেই অন্যকোন আমোদ প্রমোদের অভাবে মেয়েরা এই সময়টুকু হাসি খুশীর মধ্যে দু'দণ্ড গড়িয়ে নিতেন।

পুরুষেরা সদর বাড়ীতে (অভাবে চণ্ডীমণ্ডপে) গল্প গুজব, দাবা, পাশা বা তাস খেলায় সময় কাটিয়ে দিতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে দু'চার কল্কে তামাক পুড়তো পরস্পর ঘোরাঘুরি করে। প্রাণ খোলা হাসি ঠাট্টা অশ্লীলতা দোষদুষ্ট হলেও কেউ তাতে দোষ ধরত না বা রুষ্ট হত না। জীবন ধারণের তাগিদে এবং আহার্য বস্তু সংগ্রহের জন্যে এখনকার মত ছোটাছুটির প্রয়োজন হতনা। এক কুন্‌কে খুদের বিনিময়ে দুলে বাগদির মেয়েরা কুঁচো মাছ এবং এক চুবড়ি শাকপাতা দিয়ে যেত। এরাই আবার দোকানে ঝাঁট দিয়ে জড় করা লঙ্কা হলুদ বা অন্যান্য মশলার বিনিময়ে এক রাশ কচু পাতা দিয়ে যেত। তাই দিয়েই দোকানী জিনিষপত্র বেচা কেনা করত।

চাষের ধানের চাল আর, ঘরের গাইয়ের দুধ তখন বাঁধাই ছিল। সকালে রাখালেরা গরু চরাতে নিয়ে যেত আর পৌঁছে দিত গোধূলী বেলায়। প্রাচীন কবিতার মধ্যে এই চিত্র বিধৃত হয়ে রয়েছে—"রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।"

কেরোসিন তৈল ছিল তখনও অনাবিস্কৃত। কাজেই, রেড়ির তেলের প্রদীপ আর ধণী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত গৃহে নারিকেল (তলায় জল) তেলের সেজ বাতি জ্বলত। কাঁচের আবরণ বিশিষ্ট চার চৌকা টিনের লণ্ঠন ছিল তখন বাহিরে যাবার সঙ্গী, এই আলোতেই কথকতা, ঠাকুর বাড়ীর কাজ সারা হত।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠতর, তাই তারা 'পাখীর ডাকে জেগে, পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ত' অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজ শেষ করে ফেলত। রাত্রি বেলা পথে ঘাটে এখনকার মত আলোর রোসনাইএর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। নিতান্ত প্রয়োজন

ছাড়া রাত্রে পথে ঘাটে লোক চলাচল ছিল না বল্লেই চলে।

ধর্মকৃত্যের মধ্যে বারমাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। মেয়েরা কুমারী বয়সে শিবপূজা থেকে আরম্ভ করে নানারকম ব্রতানুষ্ঠান পালন করে জীবনের ছন্দকে সুসংযত করে তুলতেন। পরিণত ও বিবাহিত জীবনে ব্যয়সাধ্য তালনবমী, ষট্‌পঞ্চমী, দুর্বাষ্টমী, পিপিতকী দ্বাদশী প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করতেন এবং সাধ্যমত ঐ সব ব্রত বিধি অনুযায়ী উদ্‌যাপন করতেন।

কুমারী ব্রতের ছড়ার মধ্যে নারী জীবনের বিভিন্ন আশা আকাঙ্খার আভাস দেখতে পাওয়া যায় :—

শিবব্রত :— "চাঁপাফুল তুলতে গেনু, শিবের মাথায় জবা জটা।
বেলপাতা আর গঙ্গাজলে শিবপূজায় করে ঘটা॥
হর হর শঙ্কর এই কর নাথ।
কখন না ধরি যেন মূর্খ স্বামীর হাত॥"

কুলকুলতি ব্রত :— 'কুল কুলতি কুলবতী
তুলসী তলায় দিয়ে বাতি,
আমার যেন হয় স্বর্গে বাতি।
হরিপ্রিয়া তুলসী দেবী করি নমস্কার।
অন্তকালে হই যেন ভবনদী পার॥'

মেয়েরা যে শুধু রান্না-বান্না, বারব্রত ও সাংসারিক কাজ নিয়েই থাকতেন তাই নয়, ছেলেরা যেমন কপাটি, চোরপুলিশ, ডাণ্ডাগুলি এবং পাশাখেলা প্রভৃতিতে তাদের বাল্যজীবন অতিবাহিত করত, মেয়েদের জন্যেও কয়েকটি গৃহমধ্যগত খেলার প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী 'শিবায়নে' এইসব খেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন :—

পার্ব্বতীর বাল্যক্রীড়া বর্ণনা :—

(লুকোচুরি)

'খেলে লুক লুকানি আপনি হয়ে বুড়ি। এক চোর সভাকারে করে তাড়াতাড়ি॥

লুকাইলে খেড়ি খুঁজি ধবে সব ঠাই। বুড়ীকে না ছুঁলে কাব পবিত্রাণ নাই॥
(দশপচিশ)
খেলে দশ পঁচিশ ছ'কডা নিযে কডি। দান ধর্ম বুঝি দান ফেলে বডাবডি॥
সাতঘবী সুন্দবী সুন্দব খেলা কবে। বুডি বুড়ি কডি কত কডা দিয়ে হারে॥
(ঘুঁটি খেলা)
খেলি ফুল ঘুটিং পুখুব দেই গায়। বেনা গাছে ঝুঁটি বেঁধে গড়াগডি যায়॥
আঁটুল বাঁটুল খেলে পসাবিযা পা। আব লীলা খেলা যত, কত কব তা॥

পুতুল খেলার দিকে মেয়েদের বালিকা বয়সে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বা আকর্ষণ দেখা যেত। 'সই', 'গঙ্গাজল', 'মকর' প্রভৃতি সমবয়স্কা বান্ধবীদের নিয়ে তারা বালিকা বয়সে এই সব খেলার মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে তাদের ঘর সংসার, শিশুপালন প্রভৃতিতে হাতে খড়ি হত; ছেলেদেব মত পাততাড়ি বগলে গুরু মহাশয়দের পাঠশালায় ছুটতে হতনা বা লেখা পড়ার জন্যে কারও শাসন দণ্ড ভোগ করতে হত না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়েদের সঙ্গে গৃহকর্মে এবং পাক-কার্যে সহায়তা করতে করতে ক্রমশ: নিপুণা হয়ে উঠত আর দশ বছর উত্তীর্ণ হতে না হতেই চলে যেত শ্বশুর বাড়ী—দু'চার ক্রোশ থেকে ১০/১২ ক্রোশ দূরত্বের ব্যবধানে।

এইখানেই আরম্ভ হত শাশুড়ী, ননদীদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পরুষ বাক্য। শুনতে শুনতে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কত বধূ এযুগে জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতিনী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। উঠতে বসতে বাপ ভায়ের নাম ক'রে কত কটু ও অশ্লীল গালাগাল তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হত, তা সে যুগের সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসী এবং গৃহিণীরা যে উপরোক্ত চরিত্র বা ব্যবহারের বহির্ভূত ছিলেন না একথা বলাই বাহুল্য, এবং উপরোক্ত প্রকারে আত্মহত্যার কাহিনীও একেবারে বিরল নয়।

তাদের তালিকা লিপিবদ্ধ না থাকলেও, উপরোক্ত ঘটনা গুলো হ'ল রিষড়ার তৎকালীন বাস্তব চিত্র। হৃদয়হীনা শাশুড়ী ননদিনীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব আত্মাহুতি।

বড় আশা আর স্বপ্ন নিয়ে মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যেত কিন্তু সে যুগের একান্নভুক্ত পরিবারে নববধুর স্থান বড় একটা মর্য্যাদা পূর্ণ ছিল না। তাই তারা শাশুড়ী ননদিনী বিহীন নিরঙ্কুশ ঘর সংসারই অধিক কামনা করত :—

"একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবি কাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।"

বর্ত্তমান যুগে বিবাহিতা বাঙালী নারীর সীমন্তের সিঁন্দুর, হাতের তুষার শুভ্র শাঁখা ও লৌহ নির্মিত নোয়ার কেবল মাত্র প্রাসাধনিক মূল্য থাকলেও সে যুগে এমন ছিল না। সে যুগের নারী মাত্রেরই কামনা ছিল তিনি যেন হাতের নোয়া শাঁখা ও সিঁথের সিন্দুর বজায় রেখে সংসারের পূর্ণ মঙ্গল সাধন ক'রে নারীজীবনের নিখুঁত ছবিটি পৃথিবীর বুকে রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন।

এক কথায়, শাঁখা সিন্দুর ও নোয়া নারীত্বের অবমাননার জন্যে সৃষ্টি হয়নি বা এগুলো পুরুষের নিকট বন্ধনের চিহ্নও নয়। ইহারা বাঙালী রমনীর দাম্পত্য জীবনের মাঙ্গলিক চিহ্ন—দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতীক। ঐ বেশের মধ্যে রয়েছে জ্যোতিষ গবেষণার অপূর্ব সত্যরূপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী সমাজের পারিবারিক জীবনের চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না 'সতীনের' কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়। শাশুড়ী ননদিনীর অত্যাচার উৎপীড়নের উপর সতীনের জ্বালাও বড় কম ছিল না।

পুরুষের একের অধিক বিবাহ তখন সমাজে দোষণীয় ছিল না, বরং ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এ প্রথা একেবারে লোপ পায়নি। অবশ্য সকলেই যে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দু'এর

অধিক বিবাহ করতেন, এমন নয়, তবে সে যুগে এক স্ত্রীর অসুস্থতা বা প্রসব জনিত শারীরিক দুর্বলতার কারণে সাংসারিক কার্য সম্পাদনের জন্যে নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ার সাহায্যের প্রয়োজন হত।

দু'টী বা তিনটি স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্যে তখন লোকে বিশেষ চিন্তিত হতনা, তার কারণ দ্রব্য মূল্য সুলভ থাকায় মাসিক দু'তিন-টাকা রোজগার করতে পারলেই কোন ক্রমে চলে যেত। কিন্তু এর ফলে সাংসারিক শান্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হত। নারীদের পক্ষে, সতীনের প্রতি স্বামীর পক্ষপাতিত্বের ফলে বা সতীনের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে ইতর বিশেষ ব্যবহারের ফলে দুই সতীনের মধ্যে ঝগড়া, কোন্দল লেগেই থাকত, এবং সময়ে সময়ে তা পাড়া প্রতি-বেশীদের পর্যন্ত উত্যক্ত করে তুলত। স্বামী-সোহাগ বা প্রীতি-বঞ্চিতা স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবন হয়ে উঠত বিষময়। সতীনের বশীভূত স্বামীর দুর্ব্যবহার নারী জাতির পক্ষে অসহ্য। তাই কবিবর ভারতচন্দ্র 'অন্নদা মঙ্গল কাব্যে' লিখেছেন :—

"আপনি জান ত স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সয় গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥
* * * * * *
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।
তবে কেন স্ত্রী পুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি॥"

—

ননদিনীদের অত্যাচারে উৎপীড়িতা বধূদের পক্ষেও সুযোগ পেলে ননদিনীর প্রতি নিষ্ঠুরতার মাত্রা কখনও কখনও চরমে উঠতে দেখা যেত। তার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল ছিল না।

এক সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ননদিনীকে ঘাট থেকে কুমীরে ধরে নিয়ে গেছে। এমন একটি সকরুণ কাহিনীও ভ্রাতৃজায়ার হৃদয় স্পর্শ করেনি। শাশুড়ীর কাছে পুত্রবধূ সে কাহিনী ব্যক্ত করেছে নেহাতই হাল্কা সুরে —

'ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ গো
জলেব ভিতব তোমাব কি কুটুম আছে ?"

—

এখন পুরুষদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিশু ও বৃদ্ধছাড়া অপরাপর সকলে দৈনন্দিন কার্য শেষে সন্ধ্যার পর বিশেষ বিশেষ আড্ডায় সম্মিলিত হত। কেউ বা গাঁজার আড্ডায়, আবার কেউ বা খোসগল্পের মজলিসে।

ভদ্রসমাজে তখন মদের নেশা অপেক্ষা গাঁজার নেশা বেশ জম জমাট ছিল। গুলির নেশাও বাদ যেত না। নিষ্কর্মার দল বেশীর ভাগ এই গুলির আড্ডায় যোগদান করত। এই গুলিখোরদের সম্বন্ধে অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে। ছড়ার ত' অন্ত নেই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিহাসছলে গাঁজার প্রশস্তি রচনা করেন :—

"গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঁজা স্ববিতানন্দদায়িনী।
উচ্যতে প্রাকৃতৈ গেঁজা ইতি তে নাম পঞ্চকম্ ॥
সদ্যঃ পাপৌগ সংহন্ত্রী সদ্যশ্চিন্তা বিনাশিনী।
সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমাগতিঃ ॥

*   *   *   *

বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা, গুলীর কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা চণ্ডুর বৌবাজারে।
এইসব মহাতীর্থ যেনা চোখে হেরে,
তার মত মহাপাপী নাই ত্রিসংসারে ॥"

বলা বাহুল্য যে, উক্ত ছড়ার মধ্যে রিষড়ার নামোল্লেখ না থাকলেও রিষড়ার অধিবাসীরা গাঁজাগুলির সংস্পর্শ বর্জিত ছিল একথা বলা যায় না।

তখন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের অসঙ্কুচিত রসালাপ ও কুৎসিত ইয়ারকির ফলে বালকদের রুচি, আলাপ ও আমোদ প্রমোদ কলুষিত হয়ে উঠে। সেই বয়সে যা জানা উচিত নয়, তা তারা জেনে ফেলত এবং তদনুরূপ আচরণ করত।

মুসলমান নবাবদের রাজসভার দূষিত সংস্রবে প্রথমে ধনীসমাজে তারপর তাঁদের দৃষ্টান্তে সমাজের নিম্নস্তরে বহু কু প্রথা সংক্রামিত হয়। বেশভূষা, বহু বিবাহ প্রথা এবং মুসলমান রমণীদের বোরখার পরিবর্ত্তে মেয়েদের আবক্ষ ঘোমটা ও অবরোধ প্রথার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষদের মধ্যে দুশ্চরিত্রতাও সে যুগে দেখা দিয়েছিল। বারবণিতা সংশ্রব ধনীদের বাহাদুরী বলে গণ্য হত এবং তাঁদের অনুকরণে সাধারণ পুরুষদের মধ্যেও এ দোষ সংক্রামিত হয়েছিল।

"রক্ষিতা উপপত্নীরা প্রায়শঃ উপপত্নীর বাড়ীতেই থাকত। যদি বা পৃথক বাড়ীতে থাকত, তবু উপপতির বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত করত। বৈধপত্নী বয়সে ছোট হক বা বড় হক, উপপত্নীরা বৈধপত্নীকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করত ও মান্য করত। ব্রাহ্মণের উপপত্নীরা তাঁর 'সেবাদাসী' নামে পরিচিত হত, অন্য লোকের উপপত্নীদিগকে তাদের 'জলপাত্র' বলা হত; কিন্তু বৈধপত্নীর সঙ্গে উপপত্নীদের ঝগড়া বিবাদের কথা শোনা যায় না।"

খাদ্যদ্রব্য সুলভ থাকায়, যে ব্যক্তি মাসিক দু'টাকা উপার্জ্জন করত তার পরিবার প্রতিপালনে কোন কষ্ট হত না এবং পুষ্টিকর ও অকৃত্রিম নির্ভেজাল খাদ্য ভোজনের ফলে তাদের বলবীর্যের প্রাচুর্য ছিল। এখনকার মত তখন লোকে সুখপ্রিয় ও বিলাস পরায়ণ ছিল না। তাদের অভাব ছিল অল্প তাই মনের প্রফুল্লতা ছিল অমলিন। দুর্ভাবনায় অস্থিচর্ম শুকিয়ে যেত না।

বৃদ্ধেরা প্রফুল্ল চিত্তে পিড়ি ঠেস দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে থাকতেন ; কেউ এলে আপনি চক্‌মকি ঠুকে তামাক খাওয়াতেন এবং তাদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করতেন। তাঁরা এখনকার তুলনায় অধিকতর মনের সুখ উপভোগ করতেন সন্দেহ নেই।

গান বাজনা বলতে, তখন দেহতত্ত্ব ও ভবানী বিষয়ক গানের রেওয়াজই ছিল বেশী, বাজনার মধ্যে তানপুরা ও বেহালা। 'কৃষ্ণ' যাত্রায় দলও তখন দু'একটা গড়ে উঠেছিল বলে শোনা যায়।

আলোক ব্যবস্থার স্বল্পতা হেতু রাত্রে রন্ধনাদির ব্যবস্থা একরকম ছিল না বললেই চলে। সন্ধ্যার সময় গাই দোহা হয়ে গেলে সেই দুধ জ্বাল দিয়ে একটা পরিষ্কার পাত্রে দুধের সর ঘৃত তৈয়ারির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে রাখা হত। ঘৃত বলতে তখন লোকে খাঁটি গব্যঘৃতই বুঝত এবং ঘৃতহীন অন্ন ভোজন দোষাবহ বলে গণ্য হত। রাত্রে অনেকেই খইদুধ বা দুধ মুড়ি খেতেন, আসলে তখন ছিল ভাত মুড়ির দেশ।

পানীয় হিসাবে গঙ্গাজলই ব্যবহৃত হত এবং তা বড় বড় জালায় ক'রে ভরে রাখা হত। বর্ষাকালে জল ঘোলা হত বলে ফট্‌কিরী ব্যবহার করা হত। এই জলের জালা রাখার জন্যে একটা স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট জায়গা থাকত, সকলে শুদ্ধাচারে সেই জল গ্রহণ করতেন।

জুতার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সে জুতা বলতে চটিজুতাই বোঝাত। ধুতি উড়ানি এবং পায়ে চটিজুতা এই ছিল বাহিরে যাবার সাজ পোষাক। গামছাটা কখনও কোমরে কখনও বা মাথায় উষ্ণীষ স্বরূপ ব্যবহৃত হত। পথের মাঝে অধিকাংশ সময়ই ঐ চটিজুতা হাতেই থাকত, গন্তব্য স্থানের নিকট পৌঁছে, পুকুরে হাত পা ধুয়ে সেই চটি জুতা পায়ে দেওয়া হত।

রৌদ্র বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তালপাতার ছাতা বা টোকা ব্যবহার করা হত।

শীতকালে বিত্তশালী ধনীরা শাল, জামিয়া, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ব্যবহার করতেন। উহার এক একখানা তিন চার পুরুষ চলে যেত। সাধারণ লোকে দোপাট্টা গায়ে দিত; কোঁচার কাপড় গায়ে জড়িয়ে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন।

বালক বালিকারা শীতকালে দোপরদা দোলাই গায়ে জড়াত, এখনকার মত গরম জামার প্রচলন তখন ছিল না। আগুন জ্বেলে শীত নিবারণের জন্যে অনেকে গোল হয়ে বসে সকালটা কাটিয়ে দিত।

রাত্রে শীত নিবারণের জন্যে কাঁথাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ধনীরা অবশ্য তূলার লেপ তোষক ব্যবহার করতেন। কাঁথা সেলাই করা ছিল সে যুগে বুড়ীদের কাজ এবং তার মধ্যে লাল কাল সূতা দিয়ে নানারকম ফুল লতা পাতা ও হাতীর নক্সা তুলে, তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হত। কাঁথা সেলাই ছিল সূচী শিল্পের একটা বিশিষ্ট নিদর্শন।

সধবা স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ লালপাড় শাড়ী পরতেন আর বিধবারা বয়স অনুপাতে থান বা সরু কালাপাড শাড়ী ব্যবহার করতেন। বিধবারা মাথার চুল ছোট ক'রে কেটে বেশভূষা ত্যাগ ক'রে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। মাঙ্গলিক কার্যে তাঁরা থাকতেন অপাংক্তেয় হয়ে। তাঁদের মুখের হাসি ছিল ম্লান, তাই কথায় বলে 'সধবা হাসে রঙ্গে, বিধবা হাসে সঙ্গে।'

সধবারা চুলে বেনী, লোটন প্রভৃতি নানা রকম খোঁপা বাঁধতেন। চুল বাঁধার কাজে দু'একজন বিশেষ পারদর্শিনী থাকতেন এবং বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহে তাঁদের ডাক পড়ত চুল বাঁধার জন্যে, এই কাজে তাঁরা ছিলেন যশস্বিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাপড়ের পাড়ের অনেক রকম নাম ছিল— কল্কাপাড়, পদ্মপাড়, ভোমরাপাড়, ধানীপাড়, ফিতে পাড়, বালুচর বুটিদার শাড়ী, চুড়িপাড় ধুতি ইত্যাদি—

অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েরা কঙ্কণ, বলয়, হার ও নথ পরতেন, চুড়ি, পৈছা. ঝুমকা ও গোটেরও প্রচলন ছিল। নাকে নলক আর কানে মাকড়ি এইছিল সে যুগের সার্বজনীন গহনা। ছেলেরাও ১৪/১৫ বছর বয়স পর্যন্ত হাতে বালা ও কানে মাকড়ী পরিধান করত।

চাকরীর ক্ষেত্র এখনকার মত বহু প্রসারিত না থাকায় অধিকাংশ পরিবারই ছিল কৃষি নির্ভর। কাজেই হাজা শুকো, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির ফলে আশানুরূপ ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটলে যে সংসারে অভাব অনটন দেখা দিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণের বাড়ীর বিধবারা পৈতা তৈরী করে, সেই পৈতা বেচা পয়সায় কোনক্রমে জীবন ধারণ করতেন। স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতেও এ প্রথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন ঢেঁকি, কুলো অন্য দিকে ছিল তেমনি চরকা আর টেকো। এই চরকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়াটা ছিল সে যুগে সর্বজন বিদিত :—

"চরকা মোর ভাতার পুত্ত, চরকা মোর নাতি।
চরকার কল্যাণে মোর দ্বারে বাঁধা হাতি॥

তখন ভোগ্য পণ্য বা বস্ত্রাদি বিদেশ থেকে আমদানি হত না, কাজেই স্থানীয় যাবতীয় প্রয়োজন, সমস্তই স্থানীয় অধিবাসী শিল্পী ও কৃষিজীবীরাই উৎপাদন ক'রে দেশের অভাব পূরণ করতেন। দেশের পয়সা দেশেই থেকে যেত। যার ফলে, শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আটমন চাল পাওয়া যেত।

আজকাল যেমন লোকে সোনারূপার গহনা বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ করেন, সে যুগে লোকে অভাব অনটনে পড়লে অলংকারবিহীন সাধারণ গৃহস্থরা থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি বাঁধা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন। রিষড়ার কয়েকটি প্রাচীন বাড়ীতে পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়। অনিবার্য কারণে নামোল্লেখ করা সম্ভব হল না।

"কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘর করা নিয়ে॥
কোনদিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফের শুধু গোঁফে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়েছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস।
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥" —ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

উক্ত কবিতার মধ্যেই সে যুগের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সুখ দুঃখের কাহিনী যথাযথ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষেরা যৎসামান্য রোজগার করেই নিরস্ত থাকতেন, সংসার প্রতি পালনের দায় দফা গৃহিনীরাই বহন করতেন এবং ঘরের অভাব পূরণের জন্যে গোপনে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিনিময়ের মাধ্যমে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন।

মুসলমান যুগের প্রভাবের ফলে দাড়ি রাখার প্রচলনও খুব বেড়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা মুসলমানদের থেকে পৃথক বলে পরিচয় দেবার জন্যে টিকি, পৈতা ও তিলক এবং অন্যান্য জাতীরা তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মালা বা টাকি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করে রাখতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে নস্য নেওয়ার প্রথা খুবই প্রচলিত ছিল। নস্যহীন বা পৈতাহীন ব্রাহ্মণ একপ্রকার অসম্ভব কথা দাঁড়িয়েছিল। বৈদ্যরাও নস্য সেবী ছিলেন।

নাপিতরা গ্রামের মধ্যে ক্ষুর, ভাঁড় ও দর্পনাদি নিয়ে ক্ষৌরকর্ম ক'রে বেড়াতেন। আবশ্যক মত অস্ত্রচিকিৎসাও করতেন। বিবাহাদি কার্যে নাপিতের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। বরকনের খুঁটি নাটি সংবাদ, তাদের শারীরিক গঠনে দোষ গুণ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। সমাজের উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলা মেশা করার ফলে বহু গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করবার সুযোগ তাঁরা পেতেন এবং গ্রামের কথা গ্রামকে বলে বেশ আসর

জমিয়ে ফেলতেন। অনেক সময় দলাদলি বা সমাজে কাউকে এক-ঘরে করার মূলে এঁদের দৌত্যকার্য ইন্ধন যোগাত।

এঁরা যে শুধু ক্ষৌরকর্মেই নিপুন ছিলেন তাই নয়, বেশভূষা সুন্দর করে পরিধান করাবার যোগ্যতাও এঁদের ছিল, তাঁরা তখন সত্যাই নরসুন্দর নামের অধিকারী ছিলেন ; বিবাহে রসাল ভাষা ও সুরে ছড়া কেটে এঁরা আসর জমিয়ে তুলতেন। এঁদের মাথায় অনেক সময় পাগড়ী বাঁধতে দেখা যেত। উচ্চবর্ণ বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ক্ষৌবকর্মান্তে ঢিপ্ করে প্রণাম ক'রে পয়সা নিয়ে চলে যেতেন।

তখন অবশ্য ক্ষৌরকর্মে সাবান বা বুরুশ ব্যবহার করা হত না এবং দিশী ক্ষুর ও কাঁচি নরুন প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। ইউরোপীয়রাও এই দেশীয় নাপিতদের কাছেই প্রথম প্রথম দাঁড়ি কামাতেন। তাঁরা কিন্তু উক্ত প্রথার নিন্দাই ক'রে গেছেন। ক্যাপটেন উইলিয়মসনের (১৮২৩) ডায়রীতে উল্লেখ আছে—"একটুক্রো কটুগন্ধি সাবান, বুরুশের বালাই নেই। শুধু গালে জল দিয়ে হাত বুলিয়ে দাড়ি নরম করে নেওয়া হয়। তারপর ক্ষুরটা চামড়ার উপর বুলিয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করে। এই ক্ষুর চালানোর সময় যার দাড়ি তার ভীতি বিহ্বল মুখ চোখের দিকে নাপিতের দৃষ্টি থাকে না। শুধু দাড়ি নয় ক্ষুরের টানে দাড়ির সঙ্গে গালের মাংসও কেটে বেরিয়ে আসে। প্রতিবারই গালের ক্ষত নিরাময় হতে সাত থেকে দশদিন সময় লেগেছে।"

অসাবধানতার ফলে কিম্বা ক্ষুরের ধার কমে গেলে কখনও কখনও গাল কেটে যেত সত্যি তবে রিষড়ার পরামাণিকদের সম্বন্ধে সুখ্যাতির কাহিনীও শোনা যায়।

একবার এক সাহেব সকালে দাড়ি কামাবার জন্যে এখানকার এক নাপিতকে ডেকে পাঠান। তিনি তখন কুঠির বারাণ্ডায় চেয়ারে বসে পূর্বরাত্রের নেশার ঘোর কাটাছিলেন। গঙ্গার সুশীতল স্নিগ্ধ

সমীরণে তিনি মাঝে মাঝে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ছিলেন। নাপিত উপস্থিত হয়ে সাহেবকে তদবস্থায় দেখে তাঁর নিদ্রার ঘোর না কাটিয়ে সাবধানে ও সযত্নে ক্ষৌরকর্ম সমাধা করে বাড়ীর পথে পা বাড়ান। সাহেব দাড়ি কামানোর কথা কিছুই বুঝতে পারেন নি।

ঘুমের ঘোর কাটলে সাহেব তখনও নাপিতকে আসতে না দেখে রাগান্বিত ভাবে তাঁর আর্দ্দালীকে নাপিতকে ধরে আনতে বলেন। নাপিতের সঙ্গে পথেই দেখা, সাহেব আবার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তাই ভাবতে ভাবতে পরামাণিক যখন কুঠীতে গিয়ে হাজির হল, তখন তো সাহেব রেগেই আগুন—"তোমাকে কখন খবর দিয়েছি দাড়ি কামাবার জন্যে, তোমার দেখাই নেই, কি ব্যাপার? নাপিত তখন বলে যে হুজুর আমি তো অনেকক্ষণ আগে আপনাকে কামিযে দিয়ে গেছি, আপনাকে জাগাইনি, আমার গোস্তাকি মাপ করুন। সাহেব তখন নিজের গালে হাত বুলিয়ে দেখেন যে সত্যই খুব সুন্দর ভাবে কামানো হয়েছে। সাহেব খুশী হয়ে তাকে বকশিস্ দিয়ে বিদায় করেন।

সংবাদ আহরণ ও পরিবেশনে পুরোহিতদের ভূমিকাও নগণ্য ছিল না। তাঁরা যেমন যজমানের পিতৃবিয়োগের তিথিটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে যথাসময়ে তাঁর পিতৃকার্য সমাধা করাতেন, তেমনই আবার যজমানের বাড়ীতে কার্যোপলক্ষে উপস্থিত থেকে সর্বরকমে সাহায্য ক'রে কার্য সুসমাধা করে দিতেন। অপর পক্ষে যজমানরাও পুরোহিতের কন্যাদায়, পুত্রদের বিবাহ, উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য ও দ্রব্যাদি সরবরাহ ক'রে কার্য উদ্ধার করে দিতেন। তাই কথায় বলে—'আসে যায় করে হিত, তারে বলে পুরোহিত। দেয় থোয় রাখে মান তারে বলে যজমান।'

কথা প্রসঙ্গে পুরোহিতেরা এক যজমানের পুত্র কন্যার বিবাহাদি ব্যাপারে ধাঁক জমকের কথা অন্যের কাছে বলে ফেলতেন। তার ফলে একটা রেশারেশির সৃষ্টি হত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সেকালে সংবাদ পত্রের অভাব অনেকাংশে মোচন করতেন। তাঁরা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান ক'রে পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হাতে নিয়ে যজমানদের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ, পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিশেষ বিশেষ সংবাদ প্রচার করতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসবে কে কেমন দান ধ্যান করলেন, তারই সুখ্যাতি, অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিমা 'সংস্কৃত শ্লোকে' বর্ণন করতেন।

অপর দিকে নাপিতের ঘরের স্ত্রীলোকেরাও অন্তঃপুরের সংবাদ আহরণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কার ঘরের জামাই কতদিন আসেনি অথচ মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা, কার কটি ছেলে মেয়ে, কার স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করে না, এমনই সমস্ত গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন ক'রে বেড়াতেন। সব সময় গল্প গুজব ও রসিকতা ক'রে 'কামান' সেরে আলু, চাল বা পয়সা নিয়ে চলে যেতেন।

দেশের প্রধান প্রধান সংবাদগুলো ছড়ার আকারে মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তার দু'একটা নমুনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, আমাদের পিতামহাদির নেই কোন লিখিত জীবন-ইতিহাস, নেই কোনও দর্শনীয় আলেখ্য। আছে শুধু তাঁদের সম্বন্ধে কয়েকটা টুকরো গল্প কাহিনী। খুঁজলে হয়তো ভাঙ্গা কাঠের হাত বাক্সের মধ্যে পাওয়া যাবে তাঁদের ব্যবহৃত একটা ভাঙ্গা 'খলের' ডাঁটি, সুতাবাঁধা একটা ভাঙ্গা চশমার টুকরো কিম্বা একটা হুঁকা বা গড়গড়ার নল ; গায়ের জামা বা বনাতের একাংশ, এর বেশী আর কিছু নয়।

উপরে বর্ণিত সে যুগের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে যে চিত্র অঙ্কিত করা হয়েছে তার সঙ্গে যে তাঁদের বহুলাংশে মিল ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে এবং সেই ভরসাতেই এই দীর্ঘ অবতরণিকা।

পূজা পার্বণ

বার মাসে তের পার্বণ তো ছিলই তার উপর ছিল মধ্যে মধ্যে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পূজা। সত্যনারায়ণের পাঁচালী শুনতে আর সিন্নি আনতে তখন পাড়ার লোক জমায়েত হত। রামেশ্বর চক্রবর্তী রচিত পাঁচালীই তখন গীত হত। এই সত্যপীর পূজার প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দীর অবদান। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই এর সৃষ্টি।

সত্যপীর নামের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর তাঁর পাঁচালীর মধ্যে বলেছেন :—

"সত্যপীর নামের তাৎপর্য শুন আগে,
মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্য পুরোভাগে॥
নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।
পীর হ'লে প্রাণ গেলে না পূজে হৈন্দব॥
অতএব সত্যপীব-নারায়ণ নাম।
হোকম্ মাফেক হদ্দ বিরচিল রাম"॥

রাম ও রহিম কেবল মাত্র নামের তফাৎ। তত্ত্বগত ভাবে এক ও অভিন্ন। রামেশ্বরী কথার মধ্যে দেখা যায় যে, সে সময়ে (অষ্টাদশ শতব্দীতে) পূজক ও পাঠক ভিন্ন ভিন্ন হতেন। পাঠকের থাকা চাই পাণ্ডিত্য ও সুললিত কণ্ঠস্বর। 'পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঁই। গবাগুলো গ্রন্থ যেন গোবরায় নাই॥'

সে যুগের অধিকাংশ কবিই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন এবং এই সত্য-নারায়ণের কথা প্রচারের পর থেকেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 'চাচা, ভাই' প্রভৃতি গ্রাম্য সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

কবি কৃষ্ণ রামও তাঁর শীতলা মঙ্গলে বলেছেন :—

"বিচার করিএ দেখি কোরাণ পুরাণ একি
সারদা বসতি সর্ব্বঘটে।
হিঁদু কি মোছলমানে পয়দা একই স্থানে
আচারেতে জুদা জুদা ঘটে॥"

শুভশুচনী ব্রত কথার মধ্যে সে যুগের বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রী-আচারের ছড়াছড়ির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে তার অনেকাংশই হ্রাস পেয়েছে।

পূজা শেষে এয়োদের তেল, সিন্দুর ও পান, সুপারি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করার প্রথা, মিষ্টান্নের মধ্যে নাড়ুর ব্যবহার ছিল সে যুগে সমধিক।

'এয়োরে করয়ে দান, নাড়ু রম্ভা গুয়া পান।
তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে॥'

এই তৈল সিন্দুর আর গুয়া পানের ব্যবহার ছিল প্রত্যেকটি মঙ্গল কার্যের অপরিহার্য অঙ্গ। অভাবের সংসারে এই তেল সিন্দুর সংগ্রহ করাও সহজ সাধ্য ছিল না, সে কথা সে যুগের কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন :—

"হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এ'য়ো এসে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুর"

জামাই ষষ্ঠী

বারমাসে তের ষষ্ঠীর মধ্যে জামাই ষষ্ঠী বা অরণ্য ষষ্ঠী ছিল সে যুগে একটা প্রাণভরা, রসভরা আনন্দ উৎসব। আজও সে উৎসব প্রায় প্রতি গৃহেই অনুষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু সে হল একটা প্রাণহীন

গতানুগতিকতা। এখন শুধু আহার ও উপহারে পর্যবেষিত হয়েছে সেদিনকার রসিকতা ভরা বহু প্রতীক্ষিত জামাই ষষ্ঠীর দিনটি, যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে, যান, বাহন পোষাক পরিচ্ছদ এমনকি আহার্যের তালিকা। শালাজ ও শ্যালিকাকুলের অশ্লীলতা-দুষ্ট হাস্য পরিহাস ও রসিকতার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে হালকা সিনেমা দেখে আনন্দ উপভোগ করা। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই ষষ্ঠী' নামক কবিতার মধ্যে চিত্রিত হয়ে আছে সে যুগের জামাই ষষ্ঠী পর্বের পরিপূর্ণ রূপটি। এখন আর পূর্বের মত জামাই ঠকান বিভিন্ন খাদ্য তালিকা নেই, নেই কর্ণ মর্দ্দনরূপ ইতর রসিকতা। উক্ত কবিতার মধ্যে আছে 'কারিগরি নারীগণ করে অগণন, জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন।

এই জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে ভোজন পটুতার চরম দেখাতেন কোন কোন জামাতা। পরিপূর্ণ আহারের পর কেউ হয়তো বাজি রেখে ২০/২৫ টা সন্দেশ বা রসগোল্লা খেয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন।

রিষড়ার ধর্মদাস হড় মহাশয় সম্বন্ধে এমনই একটা গল্প শোনা যায়। জনাই-এ শশুরবাড়ী। জামাই ষষ্ঠীর আহার শেষ ক'রে গাড়ু নিয়ে হাত ধুতে গেছেন, এমন সময় বামা কণ্ঠে কে একজন চাপা গলায় বলে উঠেন যে এখন যদি জামাই আমাদের এক টাকার 'মনোহরা' খেতে পারে তবে ৫ টাকা বাজী। হড় মহাশয় তৎক্ষনাৎ বাজি ধরলেন। সে যুগের ৫ টাকার মূল্য ছিল অনেক বেশী, এবং এক টাকার 'মনোহরা' মানে প্রায় এক সের পরিমাণ সন্দেশ। দেখতে দেখতে সন্দেশ এসে গেল এবং তিনি অক্লেশে সেই সন্দেশ উদরস্থ করে ফেললেন একটা একটা করে। তখন শাশুড়ি ঠাকুরুণের পক্ষে বাজির টাকা জোটান ভার, কি করা যায়, অগত্যা মেয়ের বালা বাঁধা দিয়ে টাকাটা কর্জ করে এনে মান রক্ষা করেন।

হড় মহাশয়ের অতি ভোজন সম্বন্ধে আরও একটা কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একবার গিয়েছেন কোনও এক শিষ্যবাড়ী, মধ্যাহ্ন ভোজন, (ফলার) সমাপ্ত প্রায় এমন সময় যজমান একখানা পাকা কাঁঠাল নিয়ে এসে বলে যে ঠাকুরমশায়ের খাওয়া শেষ হয়ে গেল ? আমি যে আপনাকে খাওয়াব বলে এই গাছ পাকা কাঁঠালখানা বাগান থেকে পেড়ে আনলাম। হড় মহাশয় বল্লেন, বেশ, বেশ, কই দেখি কেমন তোমার কাঁঠাল। এই বলে তিনি কাঁঠাল ভেঙ্গে দু'এক কোয়া করে সমস্ত কাঁঠালখানাই খেয়ে ফেললেন। অবশ্য একখানা কাঁঠাল একজনে খাওয়ার নজীর আরও আছে, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ যোগ্য যে জনাই এবং প্রাচীন সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী সমৃদ্ধ জনপদগুলোর সঙ্গে রিষড়ার সংযোগ ছিল সে যুগে ঘনিষ্টতর। বৈবাহিক ক্রিয়া অধিকাংশই সম্পন্ন হত বর্ত্তমান সিঙ্গুর, শিয়াখালা, জনাই, বাক্‌সা, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, চাপুরদহ, মাপুরদহ, বেগড়ি, আন্দুল, মৌড়ি প্রভৃতি গ্রামে। ইউরোপীয় বণিকগণ কর্তৃক ভাগীরথী তীরবর্ত্তী ভূভাগে বিভিন্ন শিল্পকুঠি গড়ে তোলার পূর্ব পর্যন্ত উপরোক্ত গণ্ড গ্রামগুলিই ছিল দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের লীলা ক্ষেত্র। বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও বস্ত্র প্রভৃতি কুটির শিল্প জাত ভোগ্য পণ্যাদি তখন এই সমস্ত স্থান থেকে নানা দেশে রপ্তানি হত। এখনও মাপুরদহের নিকটবর্ত্তী কোড়ালা প্রভৃতি গ্রামে নারিকেল তৈল এবং বেগড়িতে হুকার খোল প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য যে রিষড়ার তৎকালীন ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্থানীয় কুম্ভকারদের উৎপন্ন মাটির হাঁড়ি,কুড়ি ছাড়াও মশাটের হাঁড়ির চাহিদা ছিল সুপ্রসিদ্ধ। তখন এই সমস্ত দ্রব্যের কতকাংশ স্থলপথে গো-শকটে করে এখানে নীত হত। এই সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি

হয়েছিল। ঘটক না হলে বিবাহ হয়না সত্য, কিন্তু ব্যবসায়ীদের পরস্পর সংযোগের ফলে বিভিন্ন গ্রামের পাত্র পাত্রীদের সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সংগৃহীত হত। বলা বাহুল্য যে, সে যুগে গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের সংবাদই এই সমস্ত ব্যবসায়ীদের জ্ঞাত ছিল।

সরস্বতী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ যে একটা দ্বীপাকৃতি ছিল সে কথা বাস্তব সত্য ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদঞ্চলবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতি ছিল সে যুগে উচ্চ পর্যায়ের, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ; গন্ধবণিক, বারুজীবি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসবাস হেতু ভাগীরথীর পশ্চিমকূল নিবাসী সকলেই প্রায় এই সমস্ত সমপর্যায়ভুক্ত অধিবাসীদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনে অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। এঁদের সঙ্গে বেশ যেন একটা সামাজিক আচার ব্যবহারের মিল খুঁজে পাওয়া যেত। "সমানে সমান কুল ধরাধরি তায়।"

মাহেশের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে জোশেফ মইয়ি লিখেছেন যে-

"It would be inproper to overlook the fact that while Villages above that town which are known to have been on the banks of the river at the commencement of the Mogul dynasty are now in some cases four or five miles distant from it."

Calcutta Review—1845. Vol-IV.

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও বর্ত্তমান হুগলী ও হাওড়া জেলার উপরোক্ত স্থানগুলি ছিল একই ভৌগলিক সীমার মধ্যে এবং এদের দূরত্বও পদব্রজে যাতায়াত সীমার অন্তর্গত ছিল। সে যুগে পাঁচ, ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে একদিনে যাতায়াত কষ্টসাধ্য ছিল না; অবশ্য বর্ষাকাল ছাড়া। তখন নৌকা বা সালতির সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপিত হত। বর্ষাকালে ছোট ছোট খাল বা মজে যাওয়া নদীগুলো আবার জলে ভরে উঠত এবং তাদের নাব্যতা ফিরে পেত।

১৮৯৭ খৃঃ মার্টিন রেলপথ (ছোট রেল) স্থাপিত হওয়ার ফলে চণ্ডীতলা, শিয়াখালা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা সুগম ও ঘনিষ্টতর হয়ে উঠে।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র রচিত হুগলী জেলার ইতিহাসে (৩য় খণ্ডে) উপরোক্ত স্থানগুলির প্রাচীন মর্যাদা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত পুস্তক পাঠে বিশেষ আনন্দলাভ করবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জামাই ষষ্ঠীর পরই দশহারা গঙ্গা পূজা, গঙ্গাতীরবাসী ত্রিবড়ার অধিবাসীরা সে যুগে গঙ্গা পূজাটা বড় একটা কেউ বাদ দিতেন না। তার কারণ গঙ্গার সঙ্গে ছিল তাদের নিত্যকারের নাড়ীর সংযোগ। কত আপদ্ বিপদ, নৌকাডুবি, জলডুবি ঘটত তখন এই গঙ্গাবক্ষে-অথচ নৌকায় যাতায়াত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ও ছিল না। গঙ্গাস্নান ছিল তখন অনেকেরই প্রাত্যিদিনের অভ্যাস।

মুনি ঋষি থেকে আরম্ভ করে বাঙালী কবি এমনকি ইংরেজ কবি- রাও গঙ্গা পূজা করে গেছেন তাঁদের রচিত স্তব স্তুতি আর কাব্যের মধ্য দিয়ে। বাঙালী হিন্দুর কাছে এই নদী কেবল কূলপ্লাবী জল- ধারা মাত্র নয়, তাঁদের কাছে গঙ্গা মূর্তিমতি দেবী, চিরপূজ্যা, চির নমস্যা, সুখদা, মোক্ষদা, গঙ্গা, গঙ্গৈব পরমাগতি।

তাঁরা সকলে মনে করতেন বিষ্ণুপদী সৃষ্ট গাঙ্গেয় দ্বীপের অধিবাসী তাঁরা, তাঁরা গঙ্গাদাস, গঙ্গাধর। সন্তান সন্ততিদের ঐ- ভাবে নাম করণ করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। কন্যাদের নাম রাখতেন সুখদা, মোক্ষদা, গঙ্গা ; গঙ্গার অবশ্য অসংখ্য নাম। শিব পুরাণ তাঁর সহস্র নাম বর্ণনা করে ধন্য হয়েছে।

দু'বেলা জোয়ার ভাঁটার অপরূপ রূপ পরিবর্তন দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর অপরূপ রূপের কথা সেই জানে, যে প্রভাতে সন্ধ্যায়, জোৎস্নার রাতে এঁর কূলে এসে বসেছে, জলে সাঁতার দিয়েছে, নৌকাযোগে কূলে কূলে বিহার ক'রে বেড়িয়েছে। সেই

জানে এঁর আকাশে, বাতাসে, এঁর গৈরিক জলে কি যাদু মিশান আছে ।

শৈশবে যে এঁর কূলে খেলা করেছে, বার্দ্ধক্যেও সে এঁর সৈকতে চিরশয্যা কামনা করেছে। জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই সমান আনন্দবিধায়িনী যে তিনি। তাঁরই কূলে চিতাশয্যা, মৃত্যুকালে তাঁর পুণ্যস্পর্শ সে যুগে সকলেই কামনা করতেন। অন্তঃজলি করতে তাইতো মুমূর্ষুকে এনে এঁর কূলে শোয়ান হত, শুধুমাত্র প্রথা হিসাবে নয়, অন্তরের কামনায়, মুক্তির আশায়। সাধক রামপ্রসাদ তাই গেয়েছিলেন—

"হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জ্জলী,
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে
মিশায়ে ভক্তি চন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি,
অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গা জলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহবা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী—
কেহবা কর্ণ-কুহরে বলবে কালী উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি॥"

সে যুগে গৃহ মধ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মৃত্যু হলে লোকে অপমৃত্যু বলে বিবেচনা করত, তাই মুমূর্ষ অবস্থায় গঙ্গাতীরে ৩দিন বাস ক'রে নাভি পর্যন্ত গঙ্গাজলে (অথবা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত) থেকে 'গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম' এইনাম উচ্চারণ করতে করতে মৃত্যু হওয়া সকলেরই বাঞ্ছিত ছিল।

অপর একজন কবিও এই সত্য কাব্য বস্তুতে পরিণত করেছেন:-

"পরিহরি ভব-সুখ-দুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে—
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব,
বরষি সুপ্তি মম নয়নে;
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,

বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগরথী ! জাহ্নবী ! সুরধুনি !
কল কল্লোলিনী গঙ্গে"।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্যে, কবিগুরু রবিন্দ্রনাথের কাব্যে এই গঙ্গার মাহাত্ম্য অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে বিভিন্ন ছন্দে; দেশ লক্ষ্মীকে বন্দনা করতে তিনি গঙ্গাকেই বারবার স্মরণ করেছেনঃ—

"নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গারতীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।"

কবি সত্যেন্দ্র নাথ আরও সুন্দর করে বলেছেনঃ—

'গলায় তোমার নাতনরীহার মুক্তোঝুরির শতেক ডোর।
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ি, প্রাণের নাড়ি গঙ্গা তোর॥'

কবি তাঁর মাতৃ বন্দনা আরম্ভ করেছেন এইভাবেঃ—

'ধ্যানে তোমার রূপ দেখিগো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি
মূর্ত্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গা-হৃদি বঙ্গ ভূমি॥'

বিদেশীদের কাছেও গঙ্গা কম মোহময়ী নয়, ম্যাক্সমূলার থেকে শুরু করে হুইটম্যান পর্যন্ত অনেক বিদেশী গঙ্গাকে কেবল মানস লোকে দেখেই তাঁর প্রেমে পড়েছেন। ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে গঙ্গাকেও তাঁরা অলক্ষ্যে ভালবেসে ফেলেছেন। যাঁরা ভারতে এসেছিলেন শাসন, বাণিজ্য, ধর্ম প্রচার বা উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ সফরে, তাঁরাও গঙ্গার দিকে চেয়ে হতবাক হয়েছেন। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক বা ব্যবহারিক জীবনে গঙ্গার প্রভাব কত ব্যাপক সেটা লক্ষ্য করে বিস্ময়ে আভিভূত হয়েছেন।

গঙ্গাকে উপলক্ষ করে বা তাকে পটভূমি করে বিদেশীরা অনেকে কবিতাও লিখেছেনঃ—"......there's not—

Beneath the eternal heaven
A spot
Over which the sun, the moon and the sky

Display a lovelier radiancy
Than where the sacred Ganges flows,
Land of the Bulbul and the rose '.

(ক্যাপ্টেন ম্যাকনটন)

'অর্থাৎ পবিত্র গঙ্গা যে দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়, বুলবুল আর গোলাপের সেই দেশে সূর্য্য-চন্দ্র ও আকাশ সবাই মিলে এমন মনোহর দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়, যার সঙ্গে তুলনা চলে এমন স্থান স্বর্গের নীচে আর একটিও নেই।'

দশহরা

হস্তানক্ষত্র যুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথি—দশহরা। ব্রহ্ম পুরাণের মতে এই তিথিতেই গঙ্গাদেবী মর্ত্তধামে অবতরণ করেছিলেন।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘাটে ঘাটে লোক সমাগম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাঁসর ঘণ্টা আর শঙ্খধ্বনিতে ঘাটগুলি মুখরিত হয়ে উঠেছে। ধূপ ধূনার গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে আকাশ বাতাস। মায়েরা দশ ফুলের পাতা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন ছেলে মেয়েদের স্নান করানর উদ্দেশ্যে। দশবিধ পাপক্ষয় কামনায় দশ ফলের চুবড়ি সাজিয়ে এনেছেন কেউ কেউ। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, বালিকা থেকে অশিতীপর বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলের কাছেই আজকের গঙ্গাস্নান বিশেষ ভাবেই আকর্ষণীয়। বহুদূর হতে রিষড়ার ঘাটে ঘাটে তাই স্নানার্থীর ভীড়। যাঁরা নিত্য স্নান ক'রে থাকেন তাঁরাও আজ এই বিশেষ তিথি নক্ষত্র যোগের কথা ভুলতে পারেন নি।

আজকে মাতৃ স্বরূপা গঙ্গার কাছে অকপটে বিদিত অবিদিত পাপ খ্যাপন ক'রে অনুতাপ করতে হবে। যে পাপ লোকে জানে, সে পাপ বিদিত; সে পাপের রাজদণ্ড আছে, প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু যে পাপের কথা আর কেউ জানে না, সেই অবিদিত পাপ আজ স্বীকার করতে হবে, জ্ঞাপন করতে হবে। সংসারে 'মা' ছাড়া আর এমন আপনজন কে আছেন যাঁর কাছে পুত্র নীজ কৃত পাপ অকপটে স্বীকার করতে পারে। কথায় বলে—'কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনও নয়'। তাইতো গঙ্গা মায়ের কাছে মানসিক, বাচনিক আর কায়িক এই ত্রিবিধ ঘটিত দশবিধ পাপ খ্যাপন বিধি।

দান ছাড়া স্নান সার্থক হয়ে ওঠে না। তাই ভিখারী এবং সংকীর্ত্তন কারীদের সাধ্য মত চাল, আলু, কড়ি বা একটা তামার ঢেপুলি দান করছেন প্রায় সকলেই। গঙ্গা মায়ের কাছে সকলে ত আর শুধু নিজের পাপক্ষয় কামনায় আসেনি, এসেছেন স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায়, রোগ মুক্তির আশায়।

মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে সাবধান বাণী। জল ক্রমশই বাড়ছে। যে ফুল বেলপাতা আর চাঁদমালা এতক্ষণ দক্ষিণাভিমুখে ভেসে যাচ্ছিল তা জোয়ারের টানে মুখ ফিরিয়েছে উত্তর দিকে। সেই সব কুড়াবার জন্যে জলে ঝাঁপাই ঝুড়ছে দুরন্ত ছেলের দল, আর নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে।

এমনই দিনে কেউ হয়তো পুত্রহারা হয়ে গৃহে ফিরেছেন বুক ফাটা কান্নায় কপালে করাঘাত করতে করতে। মা গঙ্গা টেনে নিয়েছেন তাঁর শিশু পুত্রটিকে। অসহায় শিশু জলের সে প্রবল বেগ সহ্য করতে না পেরে ভেসে গিয়েছে স্রোতের টানে, তলিয়ে গিয়েছে অতল গভীরে, শত লোকের চেষ্টাতেও তার সন্ধান মেলেনি।

ব্যাসদেব বলেছেন:— "গঙ্গোদক পান করতে করতে যার জীবন দীপ নির্বাপিত হয় তার আর দেহ হয় না, গঙ্গা জলে নিমগ্ন হয়ে যে সকল জীব দেহত্যাগ করে তারা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়।"

কিন্তু মার প্রাণ তো এসব শাস্ত্রকথা বোঝে না, তাই তিনি আর এবছর মা গঙ্গাকে পোড়ামুখ দেখাতে আসেন নি।

মকরবাহিনী, শঙ্খ, চক্র, পদ্মধারিণী, পতিত পাবনী, সুরধুনী যুগ যুগ ধরে এই পুণ্য তিথিতে এমনই ভাবেই পূজা পেয়ে আসছেন। ঐ দিনটিতে সকলেই কামনা ক'রে থাকেন—অন্ততঃ দশ ফোঁটা বৃষ্টি ; যাতে সাপের বিষ কমে যায়, সর্পজননী মা মনসার পূজা বুঝি তাই এই দিনটিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

স্নান-যাত্রা

দশহরার পর মাহেশের স্নানযাত্রা। এই স্নানযাত্রার সঙ্গে রিষড়ার ঘনিষ্ট সংযোগ বহুকালের। শোনা যায়, জগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী এখানকার কুম্ভকার বংশ শুদ্ধাচারে নূতন মৃন্ময় কলসে করে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে অপর ব্যক্তির স্পর্শ বাঁচিয়ে নিয়ে যান মাহেশের স্নান পিঁড়িতে বিগ্রহত্রয়ের স্নান উপলক্ষে। এখনও ৺মাখন পালের পুত্রেরা উক্ত প্রথা বজায় রেখেছেন। দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্বে এই বংশের যিনি রিষড়ায় বাস স্থাপন করেন তাঁর নাম হল বুল চন্দ্র পাল।

এই স্নানযাত্রার প্রবর্তন করেন পূর্বোক্ত ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী। এই উৎসব সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন পুরীর জগন্নাথ দেব গঙ্গাস্নান করতে এসে প্রাচীন জগন্নাথ ঘাটে বিশ্রাম করেছিলেন এবং সেই ঘটনার স্মরণার্থে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পুর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয়ে আসছে। এমন কথাও অনেকে বলেন যে আগে নাকি পুরিতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা সমাধা হলে একটা নীলকণ্ঠ পাখী এসে মাহেশের মন্দির চূড়ায় বসত এবং তার পরই এখানকার স্নান পর্ব আরম্ভ হত। কেউ কেউ আবার এর বিপরীত কথাও বলে থাকেন।

পূর্বে পুরীর রথ আর মাহেশের স্নান যাত্রাই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। কালক্রমে, স্নানযাত্রা অপেক্ষা মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে অসংখ্য লোক সমাগম এবং একমাস কাল ব্যাপী মেলার প্রচলন হয়। শতাধিক বর্ষ পূর্বে স্নান যাত্রার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই পর্ব উপলক্ষে সে যুগে পুণ্যার্থী সমাগম এবং তদুপলক্ষে সেবায়েতগণের অধিকতর অর্থলাভ হত—

"জ্যৈষ্ঠমাসের স্নানযাত্রা ও আষাঢ় মাসে রথের মেলায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোক বহুদূর হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ মাহেশে আসিয়া থাকে। ইহার মধ্যে স্নাম যাত্রায় অধিক জনতা এবং নানা প্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় এবং জগন্নাথের অধিকারীগণের সহস্র মুদ্রা শুদ্ধ প্রণামিতে ঐ স্নান যাত্রার দিবস লভ্য হইয়া থাকে। রথযাত্রার মেলা যদিও অষ্টাহ পর্যন্ত ব্যাপিয়া থাকে এবং নানা জাতীয় দ্রব্যাদি যাত্রিক লোকে ক্রয় করিয়া থাকে তথাপি স্নানযাত্রা অপেক্ষা লভ্যতর নহে।" —'বাষ্পীয়কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে'

রেলরোড স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত অধিকাংশ যাত্রী পদব্রজে এবং কতকাংশ নৌকাযোগে এসে মেলায় সমবেত হতেন। আজ যে কারণে যাত্রীবাহী বাসগুলি জি, টি, রোডের উপর রিষড়া হেষ্টিংশ মিলের নিকটে এসে থেমে যায়, তার অধিক অগ্রসর হতে পারে না, সে যুগেও ঠিক ঐ একই কারণে রিষড়ার ঘাটে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই পথটুকু হেঁটে চলে যেতেন। "তখন লোকের মনের ভাবটি ছিল যে পদব্রজে না হলে তীর্থ কি। ক্লেশ না করলে ক্লেশ-মোচনের স্পর্শ পাব কি করে?" (পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রথমখণ্ড)

১৮১৯ খৃঃ ৫ই জুন (বাং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২২৬) তারিখে 'সমাচার দর্পণে' স্নানযাত্রা উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়:—

"অনেক ২ তামসী লোক আবাল বৃদ্ধ বণিতা আসিবেন, ইহাতে শ্রীরামপুর, চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কয়েক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয়।"

কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মাহেশের স্নানযাত্রা সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করেন। সে যুগে স্নান যাত্রা উপলক্ষ্যে কি রকম লোক সমাগম হত এবং তদুপলক্ষ্যে লোকে কি রকম সাজ গোজ ও আমোদ প্রমোদ ও রঙ্গ রসে মত্ত হত তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তার কয়েক লাইন হল নিম্নরূপঃ—

"হাড়ি মুচি যুগি জোলা, কত বা সেখের জোলা,
জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলা ঠেলি চুলোচুলি কাঁকে কাঁকে ঝুলো ঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে॥
আগে পাছে পাকাপাকি আঁকাআঁকি তাকাতাকি
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায়।
এসে বাড়ী যত রাড়ী কাঁকে করে কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কাঁঠাল মাথায়॥" (ইত্যাদি)

মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাত্মা কালী প্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম পেঁচার নক্সায়' লিখেছেন—"এদিকে আমাদের নায়েক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাঝিদের নাওয়া খাওয়া হয়েছে, দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে এমন সময় গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে গান ধরেছেন —

"যাবি যাবি যমুনা পারে ও রঙ্গিনী
কত দেখবি মজা রিষড়ের ঘাটে
শামা বামা দোকানী।
কিনে দেব মাথাঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খাসা,
উভরের পুরাবি আশা, ও সোনামনি।"

কলকাতার বাবুরা যাঁরা পানসি ভাড়া করে আসতেন বার বণিতাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা অনেকে সেই রাত্রি নৌকাতেই পানাহার ও আমোদ প্রমোদ ও নৃত্য গীতে কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলা কলকাতায় ফিরে যেতেন। ১৮৪৪ খৃঃ 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় (২৭২ সংখ্যা) উক্ত সময়ের বড় লোকদের কুরুচিপূর্ণ বিলাস বৈচিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্বাদটি প্রকাশিত হয় :—

"সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেমটা নাচ হইতেছিল। তাহাতে আরোহি বাবুরা নর্ত্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারে না...শুক্রবার রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্ত্রীলোকেরা অতি প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন, বাবুরা কুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়া ত্রিকুল পবিত্র করিলেন . . ।"

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নামক পুস্তকে তাঁর শিল্পী সুলভ লেখনীর টানে এই স্নানযাত্রা প্রসঙ্গে কোন্নগর বাগানবাড়ীতে বসে যে চিত্র এঁকেছেন তা উল্লেখযোগ্য :—

"গঙ্গার আর এক দৃশ্য, সে স্নানযাত্রার দিনে, দলের পর দল নৌকা, বজরা, তাতে কতলোক গান গাইতে গাইতে, হল্লা করতে করতে চলেছে। ভিতরে ঝাড় লন্ঠন জ্বলছে ; তার আলো পড়েছে রাতের কালো জলে। রাত জেগে খড়খড়ি টেনে দেখতুম, ঠিক একখানি জলন্ত ছবি।

স্নানযাত্রীদের নৌকো সব চলেছে পর পর। রাতের অন্ধকার সেও আর এক শোভা গঙ্গার। রাত্তির বেলা সারি সারি নৌকোর নানা রকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকোর আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত। কোনো নৌকোয় নাচ

গান হচ্ছে, কোনো নৌকোয় রান্নার কালো হাঁড়ি চড়েছে, দূর থেকে দেখা যেত আগুনের শিখা।'

মোট কথা, রিষড়ার ঘাটে ঘাটে, তখন অবশ্য অধিকাংশই কাঁচা, বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী সমাগম হওয়ার ফলে, এখানকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের বেচা-কেনার মরশুম পড়ে যেত। ডাব, কলা থেকে আরম্ভ ক'রে মুড়ি তেলেভাজা এমনকি কয়েকমন মৌরলা মাছ পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যেত। পেশাই করা বাটনার চাহিদাও কম ছিল না। পথের ধারেও কেউ কেউ তাদের পশরা নিয়ে বসে যেত। মূল উৎসব ক্ষেত্রটি মাহেশের সীমার মধ্যে অবস্থিত হলেও মেলার পরিধি ছিল উত্তরে বল্লভপুর থেকে দক্ষিণে রিষড়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা এই দুটো পর্ব উপলক্ষে উপরোক্ত জিনিষ গুলোর চাহিদা এমন ভাবে বৃদ্ধি পেত যে সরবরাহের পরিমাণ কম হলে তাদের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেত।

তখন লোকে মাহেশের স্নানযাত্রা দেখে পনর দিনে পায়ে হেঁটে পুরীতে গিয়ে নবযৌবন, রথযাত্রা ও পুণর্যাত্রা দর্শন করে তারপর গৃহে ফিরতেন, সঙ্গে ক'রে আনতেন মহাপ্রসাদ, সমুদ্রের ফেনা, গুঞ্জামালা আরও কত কি। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সেই সব অপূর্ব জিনিষের বিতরণ নিয়ে ধূম পড়ে যেত। গুরু পুরোহিতদের সঙ্গে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন নামাবলী প্রভৃতি।

এই সব পুরীযাত্রীদের সঙ্গে 'সেথো' বা 'সাথী' হিসাবে যেতেন রিষড়ার কোনও কোনও বলিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ঈশান চন্দ্র হড় মহাশয় এই ভাবে বিভিন্ন তীর্থে যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন বলে শোনা যায়। শেষবার তিনি পুরীতেই দেহরক্ষা করেন। সঙ্গে ছিল বালক পুত্র ধর্মদাস। ধর্মদাস হড় মহাশয় বালক হলেও প্রত্যুৎ-পন্নমতি ও মানসিক বলের সাহায্যে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় হতবুদ্ধি না হয়ে স্থানীয় কয়েকজন উড়িষ্যাবাসীর সাহায্যে সমুদ্রতীরে পিতার অন্ত্যেষ্টি কর্মের ব্যবস্থা করেন এবং শবদাহকারীদের পাওনা গণ্ডা দাবি

করবার আগেই কৌশলে দেশাভিমুখে পা বাড়াতে সক্ষম হন। পথিমধ্যে এতদঞ্চলের কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান এবং তাঁদেরই আনুকূল্যে গৃহে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

পুরীযাত্রী জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, কিন্তু 'সার জন লরেন্স' নামক পুরীগামী যাত্রীপূর্ণ জাহাজ ঝড়ে বিনষ্ট হওয়ার ফলে, বহু ব্যাক্তির জীবন হানি ঘটে। তদবধি জাহাজে যেতে বড় একটা কেউ সাহস করতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মা সারদা মনি যখন পুরী গিয়েছিলেন তখন তিনি কলকাতা থেকে জাহাজে গিয়েছিলেন চাঁদবালী পর্যন্ত। চাঁদবালী থেকে লঞ্চে কটক, কটক থেকে গরুর গাড়ী করে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছেছিলেন।

সে যুগে এইসব তীর্থ যাত্রা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বিপদ সঙ্কুল। শ্বাপদ ভীতির সঙ্গে সঙ্গে ছিল দস্যুভীতি। পথিমধ্যে এই সব দস্যুরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে লুটপাট ও মারধোর করে অরণ্য পথে গা ঢাকা দিত। ধনি নির্ধন নির্বিশেষে কোন ভেদাভেদ ছিল না।

তীর্থের পাণ্ডারা বিশেষ বিশেষ পর্বের বহু পূর্বেই তাঁদের ছড়িদার পাঠিয়ে দিতেন পরিচিত যজমানের কাছে। ছড়িদাররা স্বভাব সুলভ আকর্ষণীয় মিষ্টি কথায় পাড়ায় পাড়ায় যাত্রী সংগ্রহ করতেন। কারও কারও অর্থের অনটন পড়লে পাণ্ডারা অনেক সময় অর্থ সাহায্য ও ঋণ দিতেন। সঙ্গে যেতেন স্থানীয় কয়েকজন কষ্টসহিষ্ণু পুরুষ। তাঁদের পথ খরচটা ও আহারাদির ভার বহন করতেন তীর্থযাত্রীরা সকলে মিলে। দশজনের সংসারে একজনের ভার কারও গায়ে লাগত না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত পথক্রমা। মধ্যে মধ্যে পরিচিত 'চটিতে' বিশ্রাম ও স্নানাহারের ব্যবস্থা করা হত।

পথিমধ্যে কেউ কেউ প্রাণ হারাতেন, দস্যুর আক্রমণে অথবা ব্যাধির প্রকোপে। তাঁদের ভাগ্যে আর তীর্থ দর্শন ঘটে উঠত না; গৃহে ফেরা তো দূরের কথা, তাই বহু ক্ষেত্রেই প্রবীন ও প্রাচীনারা তীর্থ যাত্রার পূর্বে তাঁদের বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পন ক'রে যেতেন বা বিভাগ বণ্টন করে দিতেন নিজ নিজ পুত্র কন্যাদের মধ্যে

সে যুগের লোকে বিশ্বাস করত যে যাঁরা তীর্থে গিয়ে আর ফিরতেন না; সেইখানেই দেহরক্ষা করতেন তাঁরা অনন্ত স্বর্গলাভ করতেন। আর যিনি ফিরে আসতেন, তিনি সঙ্গে নিয়ে আসতেন তীর্থের সকলের সঙ্গে পরম তৃষার শান্তি। তিনি তাঁর পরমাশ্চর্যকর অভিজ্ঞতার কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে দিতেন তৃষিতের কাছে। সেই সব কাহিনী শ্রুতির মাধ্যমে স্মৃতিতে বিরাজ ক'রে চলত বংশানুক্রমিক ধারায়। তীর্থ পাণ্ডাদের খাতায় তাঁদের নাম ধাম ও গোত্রাদি লেখা হয়ে যেত ভবিষ্যৎ বংশধরদের আগমনের প্রতীক্ষায়। যাঁরা যেতে পারতেন না তাঁরা ঘরে বসে তৃষিত চিত্তে স্মরণ করতেন সেই সব তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য। মনে মনে কামনা করতেন, ইহ জন্মে হল না, পরজন্মে যেন যাওয়া হয়।

আজ দিন পালটেছে, কাল পালটেছে, তীর্থ যাত্রার পথ অনেক সুগম হয়েছে। তীর্থযাত্রার কাহিনী শ্রুতি ও স্মৃতি ছেড়ে এখন ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে সকলের কাছেই সহজলভ্য হয়েছে। আলোক চিত্রের সাহায্যে দুরধিগম্য পার্বত্য তীর্থ মহারাজের শ্রীমন্দির ও পার্শ্ববর্তী নৈসর্গিক দৃশ্যগুলি দর্শন করে লোকে চাক্ষুষ তৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে মনও বদলে গিয়েছে বলে মনে হয়। সে যুগের সেই পরম তৃষার আহ্বান কি তেমনিই আছে?

কতকটা অর্থাভাবে, কতকটা সাংসারিক চাপে বা উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তখন নিকবর্তী তীর্থ ভ্রমণও সকলের ভাগ্যে ঘটে উঠত না। ত্রিবেণী, কালীঘাট, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ-ধামই বা কয়জন যেতে পারতেন। তারপর সাগর সঙ্গমে

মকর স্নান, সেই বা কয়জনের সামর্থ্যে কুলাত ? একমাত্র তারকেশ্বর ছাড়া, আর সবগুলো তীর্থই যেতে হত নদী পথে। তারকেশ্বরের হাঁটা পথ ছিল অত্যন্ত নির্জন ও বিপদ শঙ্কুল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরতে না পারলে, পথিমধ্যে ঠ্যাঙাড়েদের হাতে ধনপ্রাণ বিসর্জ্জন দেবার আশঙ্কা ছিল প্রচুর। বন-জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তারা পথিকদের পায়ের গোছে 'পাবড়া (ছোটো লাঠি) ছুঁড়ে মারত, এবং সেই আঘাতে যাত্রীরা অসহ্য যন্ত্রনায় ধরাশায়ী হলে তাঁদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে বনের মধ্যে পলায়ন করত। গরুর গাড়ীতে গিয়েও এই ধরণের বিপত্তির হাত থেকে নিস্কৃতি ছিল না। রিষড়ার প্রাচীনদের মুখে এই সমস্ত ঘটনার অনেক গল্প কাহিনী আজও শোনা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আমার পিতৃদেব এই জাতীয় আক্রমণের কবলে পড়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, সঙ্গীর সাহস ও বুদ্ধিমত্তার ফলে তাঁরা সে যাত্রা উভয়েই রক্ষা পান।

রিষড়া ও এতদঞ্চলবাসীদের মধ্যে অনেকেই শেষ বয়সে কাশীবাসী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। মা অন্নপূর্ণার দুয়ারে কেউ অভূক্ত থাকে না, তাই যৎসামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে সংসার ছেড়ে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ৺কাশীধামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলে আর পুনর্জ্জন্ম হবে না। তাই বার্দ্ধক্যে পুত্র কলত্রদের অশ্রদ্ধা, লালন পালনে অনাসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় তাঁদের কাশী পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করতেন। কথায় বলে—'পেটের আপদ মুড়ি, আর ঘরের আপদ বুড়ি।'

কোন কোন পুত্র হয়তো সময়ে সময়ে দু' এক টাকা পাঠিয়ে দিতেন, কারও ভাগ্যে হয়তো তাও জুটত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও উপরোক্ত প্রথা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল এবং বহু বাঙালী অধিবাসীদের বসবাসের ফলে কাশীধামে 'বাঙালী টোলা' ব'লে একটা

ছোটখাট কলোনী গড়ে উঠে ছিল। 'বার্দ্ধক্যে বারানশী' কথাটা তাই প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে।

পদব্রজেও যে কাশীধামে যাওয়া যায় তা আজকের যুগেও রিবড়ার কয়েকজন নবীন ও প্রবীন প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

'সব তীর্থ বার বার; গঙ্গাসাগর একবার'। 'সাগর, সব তীর্থের আগড়।' গঙ্গার সমস্ত মাহাত্ম্য, সমস্ত পবিত্রতা যেন এই একটি মাত্র তীর্থেই বিরাজিত।

"সর্বত্র দুর্লভা গঙ্গা ত্রিভিঃ স্থানৈর্বিশেষতঃ।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে॥" (বায়ু পুরাণ)

তাই লোকে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহু ক্লেশ সহ্য ক'রে এবং আপদ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মকর সংক্রান্তির পুণ্য দিনটিতে সর্ব ভারতীয় তীর্থে স্নান দান ক'রে এবং কপিল মুনি দর্শন করে নিজের জীবনকে ধন্য জ্ঞান করতেন। মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না, কারণ তখন শাস্ত্রবাক্য অনুযায়ী লোকে বিশ্বাস করত যে গঙ্গাসাগরের জলে-স্থলে- অন্তরীক্ষে যেখানেই মৃত্যু হোক না কেন, মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী।

অন্যান্য তীর্থযাত্রার মত, গঙ্গাসাগর যাবার জন্যেও এক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি ও যাত্রী সংগ্রহ পর্ব শুরু হত। তারপর বড় বড় নৌকায় তোলা হত কুড়ি পঁচিশ জন লোকের ১৫/১৬ দিনের আহার্য ও পানীয় জল এবং রন্ধন উপযোগী সাজ সরঞ্জাম ও ইন্ধন দ্রব্যাদি। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ভেদে পালাক্রমে রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রেও ছুঁতমার্গের অব্যাহতি ছিল না, ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবাদের ত' কথাই নেই। নদীর চড়ায় নৌকা লাগিয়ে মলমূত্রাদি ত্যাগ ও স্নানাহারের ব্যবস্থা করা হত। হঠাৎ জোয়ার এসে অনেক সময় জিনিষ পত্র ভাসিয়ে নিয়ে যেত। মাঝি মল্লাদের মধ্যে কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ঢুকে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের হাতে

প্রাণ দিত। নৌকাডুবির কাহিনীও বিরল নয়। রিষড়ার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে সে সব ঘটনার স্মৃতি আজও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি।

১৮৫৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী দৈনিক সংবাদ প্রভাকরে গঙ্গাসাগর মেলা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সে যুগের তীর্থযাত্রার বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে :—

"সাগর হইতে কোন প্রত্যাগত ব্যক্তির দ্বারা অবগত হইলাম যে অন্যান্য বৎসর সকল সংক্রান্তির মেলায় তথায় যেরূপ সমারোহ হয় এবারও তদ্রূপ হইয়াছিল, আমারদিগের টৌন মেজর সাহেব চারিটা তোপ ও একদল সৈন্য সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া অবিশ্রান্তরূপে তোপ করাতে ব্যাঘ্রের ভয় বড় বৃদ্ধি পায় নাই, কেবল তিনজন নাবিক বনমধ্যে কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া উক্ত জন্তু দ্বারা হত হইয়াছে, এবারে সংক্রান্তি সময়ে গগন মণ্ডল নীরদজালে আবৃত থাকাতে শীত অধিক হয় নাই, দোকানদার বিস্তর গিয়াছিল, ডাব নারিকেল পয়সায় দুইটা করিয়া বিক্রয় হইয়াছে, সাগরেও দুই ব্যক্তি পরস্ব অপহরণাপরাধে ধৃত হইয়া মিলেটরি কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে।

৫০ জন গঙ্গা সাগর যাত্রী বাঘের উদরস্থ হইয়াছেন এবং নৌকাডুবিতে অনেকের প্রাণনাশ হইয়াছে।"

রিষড়ার অধিবাসীরা, যাঁরা গঙ্গা সাগর যেতে পারতেন না তাঁরা ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান দানাদি কার্য সমাধা করতে যত্নবান হতেন।

এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনটিতে রিষড়া গন্ধ বণিক সমাজের মহিলারা 'সোদো' পূজা করে সোলার বা কলার পেটোয় তৈরী নৌকো তৈরী করে তাতে ফুল, লতাপাতা এবং পতাকা দিয়ে সাজিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতেন আর বলতেন—'সো-দো ভাসে, আমার ভাই হাসে, '—ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রথার মধ্যে প্রাচীন বাণিজ্য যাত্রার স্মৃতিই বোধহয় বিজড়িত।

এই গঙ্গা সাগর তীর্থের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সে যুগের একটা নিষ্ঠুর কুপ্রথা,সাগর সঙ্গমে সন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া। তৎকালীন বহু কুপ্রথার মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। ভারতের গভর্নর জেনারেল মারকুইস অব ওয়েলেসলির শাসন কালে ইং ১৮০২ খৃঃ এই নিষ্ঠুর প্রথাটি আইন দ্বারা রহিত করা হয়।

বলা বাহুল্য যে উক্ত প্রথার পিছনে কোনও রূপ শাস্ত্রীয় অনু-মোদন না থাকলেও স্ত্রী লোকেরা বিবাহের পর বহুদিন নিঃসন্তান থাকলে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে মানত করতেন—যদি তাঁর কৃপায় সন্তানাদি হয় তা হলে প্রথম সন্তানটি তাঁকে দেবেন অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে গঙ্গায় উৎসর্গ করবেন। আবার মৃতবৎসা দোষ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেও অনুরূপ ভাবে মানত রক্ষা করা হত।

যুগে যুগে বারে বারে বহু সাইক্লোনে সাগর উপকূল হয়েছে বিধ্বস্ত, বেলাভূমি হয়েছে সাগরবক্ষে বিলীন। কপিল মুণির মন্দির হয়েছে স্থানচ্যুত কিন্তু তীর্থ মহিমা মহাভারতের যুগ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলকাব্যের যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীতেও রয়েছে তেমনই অপ-রিবর্ত্তীত তেমনি আকর্ষণীয়।

চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় নায়ক শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রাকালে এই তীর্থে স্নান তর্পণাদি সমাধা করেন বলে কবি উল্লেখ করেছেন—

"যেখানে সগর বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে
হৈয়া সব চতুর্ভূজ বেশ।
মুক্তিপদ এইস্থান, এইখানে করি স্নান,
চল ভাই সিংহল নগর।

তর্পণ করিয়া জলে, ডিঙ্গা লয়ে সাধু চলে,
গাইল মুকুন্দ কবিবর।"

কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

আকর গ্রন্থরাজি

১। পলাশীর যুদ্ধ—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়।
২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন এম, এ, পিএইচ ডি।
৩ কলিকাতার কথা—রায়বাহাদুর প্রমথ নাথ মল্লিক!
৪। নূরজাহান—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। নদীয়া কাহিনী—কুমুদনাথ মল্লিক।
৬। ছেলে বেলার স্মৃতি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ)
৭। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস—সতীশ চন্দ্র মিত্র।
৮। ছড়ায় ননদ ভাজ—রমা সরকার (যুগান্তর ২৭/৩/৭০)
৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী।
১০। হুগলী জেলার ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—সুধীর কুমার মিত্র।
১১। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—দুর্গা চরণ সান্ন্যাল।
১২। উইক্ এণ্ড টুরিষ্ট গাইড্—শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
১৩। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু।
১৪। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।
১৫। গঙ্গাসাগর—শম্ভু মহারাজ।
১৬। শাঁখা সিন্দুর—পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ।
(গুরুবার্ত্তা-২য় বর্ষ-শ্রাবণ—১৩৭৭)
১৭। পূজা পার্বণ—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
১৮। বাংলা ও বাঙ্গালী—মোহিতলাল মজুমদার।
১৯। বিদেশীর চোখে বাংলা—চণ্ডী লাহিড়ী।
২০। মাহেশ মঙ্গল—শ্রীআত্মানন্দ শর্মা।
২১। শ্রীশ্রীমা সারদামণি—শংকর দে।

জমিদারীর কথা

স্নানযাত্রার পরই রথ যাত্রা। এই রথ যাত্রার কথা বলার আগে স্নানযাত্রার সঙ্গে যে দুটি জমিদার বংশের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাঁদের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমে শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ দে বংশের কথা এসে পড়ে। 'ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দমদমার নিকটবর্ত্তী গাঁতি নামক গ্রামে ইঁহাদের আদিম বাস ছিল। তৎপরে সে স্থান ত্যাগ করে তাঁরা রিষড়ায় এসে বাস স্থাপন করেন এবং হড় মহাশয়দের পৌরোহিত্যে বরণ করেন। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭৫৫ খৃঃ ডেনিস গভর্ণমেণ্ট পাটুলির রাজার নিকট থেকে দু'খানি গণ্ডগ্রাম সংগ্রহ করে শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তৎকালে বর্ত্তমান শ্রীরামপুর বা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেশীয় রাজন্য বর্গের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ভাগীরথীর পশ্চিম উপ-কূলস্থ ভূভাগ, যে অংশ শ্রীরামপুর নামে খ্যাত, ঐ সকল ভূমিখণ্ডে ইংরেজদের কোনরূপ আধিপত্য ছিল না।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর পূর্বে অর্থাৎ শ্রীরামপুরে দিনেমার আগমনের কিছু পূর্বে রামভদ্র দে ব্যবসায় উপলক্ষে রিষড়া থেকে শ্রীরামপুরে উঠে যান। তাঁর একখানি মুদিখানার দোকান ছিল।

তিনি তুলার ব্যবসা ও দিনেমার কোম্পানীর আনীত বৈদেশিক দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র দে। তিনি কলকাতায় কোন আত্মীয়ের লবণের কাজে শিক্ষানবীশ রূপে প্রবেশ করে শেষে নিজের চেষ্টা ও কার্যদক্ষতার গুণে লবণের ব্যবসায়ে বিপুল সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন এবং উপার্জিত অর্থের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারও করেছিলেন।

১২৩০ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮২৩ খৃঃ) রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন এবং তাঁর সহধর্মিনী তাঁর সহমৃতা হয়ে এই বংশকে গৌরান্বিত করে যান।

তাঁর পুত্রগণ 'দানসাগর' শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন এবং এতদুপলক্ষে কলকাতা থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ৫০০ শত অধ্যাপক বিদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। তার সঙ্গে ৪০,০০০ দরিদ্র কাঙালী বিদায় উপলক্ষে প্রত্যেককে চারি আনা করে দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণ ভোজন উপলক্ষে ১২০/ মন সন্দেশের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ায়' এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরু ও পুরোহিত কি পরিমাণ দান দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হন তার যথাযথ ও বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, রিষড়ার হড় বংশীয়েরা সেদিনও যেমন আজও তেমনি দে বংশের পৌরহিত্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

(দানসাগর শ্রাদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে—ষোড়শ দানের প্রত্যেকটি দ্রব্য ১৬টি হিসাবে উৎসর্গ করা হয়।)

রামচন্দ্র দে ও তাঁর সহধর্মিনীর মৃত্যুর শত বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় ১৩৩০ সালের ৬ই শ্রাবণ নবমী তিথীতে তাঁর একমাত্র জীবিত পৌত্র ৺মদন মোহন দে মহাশয় পিতামহ ও পিতামহীর শত বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধ এতদঞ্চলে বুড়াবুড়ির শ্রাদ্ধ নামে খ্যাত হয়। ১২৩০ সাল থেকে শতবর্ষ ধরে রথের সময় বাৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শ্রীরামপুর, বল্লভপুর, মাহেশ ও রিষড়ার ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হত।

৺রামচন্দ্র দের এক পৌত্র—হরিশ্চন্দ্র দে বিদ্যোৎসাহী ও তেজস্বী পুরুষ বলে পরিচিত ছিলেন। রিষড়ায় তাঁর নামে একটি সাধারণ শ্মশান ঘাটের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। সম্ভবতঃ ইহা কৈলাশ চন্দ্র লাহা ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী শ্মশান।

Medl.gzt-Dr. Crawford

এখন সেওড়াফুলির রাজ বংশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক এই বংশের আদি নিবাস পাটুলি।

সম্রাট আকবরের সময় থেকেই এঁদের জমিদারির স্বীকৃতি। রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়ার এবং কনিষ্ঠ বাসুদেব পাটুলির বাটিতে বাস করতেন। কনিষ্ঠ বাসু-দেবের দুই পুত্র—প্রথম পক্ষে রাজা মনোহর রায় ও দ্বিতীয় পক্ষে গঙ্গাধর রায়।

মনোহর ও গঙ্গাধরের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ হওয়ায় জ্যেষ্ঠ মনো-হর দশ আনা ও কনিষ্ঠ গঙ্গাধর ছয় আনা অংশ পান এবং পাটুলির বাটী ত্যাগ করে বালীতে বাস স্থাপন করেন।

রাজা মনোহর রায়ও কালক্রমে দক্ষিণাংশের জমিদারী কার্য পরিদর্শনের সুবিধার্থে সেওড়াফুলিতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মান করে বাস স্থাপন করেন। বংশধরগণ পাটুলীতেই বাস করতে থাকেন।

রাজা মানাহর ছিলেন একজন খ্যাতনামা কৃতি পুরুষ। তিনি বহু দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের সেবা পরিচালন জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করেন।

মি: টয়েনবি তাঁর—'A sketch of the administration of the Hooghly District নামক পুস্তকে সেওড়াফুলি রাজ পরিবার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:—

"For several generations they vindicted their claims to this distinction (Sudra Mani or jewel of sudras) by their liberal donations to various shrines, and It is said that few temples of any note can be found in the country which have not received some tokens of their donation and bounty."

হুগলী কালেক্টরী থেকে একখানি দেবোত্তর সম্পত্তির তায়দাদের নকল থেকে জানা যায় যে এই বংশ কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৬০ দফা দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যে রাজা মনোহর দত্ত, সন ১১২৫ থেকে ১১৫০ পর্যন্ত ৩০ দফা দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

কথিত আছে যে রিষড়াব শ্রীশ্রী৺ সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবা পরিচালনার জন্যে কিছু ভূসম্পত্তি তিনি দান করেন

দেবোত্তর ছাড়াও তিনি বহু ব্রহ্মোত্তর জমিও দান করেন। তাঁর রাজ্য মধ্যে এমন গ্রাম ছিল না যার অর্দ্ধেক ভূমি তিনি নিষ্কর দান করেন নি।

সে যুগে একটা প্রবাদ ছিল যে, যিনি ব্রহ্মোত্তর জমি পান নি তিনি ব্রাহ্মণ পদ বাচ্যই নন এথেকে সে যুগের দেশীয় ভূম্যধিকারীগণের দানশীলতার কথাই প্রমাণিত হয়; কথায় বলে—

"দিনাজপুরেব নগদ দান, রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ চন্দ্রেব ব্রহ্মোত্তর, বর্দ্ধমানেব বৃত্তি॥

উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে সেওড়াফুলি রাজবংশ সম্বন্ধে লিখেছেন যে—"রাজা মনোহর রায় ও গঙ্গাধর রায় দানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, দান করিয়াই তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জমিদারীর ভিতর বোধহয় এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিল না, যিনি তাঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি পান নাই।

(বসুমতী—চৈত্র, ১৩৪০)

রাজা মনোহর চন্দ্র মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম মন্দির নির্মান করে দেন ও সেবা পরিচালনার জন্যে 'জগন্নাথপুর' নামক পল্লী দেবোত্তর হিসাবে প্রদান করায় কমলাকর পিপলাইএর বংশধরগণ স্নান যাত্রা উপলক্ষে সেওড়াফুলির রাজাদিগের অনুমতি ক্রমে বিগ্রহ ত্রয়ের স্নান আরম্ভ করেন। অদ্যাবধি তাঁদের উক্ত সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে।

সেওড়াফুলির ছয় আনা অংশের জ্ঞাতিগণ বালীতে বসবাস কালীন তাঁদের সম্পত্তি ঋণদায়ে শ্রীরামপুরের দে বংশকে বিক্রয় করে ফেলেন। যার ফলে তাঁরা ছয় আনি এবং সেওড়াফুলির রাজারা দশ আনির জমিদার নামে খ্যাত হন।

রাজা মনোহার রায়ের পুত্র রাজা রাজচন্দ্রের নিকট থেকে দিনেমার গভর্ণমেণ্ট ষাট বিঘা জমি ১৬০১ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়ে শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মান করেন এবং তদানীন্তন ডেনমার্কের রাজা ফ্রেডারিকের নামানুসারে ফ্রেডারিক নগর নামাকরণ করেন।

রাজ চন্দ্র (মতান্তরে রাজা মনোহর রায়) ১১৬০ বঙ্গাব্দের ৮ই জ্যৈষ্ঠ ঐ গ্রামে রাম সীতা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করায় শ্রীরামপুর নামে খ্যাত হয়। এই বিগ্রহের সেবা পরিচালনর জন্যে তিনি শ্রীপুর, মোহনপুর, গোপীনাথপুর গ্রামত্রয়ের মধ্যে তিনশত বিঘা দেবোত্তর ভূমি প্রদান করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়ের আমলে স্নানযাত্রা উপলক্ষে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বসন্ত কুমার বসু তাঁর রচিত "শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাসে" হুগলীর কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টয়েনবি সাহেবের পুস্তক থেকে উক্ত বিবরণ সংকলিত করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত পুস্তক পাঠে সে তথ্য অবগত হতে পারবেন। অনিবার্য কারণে সে বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হল না।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী সর্বমঙ্গলার ১২২৪ সালে অপমৃত্যু ঘটে, ঐ অপমৃত্যু পাপ থেকে নিস্তার লাভের জন্য তিনি সেওড়াফুলির গঙ্গাতটে ১২৩৪ সালে 'নিস্তারিণী' নামে দক্ষিণা কালীকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর অপর দুই পত্নী হর সুন্দরী ও রাণী রাজবনকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দান করে তিনি ১২৩৯ সালে ফাল্গুন মাসে পরলোক গমন করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই সেওড়াফুলি রাজবংশ বড় তরফ ও ছোট তরফ হিসাবে দুই হিস্যায় বিভক্ত হয় এবং পরস্পর গৃহ বিবাদে সত্বর অধঃপতনের মুখে ধাবিত হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ যোগ্য যে রিষড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলি উপরোক্ত উভয় পরিবারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে দশ আনির জমিদারী অন্যানেরা পত্তনী ও দরপত্তনী গ্রহণ করায় সেটেলমেন্ট রেকর্ডে তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ আছে।

খালের কথা

দশ আনি ও ছয় আনি জমিদারীর সীমা রেখা নির্দ্ধারণ করে বালি খাল খনিত হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত খালটি গঙ্গাতীর থেকে পশ্চিম দিকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে ডানকুনির জলায় গিয়ে মিশেছে। খালটি খনিত হবার পর মূল বালি উত্তর পাড়ার মধ্যে কিছু ব্যবধান এসে পড়ে এবং এই ব্যবধান এক-রূপ চিরব্যবধানে পরিণত হয়।

বালি খালের উক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে যুগে খনিত খালগুলি যে কেবলমাত্র দু'টি গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা নির্দ্ধারণ করত তাই নয় গঙ্গার জল, পশ্চিম দিকে অবস্থিত গ্রামগুলির প্রান্তবর্ত্তী কৃষি ক্ষেত্রে পৌছে দিয়ে সেচের কাজে সহায়তা করত।

উত্তরপাড়া ভদ্রকালীর মধ্যেও গঙ্গা তীরস্থ কিয়দ্দূরবর্ত্তী স্থান 'ওয়াড়' বা জোল দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। উক্ত জোলের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মান কালে বন্ধ হয়ে যায়।

কোন্নগর ও কোতরঙ্গের মধ্যেও একটি সংকীর্ণ খাল উভয় গ্রামের সীমারেখা নির্দ্ধারণ করত। উক্ত খালটি আমড়া তলার খাল নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত খালটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে।

রিষড়া ও মাহেশের মধ্যবর্ত্তী চম্পা খালের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ ২৯। উক্ত খালটি পূর্বে যে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং প্রশস্ততর ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ওম্যালি সাহেব তাঁর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন:—

"On the south bank of the Champa khal a creek (খাল বা ছোট নদী) that separated this place from Mahesh, stood Rishra Honse."

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রাচীন স্থানগুলির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"A little higher up is the village of Mahesh. It extends from the upper creek at Rishra to Bullavpore".

কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় *তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে রিষড়ার চতুঃসীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "ইহার পূর্ব্বসীমা ভাগীরথী, পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ, উত্তর সীমা চম্পাখাল, দক্ষিণ সীমা বাঘের খাল (প্রকৃত নাম বেগের খাল)। উক্ত চম্পাখালের অস্তিত্ব একালে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই খালই গ্রামের জল নিঃসারণের একমাত্র পয়োনালা ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে 'ওয়েলিংটন জুটমিল' স্থাপিত হইলে গঙ্গার মোহনার সন্নিহিত খাল বন্ধ করিয়া উক্ত মিল স্থাপিত হইয়াছিল। বহু বৎসর যাবৎ জল বাহির করিয়া দেওয়ার অসুবিধা ছিল, পরে ঐ জল পশ্চিম দিক দিয়া রাইল্যাণ্ড খালে অপসারিত হইতেছে"

---

* প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংযুক্ত রিষড়া—কোন্নগর পৌরসভার ভাইসচেয়ারম্যানের পদে বেশ কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এতদঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল।

মিঃ ক্রফোড সাহেব তাঁর মেডিকেল গেজেটিয়ারে এই চম্পাখাল সম্বন্ধে লিখেছেনঃ—

"At the beginning of th‌ century a khal konwn as the 'Champa khal' opened into the river immediately to the north of Warren Hastings country house. The mouth of this 'khal' however gradually silted up and has many years been completely obliterated, the site being now covered by one of the Hastings Jute Mill.

বাগের খাল

রিষড়ার দক্ষিণ সীমায় বাগের খালের অস্তিত্বও সুপ্রাচীন। এই খালের প্রকৃত নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে পুর্বে এই খালের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে বাঘ লুকিয়ে থাকত বলে এর নাম বাঘের বা বাগের খাল বলে লোক মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। এই মতের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারেই কোন খাল, পুষ্করিণী বা অন্যান্য স্থানের নামকরণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ যিনি এই খালটি খনন করিয়েছিলেন তাঁর নামটি এই খালের নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। সেকালে ত খালের ধার কেন অন্যান্য বন জঙ্গল মাত্রেই বাঘ বা অপরাপর শ্বাপদ জন্তু লুকিয়ে থাকত. কাজেই সেই কারণে এই খালের, সঙ্গে বাঘ জাতীয় জন্তুর নাম জড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

'বাগ' বা 'বাগিচা' অর্থে উদ্যান. উপবন বোঝায়। যদি কারও বাগান বা উপবনের নাম স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্যে এর নাম 'বাগের খাল' করা হয়ে থাকে তা হলে যাঁর বাগ বা বাগিচা তাঁর নামই এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। 'বাগ' সে যুগের একটি জাতির উপাধি ছিল। হয়তো কোন 'বাগ' উপাধি যুক্ত ব্যক্তি কৃষি কার্যের সুবিধা-

কল্লে গঙ্গা থেকে পশ্চিম দিকে কিছুদূর পর্যন্ত এই খাল খনন করিয়ে ছিলেন তাই এর নামকরণ হয় 'বাগের খাল' বলে। যেমন মুখুজ্জে বাগান, চাটুজ্জো বাগান, সাহেব বাগান বর্গীবাগান প্রভৃতি।

এখন কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রচিত হুগলী জেলার ইতিহাসে রিষড়ার চতুঃসীমা বর্ণনা প্রসঙ্গে দক্ষিণে বাঘের খাল লিখেও প্রকৃত নাম 'বেগের খাল' বলে কেন উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে যে কাহিনী জড়িয়ে থাকা সম্ভব তা আলোচনা যোগ্য।

"পাঠানগণ যখন পশ্চিম ভারতে আসিয়া প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন তাঁহারা নিম্নবঙ্গকে বাদা ও সুন্দর বনের অস্বাস্থ্যকর জল বায়ুর জন্য 'দোজাক' বা নরক বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বাস করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কোন আমীর বা বিশিষ্ট সম্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে তাঁহার শিরশ্চেদ না করিয়া এই প্রদেশে নির্বাসিত করিতেন। মালেক কাশিম নামে ঐরূপ এক আমীর হুগলীর অব্যবহিত পশ্চিমে আসিয়া বাস করেন। এখনও তথায় তাঁহার নামে একটি হাট চলিয়া আসিতেছে। মালেক মীর আমেদ বেগ ঐরূপ আর এক ব্যক্তি আসিয়া বংশ বাটীর অপর পারে সুবৃহৎ বাস-স্থান নির্মান করেন এবং গঙ্গা হইতে যমুনা পর্যন্ত একটী খাল কাটিয়া-দেন। উহাই বর্তমানে বেগের খাল, অপভ্রংশে বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিন শত বৎসর পূর্বে মুরশিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর কোনও এক দুষ্কার্যের শাস্তি স্বরূপ এখানে নির্ব্বাসিত হন। তাঁহারই বাগ বাগিচা হইতে এই স্থানটি মল্লিক বাগ নামে ও খালটি বাগের খাল নামে খ্যাত হয়।'

—নদীয়া কাহিনী।

একথা অনেকেই জানেন যে রিষড়ার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত আলোচ্য বাগের খালের অব্যবহিত দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত দক্ষিণ ভূভাগ 'আলিনগর মৌজা' নামে খ্যাত ছিল এবং প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে উক্ত নামের উল্লেখ থাকায় একথা বোঝা যায় যে উক্ত এলাকা পূর্বে কোনও মুসলমান আমীর বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জায়গীর ছিল এবং তাঁর নাম সম্ভবতঃ মহম্মদ আলি বেগ বা ঐ জাতীয় অপর কোনও নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনিই বোধহয় উক্ত খালটি খনন করান। পরবর্ত্তী কালে তাঁর বাগ বা বাগিচা কিম্বা নামানুযায়ী এই খালের নাম বেগ সাহেবের খাল, অপভ্রংশে বেগের খাল বা বাগের খাল বলে অভিহিত হয়। (১২৯৯ সালে কোন্নগরে একটি বিক্রীত সম্পত্তির চৌহদ্দী প্রাচীন দলিলে নিম্নরূপ ভাবে লিখিত আছেঃ— ঐ পরগণার ঐ কোননগর গ্রামের অন্তর্গত আলিনগর গ্রামের ১বন্দ নিষ্কর আন্দাজী ১০০ শত বিঘা জমি হইার অংশ রকম তিন আনা চার গণ্ডা, পুর্ব্ব ৺গঙ্গা, উত্তর বাগের খাল পশ্চিম অতুল মিত্রের বাগান ও দশ আনির শালি জমী, দক্ষিণ মাধব হাড়ীর বাস্তু ও শিবু কাওরা-দিগের বাস্তু।')

সুধী পাঠকবৃন্দ বিচার ক'রে দেখবেন উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোনটি অধিক সমীচীন।

রিষড়া পৌর সভার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকায় শ্রীমণীন্দ্র নাথ আশ উল্লেখ করেছেন যে ডাঃ বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে (১৬৫৬-৬৮ খৃ:) উল্লেখ আছে যে 'কলকাতা থেকে ৮ মাইল দূরে 'ইসরা' নামে এক সুন্দর গ্রাম আছে, এখান থেকে ব্যারাকপুরকে সরাসরি দেখা যায়।এখানে একটি খাল আছে, দিনে নৌকা চলে কিন্তু রাত্রে সেখানকার অবস্থা অতি ভয়াবহ। (সম্ভবত: বাগের খালের কথাই এখনে বলা হয়েছে)—"সাহনসা আওরঙ্গজেব—মহম্মমদ হোসেন ১৯৫০ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত উর্দু পুস্তক পৃঃ ৪৯৬।

উপরোক্ত খাল সম্বন্ধে 'কোন্নগর প্রকাশিকা' নামক পত্রিকায় (একাদশ সংখ্যা, ১৩৫৬, দ্বিতীয় বর্ষ) পাটনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী চন্দ্র মহাশয় যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন তাও এখানে উদ্ধার যোগ্য। "কোন্নগরের পুরাতন কথা ঃ—এক সময় হাতীর কুল অঞ্চলে কুমার নামে একজন কায়স্থ রাজার একটি গড়খাই বাড়ী ছিল। এই কুমার গড়ের অপভ্রংশই কোন্নগর নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই রাজবাড়ীর কাছে রাজার অনেক হাতি থাকত বলে এই পাড়ার নাম হাতীর কুল হয়েছিল। এই গ্রামের উত্তর দিকের জঙ্গলে ঐ সময় অনেক বাঘ থাকতো। তাদের উপদ্রব থেকে গ্রামকে রক্ষা করবার জন্য রাজা যে খালটা কাটাইয়া ছিলেন সেই বাঘের খাল এখনও বর্তমান আছে।" (ডাঃ নীলমনি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এই খালের মুখটি গঙ্গার সংযোগস্থলে প্রশস্ততর ছিল। উত্তরে বর্তমান প্রেসিডেন্সি জুটমিল থেকে দক্ষিণে হাতির কুলের প্রান্ত পর্যন্ত ক্রমনিম্ন ভূভাগ তার সাক্ষ্য বহন করছে।

উপরোক্ত খালগুলির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ফলে যে কৃষির উন্নতি সাধন হত সে কথা বোঝা যায় নিম্নলিখিত বিবরণ থেকেঃ—

"গোপীনাথ পুরের পাশ দিয়ে একটা কাটা খাল ছিল, গঙ্গা থেকে জলের ধারা এই পিয়ারাপুর অঞ্চলের ধানের জমিগুলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আবার বর্ষার বাড়তি জল এই খাল দিয়ে এসে গঙ্গার ধারায় মিশত। দিনেমার বণিকেরা খালটিকে সংস্কার করায় পিয়ারাপুরের ক্ষেতগুলোর ধানের ফলন বাড়ল",

শহর শ্রীরামপুরের ইতিকথা—ভৈরব প্রসাদ হালদার।

গ্রীক কলোনি।

বাগ খালের প্রসঙ্গে গ্রীকদের কথা এসে পড়ে। রিষড়ায় যে গ্রীকদের একটা ছোটখাট কলোনী গড়ে উঠেছিল একথা হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃঃ ৫৫০) এবং পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ফোল্ডারে এবং অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের অস্তিত্বের নিদর্শন আজ আর কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে শ্যামনগর পট্টি ও বাগের খালের সন্নিকটেই তাঁদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং সম্ভবতঃ তাঁরা তাঁদের বাসস্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত দিনেমার দিগের ডকে জাহাজ নির্ম্মান ও মেরামতি কাজে দক্ষ শিল্পী হিসাবে কাজ করতেন।

"Early in the 19th century there was a dook at konnagar where ships were built," (Medl. Gazetteer, Dr. Crawford)

"পূর্বে সামুদ্রিক জাহাজ নির্মানের জন্য এইস্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও কোন্নগরের ডকে জাহাজ নির্মিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।" হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র। পৃঃ ১১২০।

"১৭৫০ সালে আলেক্সিও আরিগিরি নামে একজন গ্রীক প্রথমে বাংলায় আসেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও বহু গ্রীক বাংলা দেশে আসে। তারা নিজেরা ছিল অতি ক্ষুদ্র ব্যবসাদার, ইংরেজরা তাদের ঠাট্টা করে বলত ফেরীওয়ালা।"

বিদেশীদের চোখে বাংলা —চণ্ডী লাহিড়ী

মোট কথা, সাত সাতটা ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্যকুঠি গড়ে উঠেছিল ভাগীরথীর পশ্চিম কূলবর্ত্তী পাশাপাশি গ্রামগুলোতেঃ—

'তন্মধ্যে ইংরেজদের প্রাধান্য হুগলীতে, পোর্তুগীজদের ব্যাণ্ডেলে, গ্রীকদিকের রিষড়ায়, জার্মানদিগের ভদ্রেশ্বরে, কোন্নগরে অষ্ট্রে-

লিয়ানদের, চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের এবং শ্রীরামপুরে দিনেমারদিগের অধিষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (হুঃ জেঃ ইতিহাস-প্রথম খণ্ড) যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নৌ-শিল্পও অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হয়ে চলেছে।

রথযাত্রা

মাহেশের রথযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে মাহেশের সঙ্গে রিষড়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আলোচনা করা দরকার।

বর্ত্তমানে, অধিক লোক সমাগমে, জীবিকার্জ্জনের প্রতিযোগিতায়, অবাঙালীদের চাপে এবং যানবাহনের হুড়াহুড়িতে মানুষ আজ প্রতি-বেশীদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সে যুগে, মাহেশ, রিষড়া ও বল্লভপুরের মানুষ ছিল আরও কাছাকাছি, আরও ঘনিষ্ঠ; একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সভ্য। সামাজিকতা ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে দলাদলিও ছিল।

পূজাপার্বণে, হাটেবাজারে মেলামেশা করার সুযোগ ছিল অফুরন্ত, তখন এক ক্রোশের দূরত্ব ছিল অত্যন্ত নগণ্য। সকালে বিকালে, বৃদ্ধেরা প্রত্যহ বের হতেন ভ্রমণে, স্থানে স্থানে বৈঠক বসত। গল্পগুজব, সংবাদ আদানপ্রদানে তাঁরা মনের আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতেন। মাহেশ ও রিষড়া ছিল তখন এপাড়া, ওপাড়ার মত পরস্পর সংযুক্ত। তখন না ছিল সংবাদ পত্র, না ছিল ঘরে ঘরে বেতারযন্ত্র। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলোর সংবাদ আসা যাওয়ার পথে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। বৃদ্ধদের নিত্যসঙ্গী ছিল হুঁকা কলকে। পরনে ছিল ধুতি আর চাদর, হাতে লাঠি; কারও গায়ে থাকত পিরান বা বেনিয়ান, পায়ে চটিজুতো।

রিষড়ার আয়তন ছিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলো অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। পূর্ব্বে মাহেশের কতকাংশ এবং আকনার কতকাংশ নিয়ে বল্লভপুরের সৃষ্টি হওয়ায় মাহেশের আয়তনও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

তিন চারশত বৎসর ধরে জগন্নাথদেবের স্নান ও রথযাত্রা উপলক্ষে মাহেশের প্রসিদ্ধি রিষড়া অপেক্ষা অধিক প্রসারলাভ করেছিল এবং লোক মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কালক্রমে রিষড়াকে বাহিরের লোকে মাহেশের অংশ বলেই গণ্য করত এবং সেই কারণেই রিষড়ার বহু ঘটনা ও প্রসিদ্ধ স্থানগুলো মাহেশের নিজস্ব বলে তৎকালীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছিল।

১৮৬৫ খৃঃ শ্রীরামপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠার সময় উপরোক্ত কারণে মাহেশ ও রিষড়া সংযুক্তভাবে তিন নম্বর ওয়ার্ড বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। সামগ্রিক আয়তন, লোকসংখ্যা, ভৌগোলিক নৈকট্য এবং উভয় গ্রামের অভিন্ন প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই যে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

'হেষ্টিংস হাউস' বা 'লজ' যে মাহেশের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত নয় একথা বাস্তব সত্য হলেও দু' দুখানা নামকরা গ্রন্থে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাগানবাড়ী মাহেশে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে :—

Travels of a Hindoo—Bholanath Chunder লিখেছেন— 'Warren Hestings had his garden house at Mahesh. One or two mango trees of his planting were to be seen till very lately."

দুর্গাচরণ রায় প্রণীত 'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' নামক পুস্তকেও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি দেখতে পাওয়া যায়—"ঐ মাহেশে ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেবের একটি বাগান ছিল। বাগানের দুই একটি গাছ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" উপরোক্ত বইগুলো খুবই নামকরা বই এবং লেখকেরাও বাঙালী। তাঁরা যে ইচ্ছা করে ঐরকম ভুল তথ্য

লিপিবদ্ধ করেছেন একথা চিন্তা করা যায় না। এর একমাত্র কারণ এক কথায় মাহেশের অঙ্গে রিষড়ার অবলুপ্তি, অথবা উভয় গ্রামের অভিন্নতা বা পরস্পর ঘনিষ্ট সংযোগ। অন্যদিক থেকে রিষড়া-বাসীদের কূপমণ্ডুকত্ব এবং প্রচার বিমুখতা।

এখন রথযাত্রার কথায় আসা যাক। একথা সর্ব্বজন বিদিত যে পুরীর রথের পরই মাহেশের রথের প্রসিদ্ধি। মাহেশের রথযাত্রা কবে থেকে প্রথম চালু হয় তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না তবে 'মাহেশ মঙ্গল' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে চাতরা নিবাসী কাশীশ্বর পণ্ডিতের আগ্রহ ও পরামর্শ ক্রমেই 'কমলাকর' সর্বপ্রথম রথযাত্রার প্রচলন করেন এবং তৎকালে চাতরার মদনমোহনের মন্দির পর্যন্ত এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। কালক্রমে পথের সংকীর্ণতা এবং জন বাহুল্য হেতু দীর্ঘপথ রথটানার অসুবিধা হওয়ায় কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের ভাগিনেয় রুদ্ররাম ব্রহ্মচারী কর্তৃক শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে উক্ত মন্দির পর্যন্ত রথযাত্রা প্রবর্ত্তিত হয়। ১২৬২ বঙ্গাব্দে বা ইং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাহেশের জগন্নাথ ও বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীর সেবাইতগণের মধ্যে মনো-মালিন্যের ফলে উক্ত প্রথাও রহিত হয়ে যায়। সন ১২৬২ ও ১২৬৩ এই দুই বৎসর 'ঘিরুই' এর মদনমোহন বিগ্রহ আনয়ন করে যে স্থানে এখন গুঞ্জবাটী ঐ স্থানে হোগলার ঘর বেঁধে অস্থায়ী গুঞ্জবাটী নির্ম্মান করে রথযাত্রা সম্পন্ন হয়।

১২৬৪ সালে কলকাতা পাথুরেঘাটা নিবাসী ৺মতিলাল মল্লিকের পত্নী৺রঙ্গময়ীদাসী 'গোপীনাথ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নূতন গুঞ্জবাটী নির্মান করে মহাসমারোহে রথযাত্রা সম্পন্ন করেন এবং বিপুল সম্পত্তি দেবোত্তর করে মাহেশের অধিকারী মহাশয়গণকে ট্রাষ্টি নির্বাচন করে যান।

অপরপক্ষে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবায়েতগণ তাঁদের রথের মেলা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তদুদ্দেশে নিমতলা স্ট্রীট নিবাসী ৺শিব কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৪/৬৫ সালে (ইং ১৮৫৭) নূতন ৺জগন্নাথ উত্তম দালান বাটী, নহবৎখানা, সুবৃহৎ ও সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত কাঠের রথ স্নানবেদী নির্মান ক'রে বল্লভপুরের দ্বিতীয় রথযাত্রা প্রচলন করেন। তদীয় পোষ্য পুত্র ৺ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত উক্ত রথযাত্রা উৎসব একপ্রকার বজায় ছিল কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর থেকে উক্ত রথযাত্রাও তিরোহিত হয় এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যান্ত ঐ সুউচ্চ এবং কারুকার্য-খচিত রথটি পথিপার্শ্বে অব্যবহার্য অবস্থায় উন্মুক্তভাবে পড়ে থাকার ফলে ক্রমশ: ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে একমাত্র মাহেশের রথযাত্রাই মহাসমারোহে ও সরকারী পরিচালনায় প্রতি বৎসর সুসম্পন্ন হচ্ছে এবং তদুপলক্ষে একমাসকাল মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

১৮১৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে আরম্ভ ক'রে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে মাহেশের এই রথযাত্রা সম্বন্ধে বহু তথ্যমূলক বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আসছে। কবে রথের চাকা কাদায় বসে গিয়ে রথটান সম্পূর্ণ হয়নি, কোন তারিখে শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক মিঃ টমসন সাহেবের পায়ের উপর দিয়ে রথের চাকা চলে যাওয়ায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন। এক পয়সায় কটা ক'রে আনারস বিক্রী হয়েছে! জুয়া খেলায় হেরে গিয়ে কয়েদ হবার ভয়ে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বারবনিতার কাছে বিক্রী করে দিয়েছে এসব তথ্যও সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হয়েছে।

যে দুর্ঘটনার কথা সম্ভবতঃ তৎকালীন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি সেটি হল—আনুমানিক ১৩১০।১১ বঙ্গাব্দে রিষড়ার বর্ত্তমান কালুরায় লেনের অধিবাসী ৺হরি আশের (শ্রীশিবচন্দ্র আশের

পিতা) একটি পা রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। দীর্ঘকাল শ্রীরামপুর ওয়ালশ্ হাসপাতালে চিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন বটে—কিন্তু জন্মের মত পিষ্ট ও চূর্ণীকৃত পাটি বাদ দিতে হয়।

শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে (প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডে) এই রথযাত্রা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত বিবরণ পাঠ করে দেখতে পারেন। এখন রথযাত্রার তাৎপর্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমাদের সমস্ত ধর্মকৃত্যই নির্দিষ্ট মাস ও তিথি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সে সমস্ত দিনগুলি অবশ্য যদৃচ্ছাক্রমে স্থির করা হয়নি, তার পিছনে কোনও স্মরণীয় পৌরাণিক কাহিনী বা জ্যোতিষিক যোগাযোগ সংযুক্ত আছে।

রথযাত্রার দিনটিও তেমনি আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে নির্দিষ্ট আছে। সেদিন পুষ্যা নক্ষত্র যোগ হলে অধিক ফললাভ হয়। "ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম।"—স্মৃতি। পূজা-পার্বণ নামক গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে উক্ত তিথিতে সূর্য উত্তরায়ণের শীর্ষবিন্দুতে গমন করেন এবং তারই প্রতীক স্বরূপ রথটিকে (সোজা রথ)। উত্তরদিকে টানা হয় এবং অষ্টাহবাদে সূর্যের যখন ধীরে ধীরে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় সেই দিনই রথটিকে দক্ষিণাভিমুখে টেনে আনা হয় (উল্টা রথ)। ইহার পরই আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

এর সঙ্গে বর্ষা ঋতুর আগমনের ইঙ্গিতও রয়েছে। রথোপরি উপবিষ্ট আছেন 'হালের' দেবতা সংকর্ষণ বা বলরাম। রথের চাকা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে যে শুধু সূর্য্যের দক্ষিণায়ন যাত্রাই সূচিত হল তাই নয়— কৃষির শুভ সূচনা হল ঐ সময়ে। (আষাঢ়/শ্রাবণ বর্ষাকাল)

রথে বামন দেবকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না, একথা সকলেই বলে থাকেন "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" কিন্তু সুধী ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে এদেখা চোখের দেখা নয়, এর অর্থ আত্মসাক্ষাৎকার। তাই কঠোপনিষৎ পরিষ্কার ভাবে বলেছেন :—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ॥ ১৷৩৷৩৷৪

অর্থাৎ জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিকে রথ চালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে।

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সমূহকে অশ্বগণের গমনের পথ বলিয়া থাকেন। (তাঁহারা) শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলিয়া থাকেন।

যিনি বিবেক বুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন যাহা হইতে পুনর্জন্ম হয় না।

রথের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটা সাদা ও একটা কালো বা নীল রংয়ের ঘোড়া—সুমন ও কুমনের অথবা ইন্দ্রিয়গণের সদসদ্ প্রবৃত্তির প্রতীক স্বরূপ। তাদের লাগাম ধরে চালনা করে বিবেকরূপী সারথী।

মহানারদ কাশ্যপ জাতকে এই তথ্যটি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে :—

"দেহ তব রথোপম শুন নরবর, আলস্য জড়তাহীন, তাই লঘুগতি
সারথি ইহার মন, অবিহিংসা দ্বারা হইয়াছে সুগঠিত অক্ষ এ রথের

*　　*　　*　　*

সদাচাররূপ অশ্বগণে যুক্তি মন চালায় এ রথ সদা দমরূপ পথে!
কুমার্গ তৃষ্ণা ও লোভ, সন্মার্গ সংযম। রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাত্মক কাম্য যত,
তাহাদের অভিমুখে যেতে চায় রথ, প্রত্যোদের যষ্টি হোক্ প্রজ্ঞা তব ভূপঃ
তাহার তাড়নে একে চালাও সুপথে। বিবেকই সারথি হোক এই দেহ রথে।'
ইত্যাদি

পুণ্য লোভাতুর মানুষ তাই রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে সে যুগে আত্মবিসর্জ্জনের চেষ্টা করত। কখন কখন তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হত অন্যান্য লোকের প্রচেষ্টায়। শ্রীরামপুরের কেরিসাহেবের প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে রথের তলায় আত্মবিসর্জ্জন দেওয়া আইন ক'রে রহিত করা হয়।

চৈতন্য চরিতামৃতে—মহাপ্রভু লক্ষ্মী দেবীকে রথে অনুপস্থিত দেখে স্বরূপকে প্রশ্ন করেছিলেন :—

"নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরা পঞ্চমীর রঙ্গে॥
* * * *
রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হইল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥
* * * *
বাহির হইতে রথ-যাত্রা করে ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি দিনে।
লক্ষ্মী দেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে?॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন ক্রীড়ায় সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন।
প্রভু কহে—যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা ও বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপী সঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥

অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেনে লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব!
কান্তের ঔদাস্য লেশে হয় ক্রোধভাব॥"

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী তিনদিন কেটে যায়, কিন্তু জগন্নাথ দেব আর ফেরেন না। অভিমানে দুঃখে লক্ষ্মীদেবীর তিন দিন কেটে যায়। তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। প্রতীক্ষায় কেটে যায় পঞ্চমী তিথিও। অগত্যা হোরা পঞ্চমীর পরদিন তিনি চতুর্দোলায় চড়ে হাজির হন গুণ্ডবাটীতে। সেখানে গিয়ে লৌকিক আচারে জগন্নাথ দেবের মন ফেরাবার জন্যে সর্ষে পোড়া দেন, তারই ফলে বুঝি মন ফেরে জগন্নাথ দেবের। মশালের আগুনে ছড়া কেটে পরপর তিনবার সর্ষে পোড়া দেওয়া হয়:—

"বার মুঠো সর্ষে, তেরো মুঠো রাই
চলরে সর্ষে কামিক্ষ্যে যাই,
সর্ষে করে চড় বড়, জগন্নাথের
মন করে ধড় ফড়।" ইত্যাদি

সরষে আগুনে পোড়ে চড়বড় করে, আর জগন্নাথ দেবের মন ছটফট করে, এর ফলেই বোধহয় চলে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ আয়োজন।

এই প্রচলিত বিশ্বাসের বশে নানা জায়গা থেকে অসংখ্য নরনারী আসেন এই মন্ত্রপুতঃ সর্ষে সংগ্রহ করতে, যাকে বশ করতে হবে, তার প্রতি সংগোপনে, সন্তর্পনে প্রয়োগ করলেই হল। একেবারে অব্যর্থ। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার লোকেরও অভাব নেই।

রথের বিবরণ।

কেউ কেউ বলেন যে মাহেশের প্রথম রথ নির্মান করে দেন কোনও এক ভক্ত মোদক এবং তখন রথ চলত গঙ্গাতীরবর্ত্তী জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়ে।

১৭৫৫ খৃঃ কলকাতা পাথুরে ঘাটা নিবাসী ৺নয়ান চাঁদ মল্লিক জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে বর্ত্তমান মন্দির নির্মান করে দেওয়ার পর থেকেই জি, টি, রোড দিয়ে রথ চালনা আরম্ভ হয়। তখন অবশ্য এপথ ছিল অপ্রশস্ত, তাই দেওয়ান কৃষ্ণ রাম বসু প্রথমে যখন কাঠের রথ নির্মান করে দেন তখন এই রাস্তা প্রশস্ততর করার জন্যে তিনি নিজব্যয়ে পার্শ্ববর্ত্তী জমি ক্রয় করেন।

কৃষ্ণরাম বসু হলেন কলকাতার শ্যামবাজারের সুপ্রাচীন বসু বংশের সন্তান। এই বংশের অনেকে পর পর জীর্ণ রথ পুনর্নির্মান করে দেন এবং বিশ্বম্ভর বসু নির্মিত নূতন রথ ১২৯২ সালে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র বসু কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করে বর্তমান লৌহ নির্মিত রথ প্রস্তুত করিয়ে দেন। এই বসু পরিবারের বংশধরগণই রথযাত্রার ব্যয় বহন করে আসছেন, এবং রথের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারাদির ব্যবস্থা করে থাকেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব্বে কাঠের রথের বড়বড় ৩২টা চাকা ছিল এবং রথ টানা আরম্ভ হলে সেইসব চাকা থেকে এত জোরে শব্দ উঠত যে রিষড়া থেকেও তা শোনা যেত। তখন অবশ্য কল-কারখানা বা যান্ত্রিক যান বাহনের কোন শব্দ ছিল না, আকাশে উড়ন্ত বিমানের ঘড়ঘড়ানি, রেল ইঞ্জিনের তীব্র বংশীধ্বনিও ছিল তখন অশ্রুতপূর্ব। রিষড়ার অধিবাসীরা বরাবরই এই রথযাত্রায় বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করতেন এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েলিংটন জুটমিল স্থাপিত হবার পর থেকে রথ টানা কার্যে সাহায্য করার জন্যে বেলা ৩টা-৩॥ টার সময় শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে দিতেন।

এই রথ জিনিষটা যে কি এবং কি রকম তার আকৃতি প্রকৃতি, সে সম্বন্ধে দুটি বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক মাতাল রথ দর্শন করে ভক্তিভরে গেয়ে উঠেছিল :—

"কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক মারা, চাকা ঘুব ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো কেটো ঘোড়া,
চড়োর উপর মুক-পোড়া।
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাখা,
বেহদ্দ ছেনালি।"

মা রথ! পেন্নাম হইগো।

একবার ফিরিঙ্গি স্কুলে ইংরেজী শেখা এক বঙ্গ সন্তানকে জনৈক সাহেব রথ জিনিষটা কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন—"উডেন চার্চ্চ স্যার। (কাঠের গীর্জ্জা) কিন্তু এই উত্তরে সাহেব কিছু বুঝতে না পারায় তখন তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন—"থ্রী ষ্টারিস হাই (তিন তলার সমান উঁচু) গড অল মাইটি সিট আপন (উপরে জগন্নাথ দেব বসে আছেন) লাং লাং রোপ (লম্বা লম্বা দড়ি) থৌ-জণ্ড ম্যান ক্যাচ হাজার লোকে ধরে) পুল পুল পুল (খুব জোরে টানে) রানাওয়ে রানাওয়ে (রথ এগিয়ে চলে) হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।"

মেয়েদের মধ্যে যাঁদের স্বামী বা গুরুজনদের নাম হরি বা জগন্নাথ থাকত, তারা তৎকালিন প্রথানুযায়ী বলতেন ফয় জগন্নাথ ফতে উঠেছে, ফরি ফরি বোল)

রথের মেলা

মেলা মানেই মিলন, মানুষের মিলন ; আর মানুষ মানেই পাপ ও পুণ্যের অবস্থান। তাই এই মেলায় কেউ আসেন পুণ্য সঞ্চয় করতে, আবার কেউ আসেন অসদ্ উপায়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে। এযুগে যেমন, সে যুগেও তেমনি ছিনতাই ছিল এবং পিতলের বাট দেখিয়ে সোনার হার বা হাতের রুলি খুলে দিয়ে এসেছেন এরকম ঘটনা বিংশ শতাব্দীতেও ঘটতে দেখা গেছে। যেখানে লক্ষ লোকের সমাগম সেখানে কত বিচিত্র ঘটনাই ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে ; তবে এখন থানা পুলিশ বসেছে, ধরা পড়লে একেবারে শ্রীঘরের ব্যবস্থা।

মেলাগুলো মূলতঃ ধর্ম্ম ভিত্তিক হলেও, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই মেলায় যোগদান করবার সুযোগ পায়। তার উপর কুটির শিল্পের বেচাকেনার সঙ্গে সঙ্গে চলে শিল্প কৌশল ও যন্ত্র পাতির আদান প্রদান।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কোনটারই অভাব নেই এখানে, ছেলে ভোলানো মাটির পুতুল ও খেলনারও শেষ নেই, ফুলের দোকান, ফলের দোকান, গাছের দোকান, তার উপর পাঁপর তেলে ভাজা আর গুড়ে জিলিপির দোকান অগুন্তি।

গ্রামের বৌ ঝি তখন হাটে বাজারে যেতে পারতেন না, তাঁরা এই সুযোগ বেরিয়ে পড়তেন নিজেদের পছন্দ মত, ইচ্ছামত জিনিষপত্র কেনার প্রয়োজনে, লোহার কড়া, বেড়ি, খুন্তী থেকে আরম্ভ করে আর্শি-চিরুণী-কাঁকুই-ঘুনসী-মাথার ফিতে, সবই তখন দেশী। বিলাতী জিনিষের সম্ভার তখনও প্রতিযোগিতায় দেখা দেয়নি। কাঠের জিনিষ, পাথরের বাসন পত্র কিছুরই অভাব নেই। তার উপর ধামা, কুলো ধুচুনি, টোকা আর মাদুর হরেক রকমের। তখন অবশ্য নাটক নভেল বা গল্পের বই এত বিক্রী হত না। জিনিষ

পত্রের দামও ছিল তেমনই সস্তা। দু'আনা পয়সা হলেই রথ দেখা এবং কেনাকাটা প্রায় সবই সমাধা হত।

এই মেলাকে কেন্দ্র করেই তখন দেখা দিত সার্কাসের তাঁবু, ভোজবাজীর খেলা। নাগর দোলার পাশে কাঠের ঘোড়ার চরকি। জুয়ার আড্ডাও বাদ যেত না।

খুনজুনি বাজিয়ে কেউ হয়তো ঘুরে ঘুরে সুর করে গেয়ে চলেছে জগন্নাথ দেবের সোনার বালা বন্ধক রেখে সন্দেশ খাওয়ার কাহিনী, কোথাও রাধাকৃষ্ণ বা হরপার্ব্বতীর যুগল মূর্ত্তি। তাদের সাজগোজ সবই নকল কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সব মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকত।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও এই সুযোগে তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মত্ত হয়ে উঠতেন। বিতরণ করতেন বিনা মূল্যে কত বই। কিন্তু দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কে শোনে তাঁদের কথা। কাটফাটা রদ্দুরে দাঁড়িয়ে পাদরী সাহেব পা পর্যন্ত সাদা আলখাল্লা পরে অনর্গল বলে যাচ্ছেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায়, যীশু খৃষ্টের কথা।

রিষড়া, মাহেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি গৃহস্থ বাড়ীতেই রথের কুটুম্ব এসে জমায়েত হতেন। সোজা থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত থেকে যেতেন আত্মীয়তার আকর্ষণে। আটটা দিন গঙ্গাস্নান আর মাসীর বাড়ীতে জগন্নাথ দর্শন এবং লক্ষ্মী দেবীর আঁচলে একমুঠো চাল আর পয়সা দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ে মেতে উঠতেন। কাঁঠাল, পাঁপর ও বাদাম ভাজা খেয়ে রোগেও পড়তেন কেউ কেউ, তার উপর রোগো মাছির ভেনভেনানি লেগেও থাকত। সোজা রথের পর আবার উল্টো রথের ভীড়, মাঝে তখন দ্বাদশ গোলাপের আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। কলকাতার বাবুদের নৌকা এসে ভীড় জমাত ঘাটে ঘাটে। কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁর 'হুতোম পেঁচার নকশায়' রসাল ভাষায় গেঁথে রেখেছেন তাঁদের বেহায়াপনার চিত্র।

দৈব-দুর্বিপাক

আষাঢ় মাসের রথ যাত্রার পর আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজাও কেটে গেল নির্বিঘ্নে, কিন্তু হঠাৎ আকাশে বাতাসে ঘনিয়ে এল এক ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেত। সেটা হল ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ছুটে এল এক সর্বধ্বংসী ঝটিকাবর্ত্ত। তার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি আর ভূমিকম্প। থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল মেদিনী আর তার সঙ্গে ঘর দুয়ার আর গোলপাতা আর খড়ের ছাউনি কুঁড়ে ঘরগুলো। গঙ্গার উভয়কূলে প্রায় একশো ক্রোশ পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম ও সহরগুলো প্রকৃতির সে তাণ্ডবলীলা নীরবে সশঙ্কচিত্তে প্রত্যক্ষ করল। বড় বড় গাছপালা বলতে কিছু আর মাথা উঁচু করে রইল না। কত গৃহপালিত পশুপক্ষী, জীবজন্তু মৃত্যুর কবলিত হয়েছিল তার সংখ্যা নেই। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুর্গি সব ভেসে গিয়েছিল।

গঙ্গার জল ৪০ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছিল। ২০ হাজার জাহাজ, শ্লুপ ও নৌকা নষ্ট হয়েছিল এই দৈব দুর্বিপাকে। প্রায় সারারাত ধরে চলেছিল এই তাণ্ডবলীলা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সভ্য ফ্রান্সিস রসেলের বর্ণিত ঝড়ের বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য:

"আমি কখন সেই ঝড়ের সন্ সন্ শব্দের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত আদি ভুলতে পারবনা। প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হচ্ছিল যেন সকলে বাড়ী চাপা পড়ে সমাধিস্থ হবে।

নদী স্রোতে বাঘ, গণ্ডার ও গৃহপালিত পশুপক্ষী মৃতাবস্থায় ভাসছে, ও কতক পথিমধ্যে পড়ে আছে। * * * * এই দুর্ঘটনায় কলকাতা সমেত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল।

ঝড়টি বঙ্গোপসাগর থেকে আরম্ভ করে ষাট লিগ* পর্যন্ত

* ১ লিগ = দেড় ক্রোশ। ৬০ লিগ = ১৮০ মাইল বা ৯০ ক্রোশ॥

দূরবর্ত্তী স্থানে ব্যাপৃত হয়, উহাতে অনেক ছোট জাহাজ, নৌকা দুইশত ফিট দূরবর্ত্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।"

বলা বাহুল্য যে উক্ত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় রিষড়ার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর এবং সেই ধাক্কা সামলে উঠতে সময় লেগেছিল বেশ কয়েক বছর ; কারণ মানুষের আর্থিক সঙ্গতি ছিল তখন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

রিষড়া হাটের কথা

শোনা যায়, গঙ্গাতীরবর্ত্তী রিষড়ার হাটের চালা এই ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল। তাতে শুধু রিষড়ার লোকেরই অসুবিধা হয়নি, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরাও সমানভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ, শ্রীরামপুর (তখন আকনা) বল্লভপুর, মাহেশের লোকেরাও এই রিষড়ার হাটেই তখন কেনাকাটা করতেন।

'বাষ্পীয়কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' নামক পুস্তকে (১৮৫৫ খৃঃ) কালিদাস মৈত্র মহাশয় লিখেছিলেন—"যৎকালে শ্রীরামপুর নগররূপে খ্যাত ছিলনা তৎকালে রিষড়ায় এই সমস্ত গ্রাম্য লোক বাজারহাট করিত যেহেতু ঐ গ্রাম ভিন্ন অন্য গ্রামে হাট বাজার ছিল না।"

রিষড়ার এই হাট সম্বন্ধে হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে—'বর্ত্তমান শ্যামনগর লেনে গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ হাট ছিল। সেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বর্ত্তমান সেওড়াফুলির হাট স্থাপন করিলে রিষড়ার হাট উঠিয়া যায়, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কথা। এই সময় শ্রীরামপুরেও বাজার বা হাট ছিল না—শ্রীরামপুরের লোক এইখানেই বাজার করিতে আসিত।"

(বসুমতী, আষাঢ়—১৩৪৯)

যতদূর জানা যায় এই হাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেওড়াফুলির রাজারা। এতদঞ্চল ছিল তাঁদেরই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

ইতিপূর্বে ভদ্রেশ্বরের গঞ্জই ছিল প্রসিদ্ধ। এতবড় গঞ্জ কলকাতা থেকে কালনা পর্যন্ত আর কোথাও ছিল না। এর পর বৈদ্যবাটীতে 'নিমাই তীর্থ' ঘাটকে কেন্দ্র করে হাট বসত। দক্ষিণে রিষড়া আর উত্তরে বৈদ্যবাটী এই উভয় স্থানের মধ্যে আর কোথাও হাট ছিল না।

'এখানকার পুরাতন ও সমৃদ্ধ হাটের প্রচুর আয় দৃষ্টে সেওড়াফুলির রাজবংশের প্রধান হরিশ্চন্দ্র প্রতিযোগিতা ক'রে সেওড়াফুলির বাজার স্থাপন করেন।' (পুরাতনী)

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'পূর্ব্বে বৈদ্যবাটীতে হাট ছিল। সেওড়াফুলির হাট হওয়াতে বৈদ্যবাটীর হাট ও রিষড়ার হাট দুইটিই ধ্বংস হইয়া যায়। বর্ত্তমান শ্যামনগর লেনে গঙ্গাতীরে রিষড়ার হাট ছিল।' (বসুমতী, চৈত্র – ১৩৪৩)

'সেওড়াফুলির হাট স্থাপিত হয়েছিল ১৮২৭ খৃঃ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা সেওড়াফুলির দশ আনি জমিদার রাজা রাজচন্দ্র রায়ের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায়।'—হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রিষড়ার হাট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সেওড়াফুলির হাট স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ এই হাটে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের আগমন এবং আমদানী রপ্তানি হ্রাস পায়, তবে রিষড়ার পান আর গুড় এবং সুখচরের গুড়ে চিনি সমান ভাবেই বিক্রি হতে থাকে এবং হাটের বদলে বাজারে পরিণত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ তারকেশ্বর রেলপথ খোলার পর সেওড়াফুলি জংশন ষ্টেশনে পরিণত হয়, এর ফলে পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে রিষড়ার পরিবর্তে সেওড়াফুলিতেই তাদের কৃষিজাত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে সমবেত হতে আরম্ভ করেন।

রিষড়ার এই হাটের পাশেই ছিল পার ঘাট। হাটের বিস্তৃতি ছিল গঙ্গাতীর থেকে জি, টি, রোডের ধার পর্যন্ত। কত গরুরগাড়ী বোঝাই মালপত্র যে এই হাটে জমায়েত হত তার ইয়ত্তা নেই। গরুর পিঠে ছালায় ক'রেও আসত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য।

এই হাটকে কেন্দ্র করেই আশে পাশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের স্থায়ী বসবাস স্থাপিত হয়েছিল। মোদক, বারুজীবি, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক, ধীবর প্রভৃতি বহু জাতি স্ব স্ব ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। গণিকালয়ও বাদ যায় নি। যার নিদর্শন আজও বজায় রয়েছে।

শোনা যায়, শতাধিক বর্ষ পূর্বে আগুন লেগে এই হাট পুড়ে যায়, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিভিন্ন বিপণি। তার পর থেকেই হাটের গৌরব শিখা নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী আজও দু' একজন বেঁচে আছেন এই হাটের কথা বলার জন্যে; তবে সেটা হাটের গৌরবময় ইতিহাসের কথা নয়, তার অন্তিম কালের কথা। হাটের সংলগ্ন পশ্চিম দিকটা ছিল হিজড়ের ডাঙ্গা। (বর্ত্তমানে ৺শীতলু সর্দারের সম্পত্তি।)

হাটের পাশেই ছিল প্রসিদ্ধ পাঁচালী গায়িকা দুই ভগিনী—শ্যামা ও বামা। যাদের কথা ইতি পূর্ব্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' বর্ণিত হয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে, পৃঃ ১০৫।

এই হাট সম্বন্ধে দেওয়ানজী বংশীয় ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

'পূর্বে রিষড়ার ময়রাপাড়ায় যাহাকে শ্যামনগর লেন বলে, একটি প্রকাণ্ড হাট ছিল, ওখানে চিনি ও মিছরীর আড়ৎ ছিল। গুড়ের নাগরি ভাঙ্গা খোলা স্তূপাকারে গঙ্গা বক্ষের পোস্তারূপে বিরাজমান থাকিত। আমরা তাহার শেষ ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি।

বিশেষতঃ স্নানযাত্রার অধিবাস ও মাহেশের রথের উৎসবে এই হাট প্রবল আকার ধারণ করিত কেননা সেওড়াফুলির হাট তখন খাস বৈঠবাটীতে ছিল। ঐখানেই ঘাটের নিকটে ৺ব্রহ্মাপূজা হইত। বারওয়ারী যায়গায় ভাল ২ যাত্রার দল, কবি তরজা ইত্যাদি হইত। এইখানে শ্যামা বামা কালীর ঘাটছিল। তৎকালে কলকাতা অঞ্চলেও তাহাদের সুনাম ছিল।"

শ্রীজহর লাল আশ (৯০ বৎসর) তাঁর বাল্য স্মৃতি চারণা করে বলেছেন যে এখন যেখানে লাল চাঁদ ময়রার বাড়ী ঐখান বরাবর হাট বসত। বড রাস্তার ধার পর্যন্ত (পোটোপাড়া বলত) ঐ হাটের বিস্তৃতি ছিল। গরুর গাড়ী ছালায় করে মুড়ি আসত। তিনি নিজে বাল্য বয়সে ঐ হাটে পান বিক্রী করেছেন। তখন সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ সোমবার ও শুক্রবার এই হাট বসত। হাট পুড়ে যাওয়ার পর থেকেই ৺ব্রহ্মা পূজার আরম্ভ।

শ্রীশীতলাচরণ মল্লিক বলেছেন যে তাঁর পিতামহ ৺কৈলাস চন্দ্র মল্লিকের (মোদক) আমলে এই হাটের অবস্থা প্রবল ছিল। হাট উঠে যাওয়ার পর কলকাতার মল্লিকরা যদুনাথ পোদ্দার ও সাধন দত্তের পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে ঐ হাটের জমি কিনে নেন। বাল্যবয়সে তিনি বড় বড় গুড়ের জালা তাঁদের বাড়ীর ছাদে বসান থাকতে দেখেছেন এবং প্রায় ১৫/১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত হাটের পার্শ্বস্থ পারঘাটায় সময়ে সময়ে উপবেশন করতেন।

হাট পুড়ে যাওয়ার ফলেই যে অগ্নি দেবের প্রকোপ শান্তির জন্যেই যে ৺ব্রহ্মা পুজার প্রবর্ত্তন হয় একথা সর্বজন স্বীকৃত। এখন এই ব্রহ্মা পূজা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক, যার অস্তিত্ব শতাব্দীর বহু পরিবর্ত্তণের মধ্যেও আজও বর্ত্তমান রয়েছে, যদিও তার সমারোহ এবং আনুসাঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলো অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে।

পরবর্ত্তী কালের অধিবাসীরা ব'লেন যে এখন যেখানে অনাথ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে ঐখানেই পুর্বে অস্থায়ী চালা বেঁধে ৺ব্রহ্মা পূজা হত এবং সে পূজানুষ্ঠান দোকানদারগণের প্রদত্ত চাঁদায় বারোয়ারী হিসাবে সম্পন্ন হত। প্রতি চাউলের বস্তা পিছু এক আধলা ঈশ্বর বৃত্তি হিসাবে সঞ্চয় করে রাখা হত এবং বৎসরান্তে পূজার আগে ঐ সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ করে আনা হত।

প্রায় ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে এই বারোয়ারী পূজার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কালী কুমার সাধুখাঁ (৺জহর লাল সাধুখাঁর পিতা) গোপাল হালদার, কেদার ঘোষ প্রভৃতি কর্তৃত্ব করতেন, যজ্ঞেশ্বর সাধুখাঁও পরে যোগদান করেন। এঁদের পরে যাঁরা উদ্যোগী হয়ে পূজার ভার গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হরিদাস নন্দী, কেদার নাথ ঘোষ, রামকৃষ্ণ লাহা ও কৃষ্ণচন্দ্র সাধুখাঁ প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সতীশ চন্দ্র দত্ত সুবোধ চন্দ্র দাঁ ও বটকৃষ্ণ সাধুখাঁ প্রভৃতি পূজানুষ্ঠান ও আনুসঙ্গিক উৎসবাদির ভাব গ্রহণ করেন।

বর্তমানে ৺বটকৃষ্ণ সাধুখাঁর পুত্রগণ নিজ তত্ত্বাবধানে পূজার ব্যবস্থা করে আসছেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ক'রে রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর থেকে বারোয়ারী প্রথা অর্থাৎ দোকানদারগণের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা এখন আর নেই। যাত্রা, কবি, তর্জ্জা প্রভৃতিও বন্ধ হয়ে গেছে। ১৩৪৭/৪৮ সালেও বিখ্যাত যাত্রার দল—সত্যম্বর অপেরা পার্টি, শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দল প্রভৃতি এই পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে যাত্রাভিনয় ক'রে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এছাড়া কুঞ্জ কামলে, তিনকড়ি ব্রাহ্মণের কবি ও তরজা অনুষ্ঠিত হত। পাঁচালী গায়ক গায়িকারাও আসত। ভেড়ী নিস্তারিনীর নাতনি পাঁচালী গাইত।

তিনদিন ব্যাপী চলত এই পূজানুষ্ঠান এবং আনুসঙ্গিক ছোটখাট মেলা ও লোকরঞ্জন ব্যবস্থাও চলত তার সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাই ব্রহ্মপূজার প্রশস্ত তিথি কিন্তু রিষড়ার ব্রহ্মা পূজা

পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে ২রা মাঘ পর্যন্ত ৩ দিন ধরে সম্পন্ন হয়ে আসছে এবং একক ব্রহ্মার পরিবর্তে (শিব কর্তৃক ব্রহ্মপূজা অভিশপ্ত বলেই বোধ হয়) দক্ষিণে বৃষারূঢ় সয়ম্ভু শিব এবং বামে গরুড় বাহন বিষ্ণু এই ত্রিমূর্তির পূজা হয়ে থাকে।

পূর্বে এই পূজার প্রসাদ চাঁদাদানকারী দোকানদারদিগের মধ্যে বিতরণ করা হত। কথিত আছে, ব্রহ্মাপূজার সংকল্প পূর্বে সেওড়াফুলির রাজাদের নামে করা হত সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ; এবং শ্রীরামপুরের দে বাবুদের পুরোহিত হিসাবে হড়বংশীয়গণই উক্ত পূজা সম্পন্ন করে আসছেন। কেউ কেউ আবার নেহারি মোদকের নামও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করে থাকেন।

সম্ভবতঃ পৌষ সংক্রান্তির দিনই হাট পুড়ে যায় এবং সেই দিনটি স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই উক্ত বিশেষ নিয়ম প্রচলিত হয়। এই দিনটি আবার উত্তরায়ণ বা মকর সংক্রান্তি হিসাবে বিশেষ পুণ্য দিবস এবং এই দিনে রিষড়া, মোড়পুকুর, বামুনআড়ি, কোমরডিঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চলের বহু নরনারী প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান ক'রে এই সুবৃহৎ হংসবাহন, চতুর্ভূজ, রক্তবর্ণ ব্রহ্মা এবং পার্শ্ববর্ত্তী মূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করে যেতেন এবং এখনও কিছু কিছু লোক ক'রে থাকেন। স্থানীয় লোকেদের কেনাকাটার সুযোগ এসে যায় মেলার মাধ্যমে। এই মেলায় মাটির বাসন, খেলনা, মিষ্টান্ন, লোহার তৈজসপত্র সবই কিছু কিছু বিক্রী হয়ে থাকে। বাদাম ভাজা, পাঁপর ভাজা আর গুড়ে জিলাপীও অপর্যাপ্ত ভাবে বিক্রী হত। মোট কথা, এই পূজানুষ্ঠান ও উৎসবাদির সঙ্গে সদসদ্ বহু পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত।

অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর বর্ত্তমান স্থানটি নির্বাচিত হয় পূজা উপলক্ষে কিন্তু উত্তরপাড়ার জমিদার ও রিষড়ার ৺কৈলাসচন্দ্র লাহা বংশীয়েরা আপত্তি করায় এই ভূখণ্ডটা ব্রহ্মাপূজার বারোয়ারী কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ক্রয় করে নেন, (ব্রহ্মা ঠাকুর স্থান) দাগ নম্বর ৬৯১২, খতিয়ান নম্বর ১৯২৯। ৺যজ্ঞেশ্বর সাধুখাঁর পুত্র ৺জীবন কৃষ্ণ

সাধুখাঁ ও তদীয় ভ্রাতাগণ ১৩৩৪ সালে একটি পাকা ঘর নির্মাণ ক'রে দেন স্থায়ীভাবে পূজানুষ্ঠানের সুবিধাকল্পে। হাটের অস্তিত্ব বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হলেও এই ব্রহ্মা পূজা তার স্মৃতি আজও অক্ষুন্ন রেখেছে।

শতবর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বারোয়ারী পূজা ছাড়াও দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের মোড়ে মল্লিকদের বাড়ীর সম্মুখে জি, টি. রোডের ধারে ৺অন্নপূর্ণা পূজা, বারোয়ারী প্রথায় অনুষ্ঠিত হত এবং তদুপলক্ষে যাত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি লোকরঞ্জন ব্যবস্থাও ছিল। শ্যামসুন্দর মল্লিক ও ভূতনাথ ভুঁইয়া উক্ত বারোয়ারী পূজার তত্ত্বাবধান করতেন। একে বলা হত জেলে বারোয়ারী। এর পূর্বে বারোয়ারী প্রথায় অন্য কোনও পূজানুষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত শ্যামসুন্দর মল্লিক ১০৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন এবং তৎপুত্র নবীন মল্লিক ৯৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। এঁরা রিষড়ার দীর্ঘায়ু ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলা চলে।

পাঁচালী গায়িকা শ্যামা-বামা ভগিনী।

রিষড়ার হাট ও পারঘাটার সঙ্গে যে দুজন বিখ্যাত পাঁচালী গায়িকাদের নাম জড়িয়ে আছে তারা হ'ল দুই ভগিনী শ্যামা ও বামা।

তখনকার দিনে লোকে এই পাঁচালী খুব পছন্দ করত। কবি গানের মত এতেও দু'দল থাকত, তবে উত্তর প্রত্যুত্তর হত না। মূল গায়ক সুর ও তান সহকারে পদ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণন করত ও মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাব সূচক এক একটা গান করত।

এই পাঁচালী সময়ে সময়ে এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতাদুষ্ট হত, এবং এতে এত অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপমার ছড়াছড়ি থাকত যে আজকের দিনে তা অচল হলেও সে যুগে লোকে এই পাঁচালী গান

শোনবার জন্যে পাগল হত। পাঁচালী রচয়িতা হিসাবে দাশু রায়ের খ্যাতি ছিল সে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ।

উপরোক্ত শ্যামা-বামা ভগিনীদ্বয় সম্বন্ধে 'রঙ্গালয় পত্রিকায়' যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :—

"অভিজ্ঞ পাঠক, হীরা বুলবুলের নাম শুনিয়াছেন, শ্রীরামপুরের কাছে গিয়া রিষড়ার শ্যামা-বামাকে দেখিয়াছেন কি? বাইজী সমাজে যেমন হীরা-বুলবুল, পাঁচালী দলে সেইরূপ শ্যামা-বামা। হীরা-বুলবুল দুই ভগিনী, শ্যামা-বামাও দুই সহোদরা। জীবনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু যশের মৃত্যু নাই। হীরা-বুলবুলের নাম এখন বিশ্ববিশ্রুত। শ্যামা বামা এখনও সর্বত্র যশ সৌরভের বিস্তার করিতেছেন। যেমন জগন্নাথের জন্য মাহেশ বল্লভপুর বিখ্যাত সেইরূপ শ্যামা-বামার জন্যও রিষড়া প্রসিদ্ধ।

মাহেশ, বল্লভপুর এবং রিষড়াই শ্রীরামপুর মহাকুমার অলঙ্কার। দিনেমারদিগের প্রতাপ উড়িয়া গিয়াছে, নামও শীঘ্র লুপ্ত হইবে; কিন্তু শ্যামা-বামার নাম লোকে কোন কালে ভুলিবে না। রিষড়ার কীর্তিধ্বজা চিরদিন উড়িবে।"—রঙ্গালয়, ২১শে আষাঢ়, ১৩০৮

এই প্রসঙ্গে রামকুমার নটবরের নামও উল্লেখযোগ্য :—

"কবির সঙ্গত চলে মুচির ঢোলে, সানাই তাহার সহচর।...ঢোল চিরদিনই পেশাদায় মুচি হাড়ির গলে শোভা পাইতেছে। রামকুমার নটবর প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকেই ঢোলে দিগ্বিজয় করিয়া গিয়াছে। তখনকার কবির গান যাহারা শুনিয়াছেন, রাজকুমার নটবর নীচ জাতির ঢোল শুনিয়া তাঁহারাই মজিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামপুর-রিষড়ার নটবর পিতার সুপুত্র ছিলেম। ঢোলে তিনি পিতাকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।" তাঁর পিতার নাম ছিল নিতাই নটবর। —রঙ্গালয়, —২২শে কার্ত্তিক, ১৩০৮।

পান-চাষের কথা

রিষড়ার হাটের কথা প্রসঙ্গে গুড় ও পানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সে যুগে পানের জন্যে রিষড়ার একটা সুনাম ছিল, তাই রিষড়ার কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামপুর নিবাসী কালীদাস মৈত্র মহাশয় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' তে প্রথমেই লিখেছেন- "এই স্থান উত্তম পান চাষের নিমিত্তে খ্যাত।" প্রকৃত পক্ষে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ দশক পর্যন্ত রিষড়ার অসংখ্য বরজে নামী ও দামী পানের চাষ হত এবং ঐ পান কলকাতা সমেত পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন হাটে বাজারে চালান যেত। কলকাতার পাথুরে ঘাটার নিকটবর্ত্তী পান পোস্তায় সপ্তাহে দুদিন নৌকা যোগে রপ্তানী হত পানের মোট। পান ছিল এখানকার বারুজীবীদের একটা লাভ জনক এক চেটিয়া ব্যবসা। (পৃ: ৫৭ দ্রষ্টব্য)

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে পানের ব্যবহার ছিল সার্ব্বজনীন। 'সর্বঘটে যেমন কলার' ব্যবহার, পুজাপার্বন, লোক-লৌকিকতা, তত্ত্ব-তাবাসে পানের প্রয়োজনীয়তাও ছিল অপরিহার্য।

পান যে শুধু বিলাসের বস্তু ছিল তাই নয়. কোন কোন কবিরাজী ঔষধে পানের রস অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত হত। পান খাইয়ে গুণতুক করার কথাও সে যুগে নিতান্ত বিরল ছিল না।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বর্ত্তমানে অনেকেই পান খাওয়া ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু সে যুগে লোকেরা পেটে ভাত না জুটলেও পান খেয়ে 'ঠোঁটটা রাঙ্গিয়ে' রাখতেন। এমনকি সাহেবরা ও সে যুগে এই পানের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। উনবিংশ শতব্দীতে পান-দোক্তা ছিল স্ত্রীলোকদের নিত্য সহচর। পুরুষদের পক্ষে যেমন ছিল-হুঁকা কলকে, তামাক টিকে তেমনি মহিলারাও কোথাও যাবার সময় পান-দোক্তার কৌটাটা নিতে ভুলতেন না।

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ জননী চন্দ্রমনি দেবীও কোন কিছুর অভাব অনুভব না করলেও মথুর বাবুর পীড়াপীড়িতে কিছু একটা না চেয়ে থাকতে পারেন নি। বলেছিলেন—"যদি নেহাৎ দেবেই তবে আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দিও।"

— (পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রথম খণ্ড)

এই পান নিয়ে সে যুগে কত উপমা বহুল ছড়া ও গানের সৃষ্টি হয়েছিল তা বলা যায় না। তার দু'একটা নমুনা হলঃ—

(১) 'ভালবাসার এমনি গুণ—পানের সঙ্গে যেমনি চুণ। বেশী হলে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল,' (২) 'ছাগলের মুখে পড়ল পান, পান বলে মোর গেল জান।' (৩) 'হাত শুদ্ধি দানে মুখ শুদ্ধি পানে।' ইত্যাদি

প্রসিদ্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রা রচিত পানের গুণাগুণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গানটি তখন খুবই সমাদৃত হতঃ—

"পান কে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধুভাষা।
বুরুজে বিরাজ করে চাষার বড় আশা॥
বুড়োবুড়ি মাগি মিন্সে যুবক যুবতী।
পান খেলে সবাকার বাড়ায় পিরীতি॥
মোষের মত মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা খানা ভাল॥
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসি মড়া যার পানের কড়ি নাই॥"

বর্ত্তমানে যেমন 'চা-বিস্কুট বা চা-সিগারেট' দিয়ে অথিতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে; সে যুগে তেমনই লোকে পান-তামাক খাইয়ে সচরাচর অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করতেন।

পর্ণ-বণিকরা খুব শুদ্ধাচারে পানের বরজে প্রবেশ করতেন, কারণ অশুচি বা অশুদ্ধ অবস্থায় পান গাছ (লতিকা) স্পর্শ বা চাষ

করলে পানের ফলন কমে যায় বা পান শুকিয়ে যায় বলে লোকের ধারণা ছিল। পর্ণবণিকদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন বিশেষ সুকণ্ঠের অধিকারী। নির্জন পথে পথিককে সচকিত ক'রে কখন কখন ভেসে আসত বরজের মধ্য থেকে বিভিন্ন সুরের রাগিনী।

অন্যান্য শিল্পী সম্প্রদায় যেমন তাঁদের শিল্পকর্মের বা উপজীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজা ক'রে থাকেন, বারুজীবীরাও তেমনি ঘটা করে বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ মাসে 'শমীচণ্ডীর' পূজা করতেন। সময়ে সময়ে সাড়ম্বরে প্রতিমা নির্মান করেও পূজানুষ্ঠান চলত, এবং ৺রামকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে উপরোক্ত শমী পূজা উপলক্ষে বারোয়ারীর মাধ্যমে যাত্রা, তর্জ্জা, কথকতা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হত।

কল কারখানা নির্ম্মানের প্রয়োজনে রিষড়ার বরোজ জমি প্রায় অধিকাংশই বিক্রি হয়ে গেছে যার ফলে রপ্তানি বানিজ্যও হ্রাস পেয়েছে, এবং পান চাষের সুখ্যাতিও আজ বিলুপ্ত প্রায়।

তখনকার দিনে পান-সাজার জন্যে ব্যবহৃত হত কত রকমের তৈজস পত্র, যার তালিকা আজ বিবাহের যৌতুক দ্রব্য তালিকায় আংশিকভাবে স্থান পেলেও কার্যত: তাদের ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ।

আমের কথা

পান ছাড়াও রিষড়া থেকে আরও একটি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে খড়দহ, কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নৌকাযোগে রপ্তানী হত সেটি হল—বামুনআড়ি, জগন্নাথপুরের পিয়ারাফুলি আম। এই আম ছিল এখানকার নিজস্ব সম্পদ। আকারে ছোট হলেও স্বাদে গন্ধে ছিল অতুলনীয়।

বিশেষ আকারে তৈরী ঝুড়িতে শেওড়াপাতার আচ্ছাদন দেওয়া আমের মোটগুলো তখন পূর্বোক্ত পারঘাট ও দাঁয়েদের ঘাট থেকে চালান যেত। এটা ছিল তখন বেশ লাভজনক ব্যবসায়। পিয়ারাফুলি আম ছাড়াও রিষড়ায় তখন আরও কয়েকটা নামজাদা আম উৎপন্ন হ'ত—মন সন্তোষ, সোঁদরসা, রিষড়া খাস-প্রভৃতি। এই সমস্ত সুমিষ্ট আম ছাড়াও অম্লমধুর রস যুক্ত আমের ফলনও ছিল প্রচুর।

বর্গীর হাঙ্গামা।

১৭৩৭ সালের আশ্বিনে ঝড়ের বিভীষিকার স্মৃতি মানুষের মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই সহসা এক নূতন বিপত্তি এসে দেখা দেয় পশ্চিম বাংলায়।

অসংখ্য মারহাট্টা দস্যু উত্তাল তরঙ্গ মালার মত বাংলার বুকে হুড়মুড় ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের তুমুল আক্রমণধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। মনে হয় মারাঠা ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বর্গীরা ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে নাগপুরের পাহাড় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পঞ্চ কোট হয়ে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জঙ্গলের পথ বেয়ে এসে পড়ে বাংলার মধ্যে। তাদের হাতে পিঠে হালকা হাতিয়ার, মুখে শুধু এক বুলি—'রূপি লেয়াও, রূপি লেয়াও।'

প্রথমে মেদেনীপুর পরে বর্দ্ধমান। চলতে থাকে অবাধ লুণ্ঠণ, গৃহদাহ ও ধ্বংস কার্য। মীর হবিবের পরামর্শ অনুযায়ী বর্গীরা দক্ষিণ দিকে হুগলী পর্যন্ত তাদের লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে। চারিদিকে শুধু হাহাকার ধ্বনি। লোকে ঘর দুয়ার ত্যাগ করে স্ত্রী পুত্র নিয়ে গঙ্গায় পশ্চিম কূল ত্যাগ করে দলে দলে পূর্ব উপকূলে, কেউবা কলকাতায় আশ্রয়

নিতে লাগল। অচিরে হুগলী মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হয়ে গেল।

"During the invasion of Mahrattas, crowds of the inhabitants of the country on the western side of the river crossed over to Calcutta, and implored the protection of the English, who in consequence of the general alarm, obtained permission from Aly Verdy Khan to dig an entrenchment round their territory··· ···

During the rains, Baskar Pandit, by means of Meer Hubbeab, possessed himself of Hooghly, Injilee. and all the districts of Burdwan and Midnapore as far as Balashore."...

The History of Bengal—Charles Stewart.

উপরোক্ত অবস্থার মধ্যে রিষড়ার অধিবাসীরা যে কতখানি বিপন্ন ও নিরুপায় হয়ে পড়েছিলেন সে কথা. সহজেই অনুমেয়। আশে পাশের গ্রাম থেকে লোকে বাস্তু ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে রিষড়ার মানুষ স্থির থাকতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়, তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, একথা বোধহয় কষ্ট-কল্পনা নয়, বাস্তবানুগ মানব চরিত্র চিত্রণ। লোক মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার ইংরেজদের পরোপকারিতা এবং অন্যান্য সদ্ব্যবহারের কথা—

"Stories about the security and protection of life and property offered by the English at Calcutta were on all men's lips. The fair dealings of the English traders with Hindu merchants and the latters' faithfulness to the Company became the talk of the day."—Hedges Diary-III.

বর্গীদের অত্যাচার উৎপীড়নের কদর্যতা ও বীভৎসতা সম্বন্ধে গঙ্গা নারায়ণ ভট্টাচার্য (১৭৫১ খৃঃ) রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' সবিশেষ লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু হয়েও বর্গীগণ হিন্দুর উপর যে

অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল তা ইতিহাসে বিরল।

'Cutting of ears noses and hands of any of the inhabitants, sometimes carrying their barbarity so far as cutting off the breasts of women etc,etc.' Interesting Historical Events.

নবাব আলিবর্দী খাঁ বাহুবলে বর্গীদিগকে দমন করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করে ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির ছলে মানকর শিবিরে আমন্ত্রণ করেন এবং সেই খানেই নবাব সৈন্য শার্দ্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাস্করকে নিহত করে। এর ফল হয়েছিল অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময়।

ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে রঘুজি ভোঁসলে পর বৎসর ৪০ হাজার বর্গী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার ফলে তাদের হৃদয়ে যে ক্রোধবহ্নি প্রজ্জলিত হয়েছিল, মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্দ্ধমানের নিরীহ প্রজাগণ সেই জ্বলন্ত অগ্নিমুখে আহুতিস্বরূপ অর্পিত হতে থাকে।

এইভাবে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খৃ: পর্যন্ত ১০ বছর ধরে চলতে থাকে বর্গীদের অত্যাচার, উৎপীড়ন। কত করুণ কাহিনী, কত সামাজিক গ্লানি, কত ক্ষোভ, হাহাকার ও অন্নাভাব পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল এই কয় বছরে তার ইয়ত্তা নেই।

মাঠে ধান নেই, ঘরে চাল নেই, ভিটের সন্ধ্যে পড়ে না! শস্য ক্ষেত্র কণ্টকবনে পরিণত। লুঠপাটের ভয়ে সাহস করে কেউচাষ করেনা। তাঁতির অভাবে পরবার কাপড় পর্যন্ত জুটতনা।

যুদ্ধ ক্লান্ত বৃদ্ধ নবাব শেষ পর্যন্ত সন্ধি করতে বাধ্য হন।

বর্গীর হাঙ্গামায় প্রত্যক্ষ ভাবে রিষড়ার অধিবাসীরা কতখানি অত্যাচারিত বা উৎপীড়িত হয়েছিল তার বিবরণ কোথাও লেখা জোকা না থাকলেও শ্রীরামপুরের কাছে চাতরার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির যখন লুণ্ঠিত হয়েছিল, খাস শ্রীরামপুরে যখন তাদের অস্থায়ী ছাউনি পড়েছিল, যার স্মৃতি আজও বর্গী বাগান ও বর্গীপুকুরের অস্তিত্বের

মধ্যে জাজ্বল্যমান, তখন একথা বুঝতে বাকী থাকেনা যে রিষড়াও তাদের আক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায় নি।

কলঙ্কময় সেই ঐতিহাসিক কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে ঘুরপাক খেয়েছে প্রতি ঘরে ঘরে ছেলে ভোলানো ছড়ার মাধ্যমে :—

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়লো, বর্গী এল দেশে!
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরুল, পানফুরুল, খাজনার উপায় কি,
আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি॥"

প্রায় শতাব্দী ব্যাপী বর্গী আক্রমণের আতঙ্কে এতদঞ্চলবাসী কিভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত তার বাস্তব চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কোন্নগর নিবাসী ৺শিবচন্দ্র দেবের জীবনীর মধ্যে :—

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮২৪ খৃ: শিবচন্দ্র দেবের কলকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হবার কয়েকদিন পূর্বে

"একদিন তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন, এমন সময়ে গ্রামের চারিদিকে এক জনরব উঠিল যে, গ্রামে 'বর্গী' আসিতেছে। গ্রামের লোকেরা আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া সপরিবারে দেবদের বাড়ীতে আশ্রয়ার্থ সমাগত হইতে লাগিল। ক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এগৃহে আশ্রয় লইয়াও, গ্রামবাসীগণ বায়ুতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় অনুক্ষণ কম্পিত হইতেছে। উৎকণ্ঠার আবেগে অনেক স্ত্রীপুরুষ অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। বালক শিবচন্দ্র সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন— 'তোমরা মিথ্যা ভয়ে জড়সড় হইয়া গোল করিও না। বর্গী আসা অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।'

আসল ব্যাপার এই যে গ্রামপ্রান্তে-পথে একব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে প্রহার করিতে ছিল। প্রহৃত ব্যক্তি কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—'মেরে ফেলে গো; রক্ষা কর গো'। এই ক্রন্দন, এই চীৎকার, এই মৃত্যু মুখে

পতিত হওয়ার সম্ভাবনা ও তাহা হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা হইতে বর্গী আসার জনরব উঠিয়াছিল।''

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দশবৎসর ধরে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণের ফলে হৃতসর্বস্ব গ্রামবাসীদের মনে সুখ, শান্তি বলতে কিছু ছিল না। কেউ বা হারিয়েছেন স্ত্রী-পুত্র, কেউ বা স্বামী-পুত্র. তার উপর দারুণ অন্ন বস্ত্রের অভাব। বর্ষার কয়েকমাস বর্গীদের আসার আশঙ্কা ছিল না, তাই সেই সময়টা যে যা পারত ভয়ে ভয়ে কিছু শস্য রোপণ করত। তাঁতিরাও কয়েকখানা কাপড় বুনে নিত, যার ফলে দ্রব্যমূল্য ও পারিশ্রমিক সবই অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল।

মাটির মধ্যে পোতা টাকাকড়ি কেউ উদ্ধার করতে পেরেছিল, কেউবা নিশানা অভাবে তা উদ্ধার করতে না পেরে একেবারে কপর্দক-হীন হয়ে পড়েছিল।

সেই দুর্দিনে ইংরেজরা যে তাদের কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিল, সে কথা কেউ ভুলতে পারেনি। তাদের শক্তি সামর্থের উপর লোকের একটা অগাধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল।

বুদ্ধিমান ইংরেজ বণিকগণ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝে তলে তলে রাজ্য-লাভের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

এই পটভূমিকার মধ্যে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন সমাজপতি। তাঁর নবরত্ন সভা তখন সমুজ্জ্বল। একদিকে রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র তাঁর সভা কবি। অপর দিকে হাস্যরসার্ণব গোপাল ভাঁড় তাঁর সভার অপর একটি রত্ন বিশেষ। তখন এই দুজনের নাম ঘরে ঘরে। ভারত চন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' আর গোপাল-ভাঁড়ের রসিকতাভরা গল্প কাহিনী তখন রাজসভা থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ লোককে মাতিয়ে তুলেছিল। বহু দুঃখ কষ্ট আর লাঞ্ছনা সহ্য করার পর দেশবাসী ঐ সব নিয়ে তখন একটু স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলবার সুযোগ পেয়েছিল। একটু হাসি ঠাট্টা করবার অবসর পেয়েছিল।

শ্রীরামপুরে দিনেমার আগমন।

১৭৫৫ খৃঃ শ্রীরামপুরে দিনেমারদের কুঠি স্থাপনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ ১১৫, এবং দ্বাদশ মন্দিরের উত্তরে একচিলের ব্যবধানে (A Stone's-throw to the north of series of twelve temples) যে তাদের ডক বা পোতাশ্রয় ছিল সেকথাও উল্লিখিত হয়েছে, পৃঃ ১২৬।

আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য চালাবার জন্যে ডেনিস কোম্পানীর নিজস্ব জাহাজ ছিল এবং বৎসরে ২০/২২ খানা জাহাজ শ্রীরামপুর থেকে ডেনমার্ক পর্যন্ত যাতায়াত করত।

দিনেমার দিগের এই সমস্ত জাহাজ অনেক সময় রিষড়ার ঘাটে নঙ্গর করতে বাধ্য হত, তার কারণ বল্লভপুরে যখন চড়া পড়ত তখন এইসব জাহাজ আর অগ্রসর হতে পারত না, জোয়ার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত। জরুরি প্রয়োজনে লোক লস্কর মারফৎ রিষড়ার ঘাট থেকে শ্রীরামপুরে সংবাদ ও মালপত্র পাঠাতে হত।

বর্ত্তমান বিশুসেনের ঘাটের কাছেই যে এই সব জাহাজ লাগত, সে রকম অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্রীরামপুর পৌরসভার আমলে ১৮৭৩/৭৪ পর্যন্ত দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের নাম ছিল 'ডিমার ঘাট লেন'। কেউ কেউ বলেন যে ঐখানে নাকি ভীমে ডাকাতের ঘাঁটি ছিল তাই ঐ জায়গাটাকে 'ভীমের ঘাঁটি' বলত। কিন্তু একজন ডাকাতের আড্ডা থেকে একটা রাস্তার নামকরণ করা কতখানি যুক্তি-যুক্ত তা সুধী পাঠক বৃন্দই বিচার করে দেখবেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় রিষড়ার বিবরণে লিখেছেন—"বিশ্বম্ভর রিষড়ায় একটি ঘাট নির্মাণ করিয়াছিলেন। ... এই ঘাটের নিকটেই গঙ্গার একটি বাঁক ছিল। দিনেমারদিগের জাহাজ ঝড়ের সময় ঐখানে আশ্রয় লইত। কিন্তু এখানে ডক (dock) ছিলনা উহা কোন্নগরে ছিল।"

'কলকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবেই প্রনিধান যোগ্য :—

"Just above this spot, along the village of Rishra, the bank describes a curve, and the anchorage is shuttered from storms. It was here that the Danish Vessels sometimes anchored instead of coming up to Serampore, and there is some reasons to believe, that the dock which we have alluded to had some reference to this anchorage, though no mention of it appears in the records of Serampore."

(Notes on the Right Bank of the Hooghly.)

Calcutta Review—1845, Vol.—IV.

দিনেমারদের আইন কানুন ছিল আলাদা এবং রিষড়ার সঙ্গে তঁাদের শাসন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিলনা কিন্তু তঁাদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা, যঁারা এতদিন তঁাদের উৎপন্ন দ্রব্য হাটে বাজারে বা দেশীয় মহাজন বা দালালদের কাছে জলের দরে বিক্রী করতে বাধ্য হতেন, তঁাদের শিল্পদ্রব্যের কদর বেড়ে যায় এবং সেই সমস্ত দ্রব্য দিনেমার জাহাজে ক'রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ডেনমার্কে রপ্তানী হতে থাকে। এর ফলে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একটা প্রাণ চাঞ্চল্যের ঢেউ এসে লাগে, জাগিয়ে তোলে একটা নূতন দিনের আশা।

১৭৬০ সালে মিরকাশিম যখন মীরজাফরের পরিবর্তে বাংলার মসনদে, সেই সময় হঠাৎ বর্গীরা এসে আবার হুগলী আক্রমণ ও

লুণ্ঠন করে; সেনাপতি শ্রীভট্ট ছিলেন-সেই বর্গী দলের নেতা। এই সংবাদে স্থানীয় অধিবাসীরা থরহরি কম্পমান। দিনেমার কোম্পানীও ভীত হয়ে ইংরেজ কাউন্সিলের কাছে আত্মরক্ষার জন্যে সাহায্য চেয়ে পাঠান।

সৌভাগ্যক্রমে বর্গীরা বেশীদূর অগ্রসর হয়নি, তাই সে যাত্রা রিষড়ার অধিবাসীরা তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন। দিনেমাররা শ্রীরামপুরে ছিলেন কিঞ্চিদধিক নব্বুই বছর; বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে।

শ্রীরামপুরের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে দিনেমারদের অবদান যাই হোক না কেন, বিদেশী বণিকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্বল হয়েও যে 'শ্রীরামপুর মিশনকে' তাঁরা আশ্রয় দিয়ে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি কল্পে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন তার জন্যেই তাঁদের স্মৃতি অম্লান থাকার পক্ষে যথেষ্ট।

কোতলপুরের দাঁ বংশ

আলিবর্দ্দী খাঁর সঙ্গে সন্ধি হবার পর বর্গীরা যদিও এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল কিন্তু কিছু সংখ্যক মারাঠা সৈন্য তখনও আরামবাগ অঞ্চলে দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যস্থিত ভূখণ্ডে থেকে গিয়েছিল। তারা সুযোগ পেলেই স্থানীয় অধিবাসীদের ধন সম্পত্তি লুট তরাজ এবং অত্যাচার করত। যার ফলে ওখানকার লোকেরা কিছু কিছু স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

যতদূর জানা যায়, এই সময়ের কিছু পূর্বেই কোতলপুর থেকে রিষড়ার দাঁবংশীযেরা এখানে চলে এসেছিলেন ।

এই কোতলপুর থেকেই এসেছিলেন শ্রী.পাঁচকড়ি রায়, যিনি শ্রীরামপুর দিনেমার কুঠির গোমস্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। (শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস)

রিষড়ার গড়গড়ী পরিবারও ঐ সময় বা তার কিছু পরে এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁরা অবশ্য এসেছিলেন গোবরডাঙ্গার কাছাকাছি স্থান থেকে।

উপরোক্ত উভয় পরিবারের অবদান সম্বন্ধে যথা স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

পলাশীর যুদ্ধ ও নবাবী আমলের অবসান।

১৭৫৬ খৃঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা অবরোধ ও জয় করার পাল্টা অভিযান হিসাবে ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন ক্লাইভ পলাশী প্রান্তরে রণ সম্ভার নিয়ে নবাব সৈন্যকে পরাস্ত করেছিলেন একথা ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন এবং একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে নবাবের পরাজয়ের মূলে ছিল ইংরেজদের কূটনৈতিক চক্রান্ত, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, উমিচাঁদের ষড়যন্ত্র এবং দেশীয় সামন্তবর্গের ইংরেজ প্রীতি ও তাদের আনুগত্য।

নাটকীয় পট পরিবর্ত্তনের মতই পলাশী প্রান্তরের পট পরিবর্ত্তন ছিল যেন পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনার সমাবেশ। পরাজিত নবাব হলেন নিহত। তারপর সেই চোখের জলের গান—

'কী হলরে জান, পলাশী ময়দানে ওড়ে কোম্পানী নিশান।'

তৎকালে যদিও উপরোক্ত ঘটনাবলী বড় বড় শিরোনামায় সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হয়নি, তথাপি রাক্ষসী পলাশী প্রান্তরে নবাবের পরাজয় কাহিনী রিষড়ার অধিবাসীদের অজানা ছিলনা, তার কারণ ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে অভিবাদন করে সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষ লুণ্ঠন করে যা পাওয়া গিয়েছিল তা সবই নৌকা বোঝাই করে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন বিজয়ীর বেশে। মালের নৌকা তদারকি করবার জন্যে বাদশাহী সড়কের (বর্ত্তমান জি, টি, রোড) উপর দিয়ে বিলিতি

ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মার্চ করতে করতে ইংরেজ অফিসারদের তাঁবে একরাস এদেশী সিপাই শাস্ত্রী, চুঁচুড়া, চন্দননগরের ভিতর দিয়ে কলকাতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। এতদঞ্চলের অধিবাসীরা অবাক বিস্ময়ে সে দৃশ্য লক্ষ্য ক'রে ঘটনার সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিল বলে মনে হয়।

বাংলার আকাশে নবাবী আমলের সূর্য অস্ত গেল। দেখা গেল এক নূতন নবাবী আমল। ইংরেজদের নবাবী আমল। এই খানেই দেখা গেল মধ্যযুগের অবসান এবং একটা নূতন যুগের অভ্যুদয়।

——

প্রমাণ পঞ্জী

১। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (৩য় খণ্ড)—নগেন্দ্র নাথ বসু।

২। বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী (শ্রীমোহন লাল দের সৌজন্যে)

৩। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ (৩য় খণ্ড)—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র।

৪। হুগলী জেলার ইতিহাস (সেওড়াফুলি)—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। উত্তরপাড়া বিবরণী—শ্রীঅবনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। (প্রকাশক—শ্রীললিত মোহন মুখোপাধ্যায়।)

৬। মাহেশ মঙ্গল—ব্রহ্মানন্দ শর্মা। (সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।)

৭। জাতক মঞ্জরী—ঈশান চন্দ্র ঘোষ।

৮। পশ্চিম বঙ্গ পত্রিকা—২য় বর্ষ, ৪৪ শ সংখ্যা। ২৮। ৬। ৬৮

৯। অপর্ণা বসুর পত্র (শ্যামবাজার—'যুগান্তর' ২২। ৭। ৭২ শনিবার। বসু পরিবারের পক্ষে)

১০। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ।

১১। কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ।

১২। গঙ্গাসাগব—শম্ভু মহারাজ।

১৩। শ্রীশ্রীমার একটি কাহিনী—বসুমতী, কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

১৪। হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

১৫। Cateutta past & present—Dr. P. C. Bagchi, M. A.

১৬। ব্রহ্মা পূজার পূর্ব্বকথা (পাণ্ডুলিপি)—শ্রীশিবদাস মান্না।

১৭। স্মৃতি চারণা—শ্রীজহরলাল আশ

১৮। কবিয়াল কৈলাস বারুই—শ্রীমনীন্দ্র নাথ আশ।

১৯। বীরভূম বিবরণ—মহিমা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

২০। শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস—বসন্ত কুমার বসু।

২১। বিদেশীদের চোখে বাংলা—চণ্ডী লাহিড়ী।

২২। পলাশীর পর বাকসার—তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়।

—oXo—

জি, টি, রোডের অবস্থা।

প্রসঙ্গত: বাদশাহী সড়ক বা জি, টি, রোডের উল্লেখ করা হয়েছে। তখন এই রাস্তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। শেরসার আমলে নির্মিত হবার পর থেকে এর আর উন্নতির কোনও চেষ্টা হয় নি।

ঠগ্ আর ডাকাতের ভয়ে এই রাস্তা দিয়ে বড় একটা কেউ দূরপথে যাতায়াত করত না। অধিকাংশ লোকই জলপথে নৌকাযোগে গমনাগমন ও তীর্থযাত্রা করত।

নদীর ভাঙ্গনে স্থানে স্থানে এই রাজপথ ভাগীরথীর গর্ভে আংশিকভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। যদিও ১৭৭৯ খৃঃ রেনেলের মানচিত্রে (Plate No VII) এই পথের অবস্থান প্রথম দেখান হয় কিন্তু এর প্রথম সংস্কার কার্য আরম্ভ হয় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে। *

রিষড়ার কাছে জি, টি, রোডের অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপদ-সঙ্কুল। রাস্তার দু'পাশে কেবল বাগান আর বড় বড় গাছ। অর্দ্ধালোকিত সেই পথে কদাচিৎ দিনের বেলা দু'একখানা গরুর গাড়ী এবং কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোক এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার অধিবাসীরা রিষড়ার হাটে বাজারে যাতায়াত করতেন, আর যেতেন হড়বংশীয়েরা শ্রীরামপুরে দে বাবুদের বাড়ী যাজনিক ক্রিয়া উপলক্ষে। অনেক সময় ফিরতেন গরুর গাড়ীতে, প্রাপ্ত জিনিষ পত্র বোঝাই দিয়ে। গাড়োয়ানরা চম্পাখালের কাছা-কাছি এসে মনের বল বজায় রাখবার জন্যে জোরে গান হাঁকিয়ে দিত। কারণ, চম্পাখালের কাছটায় ছিল দস্যু ও ভূতের ভয়। খালের

---

* "Its history begins in 1804, with the appointment of Mr R. Blechynden to make a survey for a new line between Serampore and Chandernagar, the old road having been much encroached upon by the river."—Mr. Toynbee.

উপরকার সেতুর নীচে নরমুণ্ড জমা হয়ে থাকত। অনেকেই ঐখানে ঠ্যাঙাড়ের হাতে ধন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল বলে শোনা যায়। বর্ত্তমান রাইল্যাণ্ড রোডের ৪নং কটকের উত্তরে যেখানে কাঠের পোল ছিল সেখানেও ঐ ধরণের দস্যু ভীতি ছিল বলে প্রাচীনদের মুখে শোনা যেত।

এগ্রামের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' নামক পুস্তকে (১৮৫৫ খৃঃ) উল্লেখ আছে যে—"পথিকদিগের এইস্থান অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল, যে হেতু পথের দস্যু অর্থাৎ লাঠিওয়ালা অত্রস্থ বিশেষ বিশেষ স্থানে অনেক মনুষ্য বিনাশ করিয়াছে। তিন বৎসর হইল ঐ পথের দস্যু এক পথিকের সর্বস্বাপহরণ করিয়া লইয়াছিল।"

উপরোক্ত কারণে, প্রাচীনেরা সন্ধ্যার পর এই রাস্তার পরিবর্ত্তে গঙ্গার চড়া দিয়ে হেঁটে আসতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে ভাগীরথীর তীর ধরে আসা অনেক সুবিধাজনক ছিল। সম্ভবতঃ দিনেমারদের আমলে মিঃ বয়েকের চেষ্টায় ঐ সকল দস্যু বা ঠ্যাঙাড়েদের উপদ্রব প্রশমিত হয়। 'শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাসে' লিখিত আছে যে—"তাহার শাসনকালে একদল দুর্দ্দান্ত ডাকাত কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ডাকাতি করিত এবং শ্রীরামপুরে আসিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিত। মিঃ বয়েক বহু পরিশ্রম করতঃ সেই ডাকাত দলের ৪০ জনকে ধৃত করিয়া দণ্ড প্রদান করেন।"

রিষড়ার কুখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ ডোমের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ভায়দাদের সৃষ্টি।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত কয়েকটা বছর দেশের উত্তপ্ত আবহাওয়া শীতল হতে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে খানিকটা শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসতে লর্ড ক্লাইভ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দেবার

অঙ্গীকারে বাদশাহ্ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি আদায় ক'রে নিলেন।

এইভাবেই সেদিন ইংরেজদের স্বপ্ন সার্থক হল—'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী।'

এরপরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন, ফৌজদারী কার্য সম্পাদনের ভার ছিল নবাবের হাতে। কিন্তু সে সময় নিষ্কর, সকর প্রভৃতি জমি জায়গা সংক্রান্ত প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত থাকায় ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের প্রধান প্রধান বিভাগে এক একজন 'সুপারভাইজার' নিযুক্ত হন। ১১৭৬ সালের অভাবনীয় মন্বন্তরের পর বৎসব ১৭৭০ খৃঃ ইংবেজ সুপারভাইজারগণ নিষ্কর ভূমির সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করার কার্য আরম্ভ করেন এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ ঐ সমস্ত নিষ্কর জমির 'তায়দাদ' বা ছাড়পত্র করিয়ে নেবার আদেশ জারি করা হয়।

রিষড়াব অধিবাসীরা তখন অনেকেই তায়দাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। মালের জমার কিয়দংশও এই সময় নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর রূপে পরিণত হয়। শূদ্রগণও অনেকে আপন আপন ভূমি ঐরূপে মহত্তরাণ করিয়ে নেন। দেবোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি নিষ্কর ভূমির তায়দাদও এই সময়ে সৃষ্টি হয়!

স্বর্গীয় বলরাম পাকড়াশীর নামীয় ১৮/. আঠার বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমির তায়দাদের আলোকচিত্র এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তখন বর্দ্ধমান বিভাগের সুপারভাইজার ছিলেন—মিঃ টি, গ্রেহাম, তিনি ঐ তায়দাদ পত্রে স্বাক্ষর করেন ২২শে ডিসেম্বর ১৭৭০ তারিখে। পঞ্চানন তলার পঞ্চানন ঠাকুরের জমি সংক্রান্ত পরচাতে উক্ত সালের ৺হরেকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের নিষ্কর বহ্মাত্র জমির তায়দাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ৺কালীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী ৺গোপীমনি দেব্যার (স্বামী কাশীনাথ হালদার) বিক্রিত দলিলে ১১৭৭ সালের ১৫ই কার্ত্তিক

তারিখের তারদাদের উল্লেখও লক্ষ্যনীয়। (১২৭৩ সালে ৺বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রিত দলিল দ্রষ্টব্য।)

এইভাবে নিষ্কর ও সকর জমির একটা সুস্পষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ পত্র তৈরীর পর ইংরেজরা দেখলেন যে দেশটাকে ভালভাবে শাসন করতে হলে একজন গভর্নরের প্রয়োজন। ক্লাইভ তখন স্বদেশে। অনেক খোঁজাখুজির পর নজর পড়ল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উপর।

পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত, বহুদিন কেটেছে কাশিম বাজার কুঠিতে। দেশী চাল চলন, আচার আচরণ একেবারে ধাতস্থ। পলাশীর পর মীরজাফরের দরবারে তিনিই ছিলেন রেসিডেন্ট।

ইং ১৭৭২ খৃ: ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন দোষে গুণে জড়িত একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা। তাঁর আমলেও হুগলী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হয় নি। সুবৃহৎ বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ হিসাবেই পরিচিত ও পরিচালিত হয়ে আসছিল। নবাব খাঁজেহান খাঁ (নবাব খাঞ্জা খাঁ) তখন হুগলীর ফৌজদার, যাঁর নাম এতদঞ্চলে প্রায়শই উচ্চারিত হত— উপমাছলে। তাঁর আগে হুগলীর ফৌজদার ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। ১৭৬৫ খৃঃ তিনি বাংলার নায়েব-সুবার পদ প্রাপ্ত হন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পদচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন মহম্মদ রেজা খাঁ। তিনিই তখন বাংলার ছোট নবাব।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

১৭৫৬ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যুৎগতিতে বাংলার ইতিহাসের পটভূমিকা পরিবর্ত্তিত হতে হতে ১৭৬৫ খৃ: ভূমিকা বদল হয়ে যায়। দেশের মধ্যে কিছুটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দেশীয় বণিকরা আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দেবার সুযোগ পান। কলকাতার সঙ্গে রিষড়ার বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সংযোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে,

কারণ কলকাতায় তখন লোক সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। নব-বাবুর দল একটা নূতন কালচার গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছে।

লোকে তখন শুনে শুনে দু'একটা ইংরেজী শব্দ শিখে ফেলেছে। 'ইয়েস', 'নো', 'ভেরিওয়েল', এই তিনটে শব্দের সাহায্যে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সূত্রপাত হয়েছে। এইভাবে কয়েকটা বছর কাটতে না কাটতেই এক নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল।

বাংলা ১১৭৪ সালে অজন্মায় ফসল ভাল হয়নি, কাজেই ১১৭৫ সালে চালের দর বৃদ্ধি পেল। দরিদ্র লোকেরা এক সন্ধ্যা আহার করে দিন কাটাতে লাগল। ১১৭৫ সালে বেশ বৃষ্টি হল, ফসল বৃদ্ধির আশায় লোকে উন্মুখ হয়ে রইল কিন্তু আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হল না, মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে গেল। যার দু'এক কাহন ফলেছিল তাও রাজপুরুষেরা জোর ক'রে সিপাইদের জন্যে কিনে নিল। ফলে লোকেরা প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস তারপর দু'সন্ধ্যাই উপবাস আরম্ভ করল। ভিক্ষাবৃত্তিই তখন একমাত্র সম্বল।

মহম্মদ রেজা খাঁ তখন রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা। ইংরেজ কোম্পানীর মনস্তুষ্টির জন্যে হঠাৎ শতকরা দশটাকা রাজস্ব বাড়িয়ে দিল। শুধু কি তাই, চাউলবাহী যানবাহন আটক ক'রে সেই চাল টাকায় ২৫/৩০ সের হিসেবে কিনে নিয়ে টাকায় ৩/৪ সের দরে বিক্রয় করেছিল।

এর ফলে চারিদিকে শুধু কান্নার রোল। ভিক্ষা দেবে কে? সকলের একই অবস্থা। গরু, লাঙ্গল বিক্রী হয়ে গেল। বীজ ধানও খেয়ে ফেলল। জোতজমাও বিক্রী হতে বাকি রইল না। কিন্তু টাকার বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা দুষ্কর হয়ে উঠল। গাছের পাতা, ঘাস খেয়ে লোকে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করল। ইঁদুর বেড়ালও বাদ গেল না, খাদ্যের অন্বেষণে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে ছুটাছুটি করতে লাগল। পথেই কত লোক মারা গেল।

অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে আর অনাহারে লোকে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাল। পথে, হাটে, বাজারে দলে দলে লোকে মরে পড়ে রইল, শবদাহ পর্যন্ত করবার লোক পাওয়া গেল না। এ রকম হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কেউ কখনও দেখে নি। ১৭৭০ খৃঃ জানুয়ারী থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই কয়মাসে এক কোটি লোক মারা গেল। তার মানে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুর কবলিত হল। সে হল বাংলা ১১৭৬ সালের কথা। তাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে অভিহিত হয়েছিল।

অথচ, আশ্চর্যের বিষয় যে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এই মহামারী নিবারণে বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেনি। উপরন্তু দুর্ভিক্ষ বৎসরে প্রজার সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমে গেলেও রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ছাড় পায় নি। বাকী বকেয়া সমস্ত সুদে আসলে পরের বৎসর কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে নেওয়া হয়েছিল।

সে সময় মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় ছড়ার মাধ্যমে মন্বন্তরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল:—

"নদনদী খালবিল সব শুকাইল, অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল।
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে, দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে।
একচেটে ব্যবসায় দাম খরতর, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর।
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে, মরে লোক অনাহারে অখাদ্য
খাইয়ে।" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল সর্ব্বব্যাপী, কাজেই রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসীরা যে দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ক্লেশ ভোগ ক'রেছিল এবং কিছুসংখ্যক লোকক্ষয় হয়েছিল, একথা সহজেই অনুমেয়।

এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য গুলো মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যেতে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছিল। স্বচ্ছল অবস্থা তখন প্রায় কারুরই ছিল না এবং কোটা-বালাখানা বলতে তখন কিছু

ছিল না বললেই চলে। চাকরি বাকরির ব্যবস্থা তখনও জন্ম নেয় নি। বর্গীর হাঙ্গামা আর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোকের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। যার যা সম্বল ছিল তা নিঃশেষে ব্যয় করে মানুষ কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে ছিল।

অভাবের জ্বালায় তখন অনেকেই চুরি ডাকাতিতে হাত পাকিয়েছিল। তাই সাধারণ গৃহস্থরা ঘরের মেঝেয় গর্ত্ত করে তার মধ্যে তৈজসপত্রাদি কাঠ চাপা দিয়ে তার উপর শয্যা পেতে রাত্রি যাপন করত।

ব্রাহ্মণদের অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ, এবং কষ্ট কর। স্ববৃত্তি, অর্থাৎ যজন যাজনের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায়, ভীক্ষা ও কৃষি বৃত্তি ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কৃষিকার্য অবশ্য তাঁরা স্বহস্তে করতেন না, শূদ্র বা যবন যাতীয় ভৃত্য দ্বারাই সমস্ত কার্য সম্পন্ন করতেন। বর্দ্ধমান মহারাজ ও সেওড়াফুলির রাজাদের প্রদত্ত নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমির উপসত্বই তখন একমাত্র অবলম্বন ছিল।

চাকরি বলতে তখন একমাত্র জমিদারীর গোমস্তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। রিষড়ায় অবশ্য সে রকম বড় জমিদার কেউ ছিলেন না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা যাঁরা দোকান বা চালানী কারবার করতেন তাঁদের অধীনে সাধারণতঃ তাঁদের স্বজাতি বা আত্মীয় স্বজনই নিযুক্ত হতেন।

—

মহারাজ নন্দ কুমারের ফাঁসি।

মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন ক্লাইভের প্রিয় পাত্র এবং তাঁরই দৌলতে তাঁর 'মহারাজ' উপাধি লাভ কিন্তু তিনি অনেক চেষ্টা করেও নায়েব-নাজিম আর নায়েব-দেওয়ানের পদ লাভ করতে পারেন নি, ইংরেজরা তাঁর গোলমেলে স্বভাবের জন্যে তাঁর কথায় কান দেন নি।

নন্দকুমার সেই থেকেই মহম্মদ রেজা খাঁর জাত শত্রু। কি ক'রে তাঁকে পদচ্যুত করবেন তার ফিকিরেই অনবরত ঘুরতেন।

এই মনোবাদকে কেন্দ্র করেই নন্দকুমার শেষ পর্যন্ত হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে প্রভূত উৎকোচ গ্রহণের বিরুদ্ধে কোম্পানীর মন্ত্রনা সভার অভিযোগ করেন, কিন্তু সে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। পক্ষান্তরে তিনি দলিল জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং ১৫ জন ইংরাজ জুরীসহ বিচারে সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তৎকালীন ইংলণ্ডে প্রচলিত আইনানুযায়ী নন্দকুমারের প্রাণ দণ্ড হয়। ৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫ তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সারা দেশব্যাপী এই ঘটনায় একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং বহু ছড়া ও গান লোক মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। ব্রহ্ম হত্যার পাতকে কলকাতা কলুষিত হয়েছে মনে ক'রে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার কলকাতা ত্যাগ ক'রে ভাগীরথীর অপর পারে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বসবাস স্থাপন করেন।

কলকাতার তদানীন্তন শেরিফ লিখেছেন যে— নন্দকুমারের পূর্ব নির্দেশমত তাঁর মৃত দেহ তিনজন ব্রাহ্মণকে দাহকরণার্থ দেওয়া হয়, কিন্তু কোথায় তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয় সে সম্বন্ধে জীবনীকাররা নীরব। এর ফলেই নানারকম জনশ্রুতির সৃষ্টি। হুগলী জেলার ইতিহাসে (৩ খণ্ড) শ্রীসুধীর কুমার মিত্র তাই লিখেছেন :—

"হেষ্টিংসের বাগানবাড়ি সম্বন্ধে ১২১৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বাগানে একটি প্রাচীন অলিখিত কবর আছে। উহা যে কাহার সমাধি তাহা আজ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয় নাই। জনশ্রুতি, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর তাঁহার মৃতদেহ গোপনে এই স্থানে সমাহিত করা হয়।"

উপরোক্ত জনশ্রুতির মূলে কোন সত্য আছে কিনা জানা যায়না তবে মিঃ ওম্যালি সাহেব তাঁর হুগলী জেলা বিবরণীতে লিখেছেন :—

"In this village there is an unnamed grave said to be that of a European Child burried by Warren Hastings".

হেষ্টিংস লজ বা বাগান বাড়ী।

১৭৭৪ খৃঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস হলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল। তিনি প্রায়ই সস্ত্রীক কোলকাতা থেকে ভাগীরথী বক্ষে নৌ-বিহার করে বেড়াতেন।

"Hastings made the river his "Simla"......The nearest place up the river which Hastings loved to visit was Rishra". Hooghly Past & Present—S. C. Dey, B. A. B. L.

রিষড়ার বর্তমান 'হেষ্টিংস লজ' নামক সুদৃশ্য অট্টালিকা ছিল তখন হাটখোলার দত্ত পরিবারের সম্পত্তি। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ঐ স্থানটির প্রাকৃতিক শোভা সম্পদ এবং ঐ বাড়ীটির রূপাকৃতি সে সময় শ্যামলিমা ঘেরা ওক্ বৃক্ষ শোভিত ইউরোপীয় গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হত। তিনি এই বাড়িটী দেখে মুগ্ধ হলেন। বাড়িটী তাঁর চাই; তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেরি হল না। ১৭৮০ খৃঃ মাত্র ১১৪৫ টাকায় ১৩৬ বিঘা জমি সমেত ঐ বাড়িটি তিনি কিনে নিলেন।

(Warren Hastings in 1780 purchased the land on which the house stands for I,I45/- from R. C. Dutt and K. P. Dutt.—Dist. Gazetteer Mr. Omally).

এ ধরণের বাগান বাড়ী তাঁর অন্যত্রও ছিল কিন্তু এখানকার নির্জনতা এবং ইউরোপীয় ধরণে নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাটি তাঁকে বিশেষ ভাবেই আকর্ষণ করত। তাই বহু সমস্যাজড়িত রাজকীয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি প্রায়ই সস্ত্রীক এখানে এসে ভাগীরথীর সুশীতল বায়ুসেবনে তাঁর শ্রান্তি বিনোদন করতেন।

("To this favourite place he often retired for relaxation from the arduous duties of his office and spent his leisures in the company of his wife)"—The Danes in Bengal—L. M. Maitra.

অতবড় বাগান বাড়িটা ছিল চার পাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকটায় ছিল বড বড় আমগাছের সারি, তার মধ্যে কতকগুলো ছিল লেডি হেষ্টীংসের স্বহস্ত রোপিত।

"It was surrounded by a brick wall, the western portion of which was lined with row of mango trees said to have been planted by Mrs. Hastings". (Selections from Cal. Gazette. Vol,-I, P—49).

এই বাড়ীর কথা, এখানকার সৌন্দর্যের কথা সব ঐতিহাসিকই লিখে রেখে গেছেন। এই বাড়ীটা ছিল বহু রহস্যময় ঘটনা পুঞ্জের সাক্ষী। কত রাজকীয় সলা-পরামর্শ, কত রাজনৈতিক গুপ্ত আলোচনার প্রতিধ্বনি এই বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে ঘুরে ফিরছে তার ইয়ত্তা নেই। ভাগীরথীর কুলু কুলুধ্বনি সে সব শব্দধ্বনি নিজের বুকে টেনে নিয়েছে। তার আগে বিক্রেতা কালীপ্রসাদ দত্তর আমলে এই বাড়ীর প্রমোদ কক্ষে হয়ে গিয়েছে কত বাইজীর নাচগান; কত নূপুর নিক্কণ, কত পান ভোজনের হট্টগোল। 'বিবি আনর' নামক একজন পরমাসুন্দরী মুসলমান বাইজী যে তাঁর উপপত্নী ছিল একথা তখন কারও অবিদিত ছিল না। এই ব্যাপার নিয়ে তখন হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল যার ফলে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ (মতান্তরে পিতৃশ্রাদ্ধ) পণ্ড হবার উপক্রম হয়েছিল। একমাত্র কলকাতার বিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকার আর সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় মহামতি সন্তোষ রায় মহাশয়ের সাহায্যে সে কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও তার মাতৃশ্রাদ্ধ কোনও ক্রমে সম্পন্ন হয়।

কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দেবার জন্যে ২৫,০০০ টাকা সন্তোষ রায়কে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ঐ টাকা গ্রহণ না করায় রায় মহাশয় ঐ টাকা এবং নিজে আরও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কালীঘাটের বর্তমান মন্দির নির্মাণ ক'রে দেন।

রামনিধি মুখোপাধ্যায়

ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে সময়ে রিষড়ার বাগান বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন সেই সময় একদিন ঘটনাচক্রে বর্ত্তমান দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের অধিবাসী যুবক রামনিধি এবং সহোদর রামমোহন মুখোপাধ্যায় উভয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পান। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে নানারকম কিম্বদন্তী জড়িত আছে। যাইহোক, রামনিধি মুখোপাধ্যায় যুগোপযোগী বাংলা, সংস্কৃত এবং কিছু কিছু পার্শী ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় এবং বংশ পরিচয়ে লাট সাহেব সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে হিজলীর নিমক মহলের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। সে হ'ল আনুমানিক ১৭৮১/৮২ খৃঃ কথা।

তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীনারায়ণ, এবং তাঁরা ছিলেন চার সহোদর। তার মধ্যে জনার্দ্দন ও রামলোচন পূর্বেই পৃথগান্ন হয়েছিলেন। একান্নভুক্ত ছিলেন তৃতীয় সহোদর-রামমোহন। এই রামমোহনের উপর সংসারের দেখা শোনার ভার দিয়ে তিনি নূতন কার্যক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন জল পথেই হিজলী যাতায়াত করতে হত, এবং তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী কর্মস্থলে স্ত্রীপুত্র নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল না। রামনিধি তাই একাই সেই অজানা অচেনা কর্মস্থলে যোগদান করে ছিলেন, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য অর্জনের আশায়, হিজলী ছিল তখন কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত একটি নূতন কালেক্টরীর অধীন।

যতদূর জানা যায়, তাঁর পরিচারকবৃন্দ ছিল আজ্ঞাবহ এবং সেবা পরায়ণ এবং হিজলীর জলবায়ুও হ'য়েছিল পূর্বাপেক্ষা কিছুটা উন্নত। শতবর্ষ পূর্বে হিজলীর অবস্থা ছিল—"একবার খেলে হিজলীর পাণি, যমে মানুষে টানাটানি।"

১৭৬৫ খৃঃ ক্লাইভের প্রতিষ্ঠিত বণিকসভার লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুমোদন না করলেও বণিক সভা এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত লবণ প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের জমিদারগণ উক্ত বণিক সভাকে মুচলেকা দিয়ে লবণ প্রস্তুত করতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিক্রীত লবণের উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে কমিশন পেতেন। এই বৎসরই লবণের কমিশন থেকে কোম্পানীর লাভ হয়েছিল ৪০ লক্ষ টাকা। লবণ ব্যবসায়ে এই রকম লাভের অঙ্ক লক্ষ্য ক'রে ১৭৮১ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটা স্বতন্ত্র লবণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদার-গণকে লবণ প্রস্তুত করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ক'রে ইংরেজ কর্মচারী-দের তত্ত্বাবধানে লবণ প্রস্তুতের কার্য আরম্ভ করেন।

হুগলী, তমলুক, হিজলী ও চট্টগ্রামে লবণের এজেন্সী ছিল, এবং প্রত্যেক স্থানে লবণ এজেন্ট উপাধিধারী এক একজন ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হন। এই সমস্ত লবণ এজেন্টগণের অধীনে কাজ ক'রে তখনকার দিনে বহু শিক্ষিত বাঙালী প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁরা সাধারণতঃ সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী, কেরানী প্রভৃতির কার্য করতেন। নিমক মহলের দেওয়ানদের উপরি পাওনা হিসাবে অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' নামক পুস্তকে এবং ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর 'দ্বারকা নাথ ঠাকুরের জীবনীতে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে

তাঁদের সে সমস্ত পাওনা, গবর্নমেন্টের জানিত ছিল, কাজেই জুয়াচুরি বা ঘুষের অপবাদের কথা উঠতেই পারে না।

দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের মধ্যেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং রিষড়ায় বৃহৎ অট্টালিকা এবং পাঁচ খিলান যুক্ত প্রকাণ্ড পূজার দালান নির্মাণ করান। এই দালানের থাম ও খিলানের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও অলংকরণ ছিল অতীব সুন্দর। কালের অবক্ষয়ে সেই পূজার দালান আজ ভগ্নাবস্থা। দেওয়ানজীর প্রবর্ত্তিত দুর্গোৎসব ২ পুরুষ চলার পর বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তদবংশীয়গণ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে পুনরায় অস্থায়ী আচ্ছাদন দিয়ে সেই প্রাচীন দালানে আজও যুগোপযোগী শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা সম্পন্ন ক'রে আসছেন।

বিত্তশালী হলেও রামনিধির চরিত্র ছিল উদার ও ধর্মপরায়ণ। দেবসেবা ও অতিথিশালা স্থাপন তাঁর কীর্ত্তিকলার অন্যতম।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন মৌজায় তিনি বহু জমি জায়গা ক্রয় করেন এবং পূর্ব পুরুষগণের নামানুসারে এক একটি মহলের নামকরণ করেন—যেমন দয়ালচক্, হলধরচক্ প্রভৃতি।

এই সমস্ত জমিদারী থেকে যখন ধানের কিস্তি রিষড়ার কাঁচা ঘাটে (তখন বিশ্বম্ভর সেন কর্তৃক পাকা ঘাট নির্মিত হয় নি) এসে উপস্থিতি হত তখন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা শঙ্খধ্বনি ও পুজার্চ্চনা-করে গোলায় তুলতেন। অতিথি শালার নিত্য আহার্য পূর্ণ সিধা দেবার ব্যবস্থা ছিল।

রিষড়ার মধ্যেও তাঁর স্বক্রীত এবং ব্রহ্মোত্তর হিসাবে প্রাপ্ত বহু জমি ছিল, যার কতকাংশ ১৮৬৭ খৃঃ কলের গাড়ী থাকায় ঘর নির্মাণ কল্পে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ক্রয় ক'রে নেন। ১৮৭৪ খৃঃ বর্ত্তমান হেষ্টিংস মিল স্থাপনের প্রয়োজনেও তাঁদের কিছু কিছু জমি বিক্রী হয়ে যায়।

এই সমস্ত জমিদারীর কাজকর্ম, খাজনা আদায় ও তার হিসাব নিকাশ রক্ষার জন্যে সেকালে তাঁদের সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল। পুরাতন দলিল পত্রাদি থেকে জানা যায় যে তিনি নামমাত্র খাজনায় বহু জমি মৌরসী বিলি ক'রে দিয়েছিলেন এবং প্রজাবর্গের সুবিধার্থে তাঁর জমিদারির মধ্যে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।

যদিও-ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে কাজীর বিচারের পরিবর্তে জেলায় জেলায় কালেক্টর ও জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিচার ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছিল কিন্তু গ্রামবাসীরা, অর্থাৎ ত্রিবড়ার অধিবাসীরা তখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েতি শাসন প্রথার অধীন ছিলেন, তার কারণ সে যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে আদালতে গিয়ে মামলা দায়ের করা ও তার তদ্বির করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

উপরোক্ত কারণে দেওয়ানজীর আমলে এবং তৎপরবর্তী যুগেও তাঁদের বাড়ীতে কাছারি বসত এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলারই বিচার হত বলে জানা যায়। শাস্তি হিসাবে কারও হত অর্থদণ্ড, কারও বেত্রাঘাত বা নাকখত এবং গুরুতর অপরাধে হত ধোপা নাপিত বন্ধ।

দেওয়ান রামনিধির আমলে যে দুর্গোৎসব হত তা ছিল ত্রিবড়ায় একক ও অনন্য। এ পূজা ছিল যেন সকলের পূজা। বিরল বসতি ত্রিবড়ার সকলে এসে এই পূজায় যোগদান করতেন। তাঁর প্রজাবর্গ অধিকারী ভেদে সকলেই আপন আপন বিভাগের কাজ সানন্দে সম্পন্ন করতেন। শুধু একবার বললেই হল যে—"বাবা! মা আসছেন, তোরা সব দেখা শোনা করিস, যেন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না ঘটে। এইখানে সব খাওয়া দাওয়া করবি।" ব্যস, কাকে কি করতে হবে, সে যেন সব আগে থেকেই জানা। গঙ্গাজল তোলা, পদ্ম ফুল আনা,

তামাক সাজা থেকে পুরোহিত মহাশয়ের গাড়ু-গামছা সাজিয়ে রাখা, মেরাপ বাঁধা সবই তাদের নখদর্পণে। তখন ছিল ভাত মুড়ির দেশ, সকালে বিকালে গুড়মুড়ি জলখাবার স্নানের আগে একপলা সরষের তেল আর দু'বেলা পেটভরা মাছের ঝোল ভাত। এইতেই সকলে সন্তুষ্ট, এর বিনিময়েই সব কাজ পাওয়া যেত।

পূজার তিনদিনই প্রত্যহ ২০/২২টি ক'রে ছাগ বলিদান হত। নবমীর দিন মহিষবলীর ব্যবস্থাও ছিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যেরা নিমন্ত্রিত হয়ে তিনদিন ভূরি ভোজে আপ্যায়িত হতেন। পুকুরের মাছ আর মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমানেই দেওয়া হত। তার সঙ্গে থাকত পায়েস, নারিকেল-সন্দেশ আর ঘরে পাতা দই। পূজার ক'দিন ধরে চলত দর্শনার্থী নরনারী ও শিশু বৃদ্ধদের মধ্যে মুড়ি মুড়কি বিতরণের ব্যবস্থা। তালপাতার তৈরী বড়বড় টেকোয় ভর্ত্তি মুড়ি আর মুড়কি রাখা হত এবং তাই থেকে সরাভর্ত্তি সকলের আঁচলে ঢেলে দেওয়া হত। এই দুর্গা পূজা উপলক্ষে তিনি একবার দম্পতী বরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত সুলভ থাকায় মোট দেড়শত, দু'শত টাকায় সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব সম্পন্ন হত। (৪/১০/৭০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকা দ্রষ্টব্য)

তখনকার দুর্গাপূজার ভাবটি ছিল বৎসরান্তে কন্যার শ্বশুরালয় থেকে মাত্র তিন চারদিনের জন্যে পিতৃগৃহে আগমনের দৃশ্য। গৃহকর্ত্রী সেইভাবেই মাতৃস্নেহভরা ভক্তি উপচারে মাতৃপূজার আয়োজন ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা করতেন এবং বিজয়ার বিদায়ক্ষণে অশ্রুবর্ষণে মায়ের রক্তিম চরণ সিক্ত করে দিতেন। দেবীর মুখ চুম্বনে যে করুণ দৃশ্যের অবতারণা হত তাতে মনে হত মৃন্ময়ী মূর্ত্তির চোখ দুটিও যেন বিয়োগ ব্যথায় ছল ছল ক'রে উঠেছে।

দুর্গোৎসব ছাড়াও দেওয়ানজী স্বগৃহে নিত্য পূজার জন্যে ৯টি ছোট বড় শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। এই ৯টি শিলা

জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে এবং বিভিন্ন লক্ষণ ভেদে রাজরাজেশ্বর, শ্রীধর, লক্ষ্মী.-জনার্দ্দন নামে পরিচিত। কথিত আছে বিগ্রহ গুলির মধ্যে একটি নিয়ে যান দেওয়ানজীদের জ্ঞাতি—ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ৺ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং অপর একটি দেওয়া হয় দৌহিত্র সন্তান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের। অবশিষ্ট ৭টি শিলা তাঁর বংশধরগণ কর্তৃক পালাক্রমে অদ্যাবধি পূজিত হয়ে আসছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে, সে যুগে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ গৃহে এবং ব্রাহ্মণেতর সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে পুরোহিত দ্বারা শালগ্রাম শিলায় নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল। তার কিছুটা নিদর্শন আজও বর্ত্তমান।

গ্রামাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রী ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার কার্ত্তিকী অমাবস্যায় রাত্রে বাৎসরিক পূজার দিন দেওয়ানজী বিবিধ উপাচারে সুসজ্জিত বৃহদাকার শর্করা নৈবেদ্য এবং ছাগবলির দ্বারা মাতৃপূজার ব্যবস্থা করেন। অদ্যাবধি সে পূজার ব্যবস্থা অন্যান্য ভক্তবৃন্দের মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে।

ভগবদ্ ভক্তির সঙ্গে তাঁর গুরুভক্তিও ছিল প্রগাঢ়। ভট্টপল্লী নিবাসী তদীয় গুরুদেব তাঁর মাতাঠাকুরাণীর অভিলাষ পূরণার্থে একটি পুষ্করিণী খনন ও প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করায় তিনি নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন এবং উক্ত কার্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। কথিত আছে, বেহালায় দেওয়ানজী বাগান বন্ধক রেখে তিনি ঐ অর্থ সংগ্রহ করেন। পরবর্ত্তী কালে বেহালার প্রসিদ্ধ অম্বিকা চরণ রায় উক্ত বাগান ক্রয় করে নেন।

সরকারী কার্য থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি নানাভাবে স্বগ্রামের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। এ গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে একটি স্থায়ী পাঠশালা স্থাপন উদ্দেশ্যে তিনি জি, টি, রোডের পূর্ব পার্শ্বে একখণ্ড জমি দান করেন বলে জানা যায়। সে সময়ে এই গঙ্গাতীরে তাঁদের কয়েকঘর প্রজা বাস করত। সরকারী কর্মচারী

হিসাবে এবং বহু সৎকর্ম অনুষ্ঠানের জন্যে দেওয়ানজী বিশেষ সুনাম ও গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

মোট কথা, তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর নামটি সার্থক হয়ে উঠেছিল তাঁর কর্মধারার মধ্য দিয়ে। রাম+নিধি। তিনি যেমন একদিকে নিধি বা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন অপর-দিকে তেমনিই রাম নামের সার্থকতাও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে। ১৮৭৫ খৃঃ তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক তাঁর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তাটির নাম দেওয়ানজী ষ্ট্রীট বলে অভিহিত হয়।

সেকালের স্বাস্থ্য-শ্রী

স্বর্গীয় দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের কোন তৈল চিত্র বা প্রতিকৃতি না থাকায় তাঁর দৈহিকগঠন বা আকৃতির কোন পরিচয় পাওয়া যায়না তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যাঁরা তদ্বংশীয় ৺চুনীলাল মুখোপাধ্যায় বা ৺সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়কে দেখেছেন তাঁরা খানিকটা অনুমান করতে পারবেন সে যুগের (অষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) রিষড়ার অধিবাসীদের দৈহিক গঠন কেমন ছিল।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁর 'সেকাল-আর একাল' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে "এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বকায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন সন্দেহ নাই। ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল সর জন লরেন্স উত্তরপাড়ার স্কুলের বালকদিগকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন সেকালের বাঙ্গালীদের তুলনায় একালে বাঙ্গালীরা নিতান্ত ক্ষীণ।"

বসু মহাশয় তাঁর আত্মচরিতে সে যুগের স্বাস্থ্য চর্চা ও মল্লগণের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কবিতার মাধ্যমে লিখেছেন :—

সকলের মুখে এই কথা শুনা যায়।
পিতামহ ছিলা মম, বলবান কায়॥
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছিল প্রচারিত।
বাঙলার প্রতি গ্রামে ব্যায়ামের রীত॥

* * * * *

মুগুর লইয়া হস্তে ভদ্র যুবজন।
ভাঁজিতেন প্রতিদিন করিতেন ডন॥
এখন সে সব চর্চা দেখা নাহি যায়।
গ্রন্থের চর্চায় শুদ্ধ সময় কাটায়॥" ইত্যাদি

১৮০৭ খৃঃ বাঙালীর দেহশ্রী সম্বন্ধে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো লিখেছিলেন : —

"I never saw so handsome a race, these (the Bengalees) are masculine figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are the most classical european model with great variety at the same time." (Lord Minto's letter to the Hon'ble A. M. Elliot, Sept. 1807)

বাঙালী নারীর স্বাস্থ্য ও রূপ চর্চা সম্বন্ধে বহু বিদেশী ও বিদেশীনী তাঁদের ডাইরিতে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন; শ্রীরামপুরের পাদরী ওয়ার্ড সাহেবও বাদ যায়নি।

বঙ্গনারীর শাড়ীপরার ধরণটি আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। মিসেস্ পার্কস এই শাড়ীপরার কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভাগীরথীবক্ষে মহিলাটি স্নান পর্ব সমাধা করে, এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে অঙ্গ মার্জনা করতে করতে ধীরে ধীরে শাড়িটি কেচে ফেললেন কিন্তু আশ্চর্য্য, সমগ্র শাড়িটি কাচা হয়ে গেল অথচ দেহ একবারও অনাবৃত হল না। সব সময়ই শাড়ির কোন-না-কোন অংশ দিয়ে তিনি লজ্জা নিবারণ করেছিলেন।

তখন পর্যন্ত সাবান মাখার প্রথা প্রচলিত হয়নি বটে, কিন্তু দেহের পারিপাট্য রক্ষার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা সে যুগেও ছিল। সাধারণ লোকে শুধু চন্দন মাখত। কেউ কেউ চন্দনের সঙ্গে মৃগনাভী বা মচুকুন্দ কিম্বা চম্পক বা কেয়ার রেণু মিশিয়ে সেইগুলো কাঁচা হলুদ, কাবাব চিনি, খাঁড়ি মঞ্জরী বা কেলেজিরে, সর বা নবনীতের সঙ্গে বেটে দেহের পরিমার্জনা করতেন। শৈশব থেকেই সারা শরীরে সরিষার তৈল মাখার রীতি প্রচলিত ছিল এবং তার সঙ্গে রৌদ্র স্নান। "এশিয়াটিকস" কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৭৪ সালে। তিনি বঙ্গরমণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি লিখেছেন-"বঙ্গনারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন এমন সুন্দর, তাদের নয়ন যুগল এমন ব্যঞ্জনা-ময় যে গাত্রবর্ণের কথা একবারও মনে জাগেনা। —

You must acknowledge them not inferior to the celebrated beauties of europe"

বলা বাহুল্য; রিষড়ার মহিলারাও ছিলেন ঐ একই ছাঁচে ঢালা।

হেষ্টিংসের অবসর গ্রহণ

১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খৃ: এই তের বছর ধরে একটানা হেষ্টিংস ছিলেন রাজপাঠে সমাসীন। প্রথমে ছিলেন বাংলার গভর্ণর তারপর গভর্ণর জেনারেল। তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রিষড়ার বাগান বাড়ীও নীলাম হয়ে গেল।

১৭৮০ খৃঃ ৫ই আগষ্ট তারিখের কলকাতা গেজেটে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল :—

"On Thursday, the 2nd of September next, will be sold by public outcry by Mr. Bonfield, at his Auction Room, if not sold before by private sale that extensive piece

ground belonging to Warren Hastings, Esq. called Rishera House (lchera) situated on the western bank of the river two miles below Serampore consisting of I36 'bighas', 18 of which are 'lakherage' land or land paying no rent,"

"Writing to his wife on her voyage home on 20 th November 1784, Hastings says "I have sold Rishra house for double the sum that was paid for it" (Crawford)

"When Hastings retired, he sold the house and adjoining land (136 Bighas) reseiving tweic as much as he had paid for it (Selections from the Calcutta Gazette, vol.—I page 49. Auction Notice, under date 5—8—1784) *

Dist. Gazetteer—Hooghly-

হেষ্টিংস হাউসের পরবর্ত্তী ইতিহাস যথা স্থানে আলোচিত হয়েছে। হেষ্টিংসের সমসাময়িক কালে বা তৎপূর্বে যে রিষড়ায় ইউরোপীয়দের আগমন ঘটেছিল তা বোঝা যায় 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' নামক পুস্তকের বিবরণ থেকে—"কয়েকজন ইংলণ্ডীয়েরা এ গ্রামে বাস করিতেন। সাহেব লোকের মধ্যে কাপ্তেন ওয়েদার হাল সাহেব এই স্থানে প্রথমতঃ আলয় নির্মান পূর্ব্বক বাস করেন।"

'ওয়েদার হাল সাহেবের' নির্মিত আলয় বা গৃহ কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, অনেকের অনুমান যে হেষ্টিংস লজের স্থাপত্যরীতিতে যখন সম্পুর্ণ ইউরোপীয় প্রথা বর্তমান, তখন উক্ত অট্টালিকাটি সম্ভবতঃ ওয়েদারহাল সাহেব কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনিই পরে হাট খোলার দত্ত পরিবারের কাছে বিক্রী করে দেন, এবং পরে ১৭৮০ খৃঃ হেষ্টিংস সাহেব ক্রয় করেন।

* উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসের ৩য় খণ্ডে (পৃঃ ১২১৩) হেষ্টিংস লজ বিক্রয়ার্থ ১৭৭৪ খৃঃ কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় বলে যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে পারসী পড়ার উৎসাহ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল এবং বাঙালী ছাত্রবৃন্দ ইংরেজী শিক্ষার সোপান হিসাবে— 'গাড-ঈশ্বর, লার্ড-ঈশ্বর, কাম-আইস, গো-যাও, আই- আমি, ইউ- তুমি প্রভৃতি শব্দ মুখস্থ করার দিকে অধিকতর উদ্যোগী হয়ে ওঠেছিলেন।

মুখস্থ করার সুবিধার জন্য ছড়ার আকারে ইংরেজী শব্দগুলো অর্থসহ বাঁধা হয়েছিল :—

"পমকিন্ লাউ কুমড়া, কোকম্বর শসা,
ব্রিঞ্জেল্ বর্ত্তাকু, প্লোমেন চাষা"॥ ইত্যাদি

এই ধরনের ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজী শব্দের সাহায্যেই সে যুগে এদেশবাসীরা সাহেবদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সদাগরী অফিসে কাজ চালিয়ে দিতেন। তখন অবশ্য শেতাঙ্গ শাসকেরা এমন গোঁ ধরেন নি যে ইংরেজী শিক্ষা না করলে তাদের সঙ্গে কথা বলাই হবে না। তাঁরা বরং নিজেরাই ফার্সি এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন এবং এদেশ বাসীদের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলা মেশা করতেন এবং একে অপরকে জানতে চেষ্টা করতেন। অনেকে আবার এদেশীয় মহিলাদের সংস্পর্শে এসে পান খাওয়া ও আলবোলা ফোঁকা অভ্যাস করে ফেলেছিলেন।

ইউরোপীয় ব্যবসার সূত্রপাত।

প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমল থেকেই রিষড়ায় ইউরোপীয়দিগের আগমন ও নানারকম ব্যবসার পরীক্ষা, নিরীক্ষা চলতে থাকে। তাদের মধ্যে নীল, মদ ও চিনির ব্যবসাই ছিল উল্লেখযোগ্য

"During this period non official Europeans were mainly engaged in the manufacture of indigo, sugar & rum, Indigo appeats to have been introduced into this district (Hooghly)

as early as 1780, according to one account, by Mr. Princep and the industry must have been well established by 1793, when some extensive indigo works were offered for sale at Rishra. (Selections from the Calcutta gazette, 21 st February 1793, vol—I, page 550)

১৮৪২ খৃঃ পর্যন্ত রিষড়ায় নীলের চাষ বর্তমান ছিল বলে জানা যায় কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় নীলের চাষ হত বা নীল কুঠী ছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন দুখানা ইতিহাসে ভাগীরথী তীরেই নীলের চাষ হত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) " পূর্বে বঙ্গ দেশের সর্বত্রই প্রচুর পরিমানে নীল জন্মাইত, কিন্তু সাধারণে তাহার ব্যবহায় বিধি জ্ঞাত না থাকায়, কেহ তাহা ব্যবহার করিতেন না, চাতরা, শ্রীরামপুর, আকনা, বল্লভপুর, মাহেশ রিষড়া প্রভৃতি গ্রামের ভাগীরথী তীরে প্রচুর নীলী বৃক্ষ জন্মিত।" (শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস)।

(২) "এই স্থানে উত্তম পান চাষের নিমিত্তে খ্যাতি, এতদভিন্ন এইস্থানের ভাগীরথী তীরে নীল আবাদ হইয়া থাকে।" (বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে)

বামুনআড়ি অঞ্চলে ৺পুর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের ক্রীত নীলকুঠির বাগান এতদঞ্চলে সুপরিচিত। একথা সর্বজন বিদিত যে নীল চাষে প্রথম প্রথম চাষীরা লাভবান হলেও পরে যে তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, দীনবন্ধু মিত্রের ' নীলদর্পনই' তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। নিম্নলিখিত ছড়ার মধ্যেই রয়েছে নীলকরদিগের নিদারুণ অত্যাচারের করুণ কাহিনী :—

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলো এবার ছারখার।
হায়রে ভাই প্রজার এবার প্রাণ বাঁচানো বিষমভার

নীল ছাড়াও এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 'নেপলরী' ও 'ক্যাকটাস' (মনসা জাতীয়) গাছের সর্বপ্রথম চাষ হয় বলে জানা

যায়।

ডাঃ ক্রফোর্ড তাঁর মেডিকেল গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেছেন যে—

"On the 10th Novr. 1796 was advertised for sale the pleasant & well-known Villa of Rishra about 50 bighas of ground & 120 bighas of Nepaulry fully planted & now ready to receive insect. That insect seems to have been first introduced by the Portugues from America".

উক্ত পুস্তকে আরও উল্লেখ আছে যে ডাঃ জর্জ ওয়াট ১৭৯৫ সালে তাঁর রিষড়ার বাগানবাটী ও তন্মধ্যে আন্দাজ ৫০ বিঘা জমিতে লাক্ষা চাষ সমেত বিক্রয় করেন।

রিষড়াতে Cochinal নামক একপ্রকার কীটের চাষ হত। ঐ কীট এক রকম লাল রংয়ের উপাদান। এই কীট কোন বিশিষ্টবৃক্ষে সন্নিবিষ্ট হলে তা থেকে রং উৎপন্ন হত।

রিষড়ায় ইউরোপীয় প্রথায় মদের কারখানা ও স্থাপিত হয়েছিল এবং কিছুদিন এখানে রঙ্গীন ছিটের ও রুমাল ছাপার কারখানাও চলে ছিল। এসম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবসার মূলে ছিল মিঃ প্রিন্সেপের কার্যকারিতা। যদিও বিদেশী মূলধন ও পরিচালনা ছিল এই সমস্ত ব্যবসায়ের প্রাণ তবু গ্রামবাসীরা যে সাধারনতঃ এই সমস্ত কারখানার কাজে নিযুক্ত হতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ তখনও পর্যন্ত অবাঙালী শ্রমিক আগমন ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

গঙ্গার ঘাট ও শিবমন্দির।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একদিকে যেমন দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায় অর্থে, সামর্থে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন, অন্যপ্রান্তে তেমনি দাঁয়েরা ও পালেরা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনশালী হয়ে উঠেছিলেন। তখনকার যুগের প্রথাই ছিল নিজ নিজ বাসোপযোগী

পুত্তালিকা নির্মাণের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ পূজার দালান তৈয়ারী করান। রিষড়া ও মোড়পুকুরের প্রত্যেকটি প্রাচীন সম্পন্ন পরিবারের পরিচয় তাঁদের নির্মিত (অধুনা ধ্বংস প্রাপ্ত) পূজার দালানগুলির মধ্যেই বর্ত্তমান।

দাঁ বংশীয় ৺ত্রিলোক রাম দাঁ ১১৭০ সালে (ইং ১৭৬৩ খৃঃ) (শিলালিপি দ্রষ্টব্য) গঙ্গাতীরে সাধারণেব ব্যবহার্য পাকা ঘাট নির্মাণ করে দেন। এই ঘাটটিই ছিল রিষড়ার গঙ্গার ঘাটগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এই ঘাটের নিকটেই নির্মাণ করান শিবমন্দির। ঐ মন্দির গাত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর পোড়ামাটির অলংকরণ ও পদ্ম, চক্র প্রভৃতি ছাড়াও পৌরাণিক যুদ্ধ চিত্র বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে তার অধিকাংশই আজ অপসৃত। ঘাট ও মন্দিরের আলোক চিত্র যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

পাকা পূজার দালানের পবিবর্ত্তে তিনি সুবৃহৎ ও সুরম্য আটচালা নির্মাণ করান। সে আটচালায সে যুগের সুক্ষ্ম কারু শিল্পরীতির যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমানে সেই আটচালার পরিবর্ত্তে পাকা দালান নির্মিত হয়েছে। তাঁদের পৌরোহিত্য পদে বৃত হন, রিষড়ার পাকড়াশী বংশ।

পালবংশের পূজার দালান ও ঘোষ বংশের চণ্ডী দালানও আজ ধ্বংস প্রাপ্ত। কিছুকাল আগে ৺নন্দলাল ঘোষ খননকার্য্যের দ্বারা উক্ত চণ্ডীদালানের ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করেন।

৺ত্রিলোকরাম দাঁ মহাশায গন্ধবণিক সমাজের কুল-দেবতা ৺গন্ধেশ্বরী পূজা ছাড়াও ৺শারদীয়া দুর্গাপূজার (শ্রীশ্রী ৺হরগৌরী মূর্ত্তি) প্রচলন করেন। কয়েক পুরুষ চলার পর উক্ত দুর্গাপূজানুষ্ঠান বন্ধ হ'য়ে যায়। (১৩৪৫ সাল থেকে যৌথভাবে উক্ত পূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন হয়েছে) ঘটনা চক্রে, তিনি খড়দহের প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশধরের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীশ্রী ৺মদন গোপাল জীউর যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু

শরিকানী বিবাদের ফলে উক্ত বিগ্রহ পরে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়, বর্ত্তমানে ৺কীর্ত্তিচন্দ্র দাঁ প্রভৃতির বংশধরগণ কর্ত্তৃক পুজিত হইতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে এই দাঁবংশের কয়েকজন কৃতি ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে কলকাতায় স্থায়ী বাসস্থাপন করেন এবং প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। ১৭০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৯ খৃঃ রিষড়ার কোমর পাড়ায়, বর্ত্তমান নবীন পাকড়াশী লেনে আরও একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির ছাড়া রিষড়ায় আর কোনও মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত শিবমন্দির দুটি সংযুক্ত হওয়ায়, মন্দিরের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনটিতে।

থানা ও হুগলী জেলার সৃষ্টি।

হেষ্টিংসের পর আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে। তাঁরই আমলে প্রথমে 'দশশালা' বন্দোবস্ত চালু হয় পরে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়, যার ফলে জমিদাররা নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগদখলের অধিকারী হন। কিন্তু বৎসরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে না পারলে তাঁদের জমিদারী নীলাম হবার বিধানও বিধি বদ্ধ হয়।

তিনিই প্রথম জেলায় জেলায় 'জজ' নামক এক একজন ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং শান্তি রক্ষার জন্যে কয়েক ক্রোশ অন্তর একটি ক'রে থানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক থানায় একজন ক'রে দারোগাও নিযুক্ত হন।

শ্রীরামপুর তখন দিনেমারদের হাতে, কাজেই বৈদ্যবাটীতেই থানা স্থাপিত হয় এবং রিষড়া তখন ঐ থানার শাসনাধীন ছিল। ১৮৯৮ খৃঃ জুলাইমাসে বৈদ্যবাটী থানা সিঙ্গুরে পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান বৈদ্যবাটী আউট পোষ্ট পূর্বস্মৃতি বহন করেছে।

'কর্ণওয়ালিসের আমলেই পৃথক হুগলী জেলার সৃষ্টি, বর্দ্ধমানকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করা হল। উত্তর ভাগ রইল খাস বর্দ্ধমান জেলা হিসাবে এবং সমগ্র দক্ষিণ ভাগ হল হুগলী জেলার অধীন। সে হল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

"Under Regulation XXXVI of 1795, Zilla Burdwan was divided into two parts, each under a separate officer."

প্রাচীন বর্দ্ধমানকে কেটে কুটে দুটো জেলা সৃষ্টির কথা সে যুগের মানুষ ছড়ার মাধ্যমে গেঁথে রাখতে ভোলেনি :—

"বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটি, বুড়ীকে নিয়ে ছেলাংকাটি।
রক্ত গেল ছড়াছড়ি, বুড়ীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি॥" ইত্যাদি

এই নূতন হুগলী জেলা বলতে তখন বর্তমান হাওড়া জেলাকেও বোঝাত। ১৮৪৩ খৃঃ হাওড়া হুগলী জেলা থেকে বিছিন্ন হয়ে পৃথক জেলারূপে পরিগণিত হয়। উত্তরপাড়া, হুগলী জেলার ও বালি হাওড়া জেলার অন্তর্ভূক্ত বলে ঘোষিত হয়। (উত্তরপাড়া বিবরণ)

তখন হুগলী জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল—সদর, দারহাট্টা ও ক্ষীরপাই, রিষড়া ছিল দ্বারহাট্টা মহকুমার অধীন। হুগলী জেলা পরবর্তীকালে আরও কাট ছাঁট করে বর্তমান আকারে পরিণত হয়। ১৮৪৬ সালের জুন মাসে জাহানাবাদ (আরামবাগ) মহকুমার সৃষ্টি হয়।

কয়েকটি কু-প্রথা

দেখতে দেখতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পঁচিশ বছর কেটে গেল। রাজ্যপাট তখন তাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ব। কলকাতা তখন ভারতের রাজধাণী। তখনও অনেক কু-প্রথা, বিশেষ করে দাস প্রথা বজায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজরা অনেকগুলো কুসংস্কার ও কু-প্রথার, বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন

এবং আইন করে তার অনেকগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দাস প্রথা সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব।

চন্দননগর, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতায় ক্রীতদাসের বড় বড় আড়ত ছিল এবং তাদের বিক্রয়ের জন্যে গরু ছাগল বিক্রীর মত হাট বসত। অপরাহ্ন তিনটে থেকে হাট বসত। ক্রেতার দল তার পূর্ব থেকেই তাঁদের মনোমত বালক বালিকা, যুবক যুবতী বাছাই করার জন্যে হাটে উপস্থিত হত। তরুণী স্ত্রীলোকের দাম ছিল সব চেয়ে বেশী, প্রায় ষাট টাকা। দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাকে লোকে তখন পেটের জ্বালায় দালালদের কাছে স্ত্রী, পুত্র, বিক্রয় করে দিত। নৌকা বোঝাই শিশু ও যুবতীর দলকে কলকাতায় এনে বিক্রয় করা হত।

দেব মন্দিরে নর বলির সংবাদ তখন মধ্যে মধ্যে শোনা যেত। নরবলি তখন শাস্ত্র সম্মত ও ধর্মমূলক কার্য বলে বিবেচিত হত। রেভারেণ্ড না সাহেব 'কলকাতা রিভিউ, পত্রিকায় লিখেছেন

''Human sacrifices were also frequent were as late 1832'

পুত্র সন্তানের পরিবর্তে পর পর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আঁতুরঘরে প্রসূতির স্তনে বিষ মাখিয়ে শিশু কন্যার হত্যার ঘটনাও বিরল ছিল না।

ওদিকে কলকাতায় তখন একটা নূতন কালচারের (সাংস্কৃতির) সৃষ্টি হচ্ছে যার ঢেউ এসে লাগছে রিষড়ার কূলে কূলে। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ঘোড়ার গাড়ীও তখন কলকাতার রাস্তায় ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপলক্ষে একদিকে কলকাতা এবং বৈষয়িক ব্যাপারে হুগলী কাছারী পর্যন্ত নৌকা যোগে যাতায়াত তখন প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। এমনই করে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হয়ে উনবিংশ শতাব্দির উষার আলো ফুটে উঠতে আরম্ভ করে তার অগ্রদূত হিসাবে যেন শ্রীরামপুরে মিশনারীরা এসে উপস্থিত হন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে।

যদিও তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা কিন্তু সেই প্রসঙ্গে তাঁরা যে সমস্ত জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেন তার গুরুত্ব ছিল সুদূর প্রসারী। বাংলা ভাষায় পুস্তক মুদ্রণ তার মধ্যে অন্যতম। কলে বই ছাপা হয় শুনে শ্রীরামপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা হতবাক। অনেকেই দেখতে ছুটেছিলেন সেই অদ্ভুত জিনিষ। সেই উপলক্ষে লোক মুখে মুখে তাঁদের কাজের প্রশংসা-সূচক যে ছড়াটি এতদঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর ইতিহাস শেষ হয়ে গেল ঃ—

"ধন্য সাহেব কোম্পানী,
বই লেখা হয় কলে,
কলটি যখন চলে
গুরু মশায়ের ব্যবসা মাটি, ঘুচল দানাপানি,
মরি! ধন্য সাহেব কোম্পানী।" ইত্যাদি

॥ সংকেত সূত্র ॥

১। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়।
২। পুরাতনী—হরিহর শেঠ।
৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী,
৪। আনন্দমঠ। — বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৫। কলিকাতার কথা (১ম খণ্ড)। —রায় বাহাদুর প্রমথ নাথ মল্লিক।
৬। মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড। —তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়।
৭। কী করে কলকাতা হলো, —পুর্ণেন্দু পত্রী।
৮। বাংলা অভিধান —সুবলচন্দ্র মিত্র।
৯। মদন মোহন ঠাকুর ও গোকুল মিত্র। —পূর্ণ চন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর।
১০। সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু।
১১। স্মৃতিচারণা (পাণ্ডু লিপি)—৺পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীরকুমার মিত্র।

১৩। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (২য় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ।

১৪। হুগলী জেলার ইতিহাস (রিষড়া) —উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বসুমতী ১৩৪৯)।

১৫। হুগলী জেলার দেব দেউল। —সুধীর কুমার মিত্র।

১৬। বিদেশীদের চোখে বাংলা—চণ্ডী লাহিড়ী।

১৭। নদিয়া কাহিনী—কুমুদ নাথ মল্লিক।

১৮। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার। —ডব্লুই হাণ্টার।

১৯। তিন শতকের কলকাতা। —নকুল চট্টোপাধ্যায়।

২০। দেড়শো বছরের কথা, —ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার (বেতার জগৎ, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৬৭)।

২১। কেরী সাহেবের মুন্সী—প্রথমনাথ বিশী।

—oOo—

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত

ঊনবিংশ
ও
বিংশ শতাব্দী

প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্য গ্রন্থের জন্মভূমি—রিষড়া।

সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে পাদরী কেরী সাহেব যেদিন কলকাতার চাঁদ পাল ঘাটে নেমেছিলেন (১১/১১/১৭৯৩) সেইদিন থেকেই তাঁর সঙ্গে রামরাম বসুর আলাপ পরিচয় এবং তারপর থেকেই বসুজা তাঁর সহকারী বা মুন্সী।

রামরাম বসুর মাহিনা ধার্য হয়েছিল মাসিক কুড়ি টাকা।

উইলিয়ম কেরীর ইচ্ছা ছিল কলকাতায় বসে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ সাধলেন। তাঁরা সরাসরি খৃষ্টধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করে দিলেন। অগত্যা কিছুদিন পরে তিনি মালদহ জেলার মদনাবাটীতে নীলকুঠির ম্যানেজারি পদ গ্রহণ করে কলকাতা ত্যাগ করে যান।

রামবসু যে কুড়িটাকা মাইনে পেতেন তাতে তাঁর সংসার চলে না, কাজেই তিনিও চাকুরীর চেষ্টায় লেগে গেলেন। তিনি চলে এলেন রিষড়ায় এবং সেখানে ডগলাস সাহেবের 'শন' কুঠীতে (Hemp) একটা চাকুরী পেয়ে গেলেন। এবং সেইখানেই বাস করতে লাগলেন।

এর আগেই শ্রীরামপুরে ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতির আগমন ঘটেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তখন শ্রীরামপুর ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক্তিয়ারের বাইরে, খাস ডেনমার্কের রাজার রাজত্ব। বসুজা রিষড়া থেকে প্রায়ই শ্রীরামপুরে গিয়ে মিশনারীদের সঙ্গে দেখা শোনা করতেন এবং তাঁদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতেন।

ইতিমধ্যে কেরী সাহেবও মালদহ থেকে এসে যোগদান করেন শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদের সঙ্গে। সে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

উক্ত ঘটনার কথা রামরাম বসুর ডাঃ রাইল্যাণ্ড সাহেবকে লেখা ১০/২/১৮০১ খৃষ্টাব্দের চিঠির মধ্যেই পাওয়া যায়। কেরী সাহেব

কর্তৃক ঐ চিঠির ইংরেজী অনুবাদের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

RAM BASHOO TO Dr. RYLAND

(Translated by Mr. Carey). Feb. 10. 1801.

Salutation ! ......

"After the missionaries had arrived a long time in Bengal, I heard of them, and went to Calcutta, where I understood that they resided at Serampore. I therefore went thither and visited them, where I heard all particulars, and remained with them for sometime. Soon after this, Mr. Forsyth obtained me a place to live with Mr. Douglas to manage the company's hemp experimental farm, where I have been four or fiive months. Rishra, the plaec where I reside, is near to Serampore ; on which account I have opportunity frequently to visit the missionarios and hear their gospel"...... ..

ইতিমধ্যে, কলকাতায় যে সব ইউরোপীয়ানরা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজে নিযুক্ত হতেন তাঁরা যেমন আইন বুঝতেন না ; দেশীয় ভাষাতেও ছিলেন তেমনিই অজ্ঞ। তাঁদের ভারত শাসনোপযোগী শিক্ষা দেবার জন্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, সে হল ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের কথা। শ্রীরামপুরের পাদরী কেরী সাহেব হলেন উক্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। কিন্তু তৎকালে সাহিত্য বলা যেতে পারে এমন কোন বাংলা গদ্য বই ছিল না কারণ সাহিত্যের উপযুক্ত বাংলা গদ্য ভাষার তখনও সৃষ্টি হয়নি। বাংলা সাহিত্য বলতে কেবল কাব্য গ্রন্থই ছিল। এই অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভব করেছিলেন মহাত্মা কেরী। তিনি তখন তাঁর সহকর্মী রামরাম বসু প্রভৃতিকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য পুস্তক রচনার ভার দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত পুস্তক রচনায় সাহায্য করার জন্যে কতিপয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন।

ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা ১৫/৬/১৮০১ পত্রে উইলিয়ম কেরীর তৎকালীন মনোভাবের এবং রামরাম বসু কর্তৃক লিখিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র পুস্তকটিই যে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় :—

"When this appointment was made, I saw that I had very important charge committed to me, and no books or help of any kind to assist me. I therefore set about compiling a grammar, which is now half printed, I got Ram Bosu to compose a history of one of their kings, the first prose book ever written in the Bengali language, which we are also printing"

উক্ত পুস্তকটি ছাপা হয় শ্রীরামপুরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। সেকথা পুস্তকটির আখ্যাপত্রেই উল্লিখিত আছে। এই পুস্তকটিই যে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ, এ সত্য সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের কষ্ঠিপাথরে যাচাই হয়ে গেছে।*

অধ্যাপক মনোমহন ঘোষ মহাশয় তাঁর সংকলিত উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় যে বিষদ আলোচনা করেছেন তা থেকে আরও একটি তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তিনি লিখেছেনঃ—উইলিয়ম কেরী অন্য সকলের সঙ্গে রাম বসুকে (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে) মাসিক ৪০ টাকা বেতনে শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন।

---

*"কিন্তু সম্প্রতি সুধীর কুমার মিত্র তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে (তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত) 'ধর্মপুস্তক' এই সম্মানের দাবী রাখে। এই বই ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়।" (আনন্দ বাজার পত্রিকা ১৮/৯/১৯৪৯)

উক্ত তথ্য যদি সত্য হয় তা হলে বলতে হয় যে কেরী সাহেব এই পুস্তকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। থাকলে, তিনি ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখিত উপরোক্ত পত্রে নিম্নরেখ মন্তব্য করতেন না নিশ্চয়ই।—লেখক।

রাম বসুর দ্বারা রচিত হল রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। এই বইখানি বাংলা হরফে ছাপা বাঙালীর লেখা সর্বপ্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ। এই বইখানি রচনা করে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ রাম বসুকে ৩০০ শত (সিক্কা) টাকা পারিতোষিক দেন।

এক্ষুদ্র বইএর রচনায় ছ'মাস সময় লেগেছিল। (সম্ভবতঃ জানুয়ারী থেকে জুন) এত দীর্ঘ সময় লাগতে দেখে এখনকার লোকের আশ্চর্য্যান্বিত হবার কথা, কিন্তু তখনকার পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করলে এত দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা অস্বাভাবিক মনে হবে না, কারণ যে সময় ধরে তিনি এ পুস্তক রচনা করেন সে সময়ের বেশীর ভাগই তাঁকে রিষড়ার শন কুঠিতে কাজ করতে হত। তিনি যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুস্তক রচনা করেছিলেন এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এবং ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা রাম বসুর ১০/২/১৮০১ তারিখের পত্র থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রিষড়ার শন কুঠির কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুস্তকখানি রচনা করেন এবং সেই সময় তিনি রিষড়াতেই বাস করতেন। সম্ভবতঃ হেষ্টিংস হাউসে।

কাজেই এই সিদ্ধান্ত সমীচীন যে বাঙালী কর্তৃক রচিত প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্য গ্রন্থের জন্ম স্থান রিষড়া।

রিষড়ার তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হেষ্টিংস হাউস বা লজ ছাড়া ডগলাস সাহেবের মত একজন ইউরোপীয়ানের বাসোপযোগী অন্য কোনও অট্টালিকার অস্তিত্ব ছিল না। থাকলেও একথা ভুললে চলবে না যে একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়ানকে আপন বাসগৃহে স্থান দেওয়া তখনকার দিনের সংস্কার বিরুদ্ধ ছিল। হেষ্টিংসলজের পরবর্তী ইতিহাস হলঃ— 'ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আসন্ন অবসর গ্রহণ কালে ১৭৮৪ খৃ তাঁর অধিকৃত হেষ্টিংস হাউস ও তৎসংলগ্ন ১৩৬ বিঘা জমি ১০,০০০ হাজার টাকায় নিলামে বিক্রয়

করা হয়। ১৭৮৭ খৃঃ ঐ সম্পত্তি আবার ২০,০০০ টাকায় বিক্রী হয়। তারপর থেকেই ঐ অট্টালিকা সমেত বিস্তৃত ভূখণ্ড বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হতে থাকে। সে ভাড়ার হারও ছিল বেশ উঁচু। মিঃ ওম্যালী সাহেব তাঁর হুগলী জেলা বিবরণীতে লিখেছেন যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া ছিল ২৪০০ টাকা (মাসিক দুই শত টাকা)

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডগলাস সাহেব যখন রিষড়ায 'শন কুঠী' স্থাপন করেন তখন তাঁর বসবাসেব জন্য উক্ত সুরম্য অট্টালিকাটি ভাড়া নেওয়াই স্বাভাবিক, এবং রাম বসুও ঐ বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে বাস করতেন। ঐ বাড়ীটি যে তৎকালে কলকাতার বিবাহিত ইউরোপীয় নব দম্পতির হনিমুন যাপনেব জন্যেও ভাড়া পাওয়া যেত, সে তথ্য প্রমথনাথ বিশী রচিত 'কেরী সাহেবের মুন্সী' নামক পুস্তকেও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

রিষড়ায় কথকতা

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে যে শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার কল্পে বিভিন্ন ভাষায় 'সুসমাচার' মুদ্রিত হয়েছিল তাই নয়, রামায়ণ ও মহাভারত ছাপাও বাদ যায় নি। এই দু'খানা পুঁথিই ছিল তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৮০২ খৃঃ মুদ্রিত হবার পর থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রদীপের আলোয় মুদির দোকান থেকে আরম্ভ করে চণ্ডী মণ্ডপে জলচৌকির ওপর রেখে পড়া হত। হাতে লেখা রামায়ণ এর বিভিন্ন আখ্যান বস্তু নানা রস ও সুর সংযোগে পরিবেশিত হত কথকতার মাধ্যমে নিরক্ষর ও স্বাক্ষর জন সমাজে।

স্বভাবতই প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ভাষান্তর ঘটে গিয়েছিল লিপিকর দোষে আবার কথকদিগের সুবিধা মত মনোরঞ্জনকারী প্রক্ষিপ্ত বিষয় বস্তুর সমন্বয়ে। তাই মিশনারীরা বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ারলুপ্ত

রাম বসুর দ্বারা রচিত হল রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। এই বইখানি বাংলা হরফে ছাপা বাঙালীর লেখা সর্বপ্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থ। এই বইখানি রচনা করে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ রাম বসুকে ৩০০ শত (সিক্কা) টাকা পারিতোষিক দেন।

এক্ষুদ্র বইএর রচনায় ছ'মাস সময় লেগেছিল। (সম্ভবতঃ জানুয়ারী থেকে জুন) এত দীর্ঘ সময় লাগতে দেখে এখনকার লোকের আশ্চর্য্যান্বিত হবার কথা, কিন্তু তখনকার পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করলে এত দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা অস্বাভাবিক মনে হবে না, কারণ যে সময় ধরে তিনি এ পুস্তক রচনা করেন সে সময়ের বেশীর ভাগই তাঁকে রিষড়ার শন কুঠিতে কাজ করতে হত। তিনি যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুস্তক রচনা করেছিলেন এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এবং ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লেখা রাম বসুর ১০/২/১৮০১ তারিখের পত্র থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রিষড়ার শন কুঠির কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' পুস্তকখানি রচনা করেন এবং সেই সময় তিনি রিষড়াতেই বাস করতেন। সম্ভবতঃ হেষ্টিংস হাউসে।

কাজেই এই সিদ্ধান্ত সমীচীন যে বাঙালী কর্তৃক রচিত প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্য গ্রন্থের জন্ম স্থান রিষড়া।

রিষড়ার তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে হেষ্টিংস হাউস বা লজ ছাড়া ডগলাস সাহেবের মত একজন ইউরোপীয়ানের বাসোপযোগী অন্য কোনও অট্টালিকার অস্তিত্ব ছিল না। থাকলেও একথা ভুললে চলবে না যে একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয়ানকে আপন বাসগৃহে স্থান দেওয়া তখনকার দিনের সংস্কার বিরুদ্ধ ছিল। হেষ্টিংসলজের পরবর্ত্তী ইতিহাস হল:— 'ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আসন্ন অবসর গ্রহণ কালে ১৭৮৪ খৃ তাঁর অধিকৃত হেষ্টিংস হাউস ও তৎসংলগ্ন ১৩৬ বিঘা জমি ১০,০০০ হাজার টাকায় নিলামে বিক্রয়

করা হয়। ১৭৮৭ খৃঃ ঐ সম্পত্তি আবার ২০,০০০ টাকায় বিক্রী হয়। তারপর থেকেই ঐ অট্টালিকা সমেত বিস্তৃত ভূখণ্ড বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হতে থাকে। সেভাড়ার হারও ছিল বেশ উঁচু। মিঃ ওম্যালী সাহেব তাঁর হুগলী জেলা বিবরণীতে লিখেছেন যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া ছিল ২৪০০ টাকা (মাসিক দুই শত টাকা)

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ডগলাস সাহেব যখন রিষড়ায় 'শন কুঠী' স্থাপন করেন তখন তাঁর বসবাসের জন্য উক্ত সুরম্য অট্টালিকাটি ভাড়া নেওয়াই স্বাভাবিক, এবং রাম বসুও ঐ বাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে বাস করতেন। ঐ বাড়ীটি যে তৎকালে কলকাতার বিবাহিত ইউরোপীয় নব দম্পতির হনিমুন যাপনের জন্যেও ভাড়া পাওয়া যেত, সে তথ্য প্রমথনাথ বিশী রচিত 'কেরী সাহেবের মুন্সী' নামক পুস্তকেও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

রিষড়ায় কথকতা

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থে'কে যে শুধু খৃষ্টধর্ম প্রচার কল্লে বিভিন্ন ভাষায় 'সুসমাচার' মুদ্রিত হয়েছিল তাই নয়, রামায়ণ ও মহাভারত ছাপাও বাদ যায় নি। এই দু'খানা পুঁথিই ছিল তখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৮০২ খৃঃ মুদ্রিত হবার পর থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রদীপের আলোয় মুদির দোকান থেকে আরম্ভ করে চণ্ডী মণ্ডপে জলচৌকির ওপর রেখে পড়া হত। হাতে লেখা রামায়ণ এর বিভিন্ন আখ্যান বস্তু নানা রস ও সুর সংযোগে পরিবেশিত হত কথকতার মাধ্যমে নিরক্ষর ও স্বাক্ষর জন সমাজে।

স্বভাবতই প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ভাষান্তর ঘটে গিয়েছিল লিপিকর দোষে আবার কথকদিগের সুবিধা মত মনোরঞ্জনকারী প্রক্ষিপ্ত বিষয় বস্তুর সমন্বয়ে। তাই মিশনারীরা বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ারলুপ্ত

ইত্যাদি দোষ সংশোধন করার ভার দেন জয় গোপাল তর্কালঙ্কারের ওপর। তিনি শুধু বর্ণচ্যুতিও বর্ণশুদ্ধি সংশোধন করেন নি, গোটা রামায়ণের প্রাচীন ভাষা নানাভাবে মেজে ঘষে আধুনিক যুগের পাঠোপযোগী করে তোলেন। শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণ নয়, কাশীরাম দাসের সমগ্র মহাভারতও তিনি এইভাবে সংস্কার সাধন করেন।

কথকতাই ছিল তখন জনশিক্ষা প্রসারে একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি। প্রাচীন বাংলার এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার লোকশিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কথকতার অবদান অনবদ্য ও অতুলনীয়। বস্তুতঃ এই কথকতা ছিল পুরাপুরি বাগ্মীতার কাজ এবং পুরুষানুক্রে যে একই সঙ্গে আমোদ, আনন্দ ও শিক্ষা দান করে এসেছে।

কথকগণ সাধারণতঃ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, রামের বনবাস, সীতা সাবিত্রীর দুঃখভোগ, সতীর দেহত্যাগ, ধ্রুব, প্রহ্লাদের ভগদ্ভক্তি রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতা প্রভৃতি কাহিনী ভাবভক্তি সহকারে শোনাতেন আর শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধচিত্তে ভক্তি, বিশ্বাস প্রেমভাবে বিগলিত হতেন। কথকঠাকুরের কণ্ঠস্বর ও মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হত এবং দু চোখ জলে ভরে উঠত।

রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির প্রাঙ্গনে তখন এই ধরণের কথকতা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত। পুরুষ ও মহিলারা দুদিকে দুভাগ হয়ে বসতেন। এক্ষেত্রে চিক্ টাঙ্গিয়ে পর্দা রক্ষার প্রয়োজন দেখা দিত না।

করুণ রসের মধ্যেও কথকঠাকুর মাঝে মাঝে ছেলে ভোলান হাস্যরসের অবতারণা করতেন। হনুমানের গা চুলকানো, লেজ নাড়ার কৌশল, কখন বা তার মূর্খতার উদাহরণ দিয়ে তিনি আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে হাসিয়ে তুলতেন।

মহীরাবণ বিভীষণের মায়ারূপ ধারণ করে হনুমানকে ঠকিয়ে যেদিন রামলক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন

বীরদর্পী রামভক্ত হনুমান যে ভাবে ক্ষোভে দুঃখে মর্মান্তিক বেদনা বোধ করেছিল তার বোধহয় তুলনা নেই। সেই কথাই বলছিলেন কথকঠাকুর সেদিন। ছোট জল চৌকির উপর লালরংয়ের কাপড়ে জড়ান তুলট কাগজে লেখা পুঁথিখানা মাঝে মাঝে একবার তিনি দেখছেন আর মুখে বলে যাচ্ছেন সেই কাহিনী, নাদুস নুদুস গৌরকান্তি, সুগন্ধি মল্লিকার মালা মাথায় শোভা পাচ্ছে, গলায় দুলছে একটা পাঁচফুলে গাঁথা মালা, সামনে জ্বলছে একটা কাঁচের ঢাকনা দেওয়া সেজবাতি। মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি অনেক পূর্বেই শেষ হয়েছে। আজকের কথকতা উপলক্ষে সিধা দিয়েছে বোধহয় দেওয়ানজী বাড়ী থেকে। কাল দিয়েছিলেন পালেরা। এমনি ভাবে এক'একদিন এক এক পরিবার থেকে সিধা দেবার ব্যবস্থা হত। তার উপর কথা শেষে থালায় পড়ত প্রণামী, বেশীর ভাগই সিক্কা পয়সা। তখনও আধলা বা সিকি পয়সার প্রচলন হয়নি।

কথকতা শেষে শ্রোতারা সকলে হরিধ্বনি ক'রে উঠলেন। কথকঠাকুর তখন গামছায় মুখ মুছে সেদিনকার মত পালা শেষ করলেন, আর কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গুণ গান করতে করতে পুঁথিখানা লাল শালুতে চৌদ্দপাকে সুতাদিয়ে জড়িয়ে ফেললেন।

ভক্তিগদ গদ চিত্তে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কথকঠাকুরকে প্রণাম করে সাধ্য-মত প্রণামী দিলেন, আর মায়ের মন্দিরে প্রণামান্তে যে যার পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গ ধরলেম। জ্যোৎস্নার আলোকে তখন পথের অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা শব্দকে চাপা দিয়ে পথের পাশে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে প্রহরজাগা শিয়ালের ডাক শোনা যায়, — সমস্বরে হুয়া, হুয়া রব।

বলা বাহুল্য, এইধরণের কথকতা তখন অন্যত্রও হত এবং যাঁরা শুনতেন তাঁদের মনে সেইসব বিষয়বস্তু ও সারমর্ম গভীরভাবে রেখাপাত করত এবং স্বভাবতই ধর্মভাব জাগিয়ে তুলত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রিষড়ার বহু বিশিষ্ট বাড়ীতে, বিশেষ ক'রে কালীমাতার মন্দিরে কথকতার প্রচলন ছিল। যে সমস্ত কথকঠাকুর দীর্ঘকাল ধ'রে বৎসরের পর বৎসর কথকতার মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ ক'রে তাঁদের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'লক্ষ্মী কথক' ও 'শশীকথকের' (বাবুগঞ্জ) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে

কথকতা অবশ্য বারমাস হতনা তাই শুভ্র শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধেরা গিয়ে বসতেন গঙ্গার ঘাটে, বিশেষ করে দাঁয়েদের পাকা ঘাটে, পরস্পর আলাপ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার মনোরম দৃশ্য উপভোগ এবং পবিত্র সুশীতল বায়ুসেবন দুই-ই এক সঙ্গে সম্পাদিত হত।

সব ঋতুতেই গঙ্গার দৃশ্য ছিল অপরূপ। বর্ষাকালে দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গার জল উঠত কানায় কানায়—ঘোর গেরুয়া রং টক টক করছে। তার উপর সাদা গোলাপী, বাদামি রংয়ের পাল তোলা ইলিশমাছের নৌকাগুলো এদিক ওদিক দুলে দুলে চলেচে—মাঝিদের একহাতে হুকো, তাই হাতের বদলে পায়ের সাহায্যে দাঁড় টানছে,—সে এক অপরূপ দৃশ্য।

যেদিন গঙ্গার উপর মেঘ করত, দেখতে দেখতে আধখানা গঙ্গা কালো হয়ে যেত, বাকি আধখানা ধবধব করছে। জেলে ডিঙ্গিগুলো তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে লাগত, ঝড় ওঠার লক্ষণ দেখে। বৃদ্ধেরাও তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেন, নিকট বর্ত্তী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

অন্য সময়ে তরঙ্গহীন গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি। ঘাটের কাছে ছোট খাট ঢেউ এসে লাগছে আর নোঙর করা নৌকোগুলো একই ভাবে তালে তালে হেলে দুলে উঠছে।

কান পেতে শুনলে মনে হয় যেন ঐ ধ্বনি কথা বলছে। শোনাতে চায় কত পুরাতন সুখ দুঃখের কাহিনী, কত হাসি-কান্নার গান। কত নববধূর নৌকাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠা শুভ শঙ্খধ্বনি, নবপত্রিকা স্নানের ঢাক ঢোল ও কাঁসির মিশ্র ঐকতান। আবার স্বামীহারা পুত্রহারা রমণীর মর্মভেদী আর্তনাদ।

কত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জাতীয় সংস্কৃতির গল্প কাহিনী যেন আঁকা আছে এইসব ঘাটের সোপানে সোপানে। এক এক ঘাটের ইতিহাস যদিও ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু একই গঙ্গা ছুটে চলেছে এইসব ঘাটগুলোর কোল ছুঁয়ে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাড়গুলো সৃষ্টি করেছে জল ও স্থলের গলাগলি ভাব।

এই ঘাটে বসেই শোনা যেত সে যুগের কলকাতা কালচারের নিত্য নূতন কাহিনী। তখন না ছিল সংবাদ পত্র, না ছিল বেতারযন্ত্র। দিনান্তে নৌকার মাঝিরা সব দাঁ ঘাটের পাশে ফিরে এসে শোনাত তাদের সংগৃহীত বিচিত্র কাহিনী। বৃদ্ধেরা সেইসব কাহিনী শোনাতেন পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে।

সন্ধ্যাসমাগমে, সন্ধ্যা বন্দনার তাগিদে উঠে পড়তেন ব্রাহ্মণ ও দীক্ষিতেরা। এরপরও বসে থাকতেন দু'চারজন, ঘাটটা আরও একটু ফাঁকা হয়ে গেলে ছোট কলকেয় বড় তামাকের ধোঁয়া তুলতেন, দু চার হাত ঘোরার পর টানের চোটে কলকেটা দপ করে জ্বলে উঠত।

ওপারে বেজে উঠত শ্যামসুন্দরজীউর সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা। কখনও বা খোল করতালের ঐকতান। ঘাটের উপরে পশ্চিম দিকের বড় বড় অশ্বত্থ গাছের মাথায় নেমে আসত ঘন অন্ধকার।

নবীন ও প্রবীন ভাবধারা

ঊষাকালীন আলো-আঁধারি দ্বন্দ্বের মতই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই নবীন ও প্রবীন ভাবধারার মধ্যে একটা সংঘাতের

সূত্রপাত হয়। বহুবিধ সামাজিক বিধানের উপর পাশ্চাত্য সমালোচনার কঠোর মন্তব্য বর্ষিত হতে থাকে। যুক্তিবাদী মানসিকতা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

শ্রীরামপুরে মিশনারীদের চেষ্টায় কিছু কিছু হিন্দু মুসলমান খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করলেও রিষড়ায় অধিবাসীদের মধ্যে কেউ তৎকালে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মিশনারিগণ মাহেশের অন্তর্গত জাননগর নামক স্থানে সেওড়াফুলির রাজাদের কাছ থেকে মোকররি গ্রহণ ক'রে সেখানে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত দেশীয় খৃষ্টানদের বসবাসের জন্যে গৃহাদি নির্মাণ, ভজনালয় এবং বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। কথিত আছে জন মার্শম্যানের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম জননগর বা জাননগর রাখা হয়।

রিষড়ায় চড়কপর্ব।

১৮০৩ খৃঃ চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূর্বপ্রথানুযায়ী শ্রীরামপুরে একজন সন্ন্যাস ব্রতধারী চড়কগাছে ঘোরবার সময় পিঠের মাংস ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় দিনেমার সরকার ঐ নৃশংস প্রথা বন্ধ করে দেন। সেই থেকে শ্রীরামপুরে চড়ক পূজা বন্ধ হয়ে যায়।

রিষড়ার ৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির প্রাঙ্গনে কিন্তু তখনও চড়কে বাণ ফোঁড়া চলতে থাকে বিনা বাধায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম থেকে বহু সন্ন্যাসীরা এসে গাজনের শিবপূজা করে নৃত্যগীতে সেই স্থান মুখরিত করে তুলতেন এবং উত্তরীয় ত্যাগ ক'রে তাঁদের একমাস-কালীন ব্রত উদ্‌যাপন করতেন। কালক্রমে সে প্রথা তিরোহিত হয়, সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খৃঃ তারকেশ্বর রেল লাইন খোলার পর থেকে। পদব্রজে যাতায়াতের বিপদাশঙ্কাও তখন বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল ইংরেজ শাসনের গুণে। চড়ক গাছটা পার্শ্ববর্ত্তী কালী পুষ্করিণীতে সেকালে কুমীরের মত ভেসে বেড়াত।

গাজন উৎসব আসলে শৈব উৎসব হরকালীর বিবাহই প্রকৃত

ব্যাপার। সন্ন্যাস ব্রতধারীরা সব বরযাত্রী। তাদের 'গর্জন' থেকেই নাকি 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি। সংক্রান্তির পূর্বদিন রিষড়ার পুত্রবতী রমণীরা নীলের উপবাস ক'রে সন্ধ্যাসমাগমে কালীমাতার মন্দিরে গাজনের শিবের পূজাদিয়ে, প্রদীপ জ্বেলে তারপর জলগ্রহণ করতেন। আজও সে প্রথা বজায় রয়েছে নীল ষষ্ঠীর উপবাস হিসাবে।

'নীলের ঘরে দিয়ে বাতি, জল খাওগে পুত্রবতী'॥

গাজন উৎসব আজ নানাকারণে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরা আজও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ান। চাল, পয়সা ও ফলমূলাদি দিয়ে গৃহিণীরা তাদের বোম ভোলানাথের সেবায় অংশ গ্রহণ করে পুণ্য সঞ্চয় করে থাকেন।

তখনকার দিনে সন্ন্যাসীদের মুখে শোনা যেত—ব্যোম বোম ভোলা মহেশ্বর রব, বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে— মহাদে-ব। বাবা তারক নাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদে-ব। ইত্যাদি

"ব্যোম্ ভোলা, ব্যোম ভোলা,
ভোলা বড রঙ্গিলা
লেংটা ত্রিপুরারী, শিরে জটাধারী,
ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা॥" ইত্যাদি

৺কালীমাতার মন্দিরে তখন কেউ কেউ গঙ্গা থেকে স্নান করে দণ্ডী খাটতে খাটতে এসে উপস্থিত হতেন —'মানত-রক্ষা' করতে। কারও বা দেবতার ভর হত। কখনও বা নিজমুখে নিজের দোষত্রুটি প্রকাশ পেত। মায়ের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে তবে অব্যাহতি পেত। কঠিন পীড়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাই ছিলেন এক মাত্র ভরসা। ডাক্তার বদ্যি ছিল অত্যন্ত বিরল। ঠাকুর দেবতার চরণামৃত পান করে অনেকে তখন রোগমুক্ত হতেন। আপদে বিপদে সুখে সম্পদে, তাই সকলে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার শরণাপন্ন হতে ভুলতেন না।

পাল্কী চলে তুলকি চালে

শুভ বিবাহে নবদম্পতী ৺ কালীমাতার মন্দিরে প্রণাম করে তবে স্বগৃহে প্রবেশ করত। মোটর বা রিক্সার ব্যবহার ছিল তখন কল্পনাতীত। পাল্কীর তখন জয় জয়কার। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে পাল্কীই ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম। অবস্থানুযায়ী অবশ্য পাল্কীর সাজ গোজ হত স্বতন্ত্র। বিত্তবানদের পুত্রের বিবাহে চতুর্দোলার ব্যবস্থা ছিল। 'বাজনাটা' ছিল সর্বজনীন। আর কিছু হক, বা না হোক ঢোল, কাঁশি আর সানাইএর বাজনা ছিল অপরিহার্য।

'ধাককু নাবড় হেঁইয়া নাবড়' রবে দূর থেকে ভেসে আসে পাল্কী আসার শব্দ। ছেলে, বুড়ো আদি করে কুললক্ষ্মীরা সকলে এসে জমায়েত হয় কালীতলায়। অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে তারা তাকিয়ে থাকে পাল্কীর রুদ্ধ দরজার দিকে। উলুধ্বনি শব্দে নববধূর আগমনের সংবাদ জানিয়ে দেয় পাড়াপড়শীদের কাছে।

তারপর আত্মীয় স্বজনেরা খুলে দেয় দরজাটা। রাঙা টুকটুকে পদ্মপাপড়ির মত পা দুটো প্রথম বেরিয়ে আসে, তারপর রাঙা চেলী পরা নতুন বৌ। কপালে যুঁই ফুলের পাপড়ির মত চন্দনের ফোঁটা। সলাজ হাসিটুকু ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে—বর্ষীয়সীরা এগিয়ে এসে ঘোমটা খুলে মুখখানা ভাল করে দেখেন। নববধূর আঁখি দুটো যায় মুদে। বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে সুখ্যাতি বা অখ্যাতি শোনার অপেক্ষায়, পিছনে পিছনে এগিয়ে আসে বর।

মায়ের মন্দিরে উঠে গিয়ে প্রণামী দিয়ে আবার ফিরে আসে পাল্কীতে। চার-বেহারা, যারা এতক্ষণ দম নিচ্ছিল তারা আবার কাঁধে তুলে নেয় পাল্কীটা, আবার তাদের কণ্ঠে বেজে উঠে সেই পরিচিতি সুরের ধ্বনি। ধ্বনিটা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যায়। ছেলের দল, কিছুটা দূর তাদের পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে, ফিরে আসে আবার নিজেদের খেলার জায়গায়।

সে যুগে পর্দাপ্রথা ছিল চৌদ্দ আনা ; অর্থাৎ একগলা ঘোমটা তখন নাকের ডগায় এসে পৌঁছেছে। শুধু পর্দা রক্ষাই নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিনীদের গঙ্গাস্নান করতে পাল্কী চেপে যেতে হত। পাশে পাশে যেত বাড়ীর পুরানো ঝি, চাকরেরা। পাল্কীতে না গেলে তাঁদের মানসম্ভ্রম বজায় থাকত না।

পাল্কী বেহারারা তখন তাদের পাল্কী নিয়ে ভাড়া খাটার জন্যে জমায়েত হত রিষড়ার পশ্চিম প্রান্তে পুরানো বটতলায়, বামুনআড়ির সংযোগ স্থলে। প্রযোজন মত, তাদের পূর্বে সংবাদ দিয়ে রাখলে যথাসময়ে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হত। রিষড়া রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপিত হবার পর, দু'চারখানা পাল্কী অপেক্ষা করত ৩নং গেটের কাছে, জোড়া বট ও অশ্বত্থ গাছের তলায। দু'একখানা ঘোড়ার গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে শ্রীরামপুরে — মিশনারীদের ব্যবহারের জন্যে, আর জমিদারবাবুদের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে।

যদিও ইতিপূর্বে আমাদের দেশের দুলে বাগদীরাই পাল্কী বেহারার কাজ করত কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যারা এই কাজ করত তারা কিন্তু বাঙালী নয, উড়িষ্যাবাসী। শুধু পল্লীগ্রাম নয়, খাস কলকাতাতে পাল্কীর ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হ্যাডলী সাহেব লিখেছিলেন —

"The palanquin is so necessary an article at Calcutta that even European artificers keep them."

পাল্কী চড়া তখন খুব আরাম প্রদই ছিল। তলায় শক্ত বেতের বুননের উপর পাতলা গদী পাতা থাকত। বেহারাদের ছোটার তালে তালে পাল্কীও দুলত, দোলন ছন্দে।

কবি সত্যেন্দ্র নাথ প্রখর রৌদ্রে পাল্কী চলার গান রচনা করে গেছেন পারিপার্শ্বিকের পটভূমিকায় :—

"পাল্কী চলে,

পাল্কী চলে—

গগন তলে
আগুন জ্বলে।
শুদ্ধ গাঁয়ে আদুড় গায়ে—
যাচ্ছে কাবা—
রৌদ্রে সারা!
ময়রা মুদি চক্ষু মুদি
পাটায় বসে
ঢুলছে কসে।" ইত্যাদি

হ্যাঁ, ময়রা আর মুদির দোকান রিষড়ায় তখন কয়েকখানা হয়েছে বৈকি! তা নাহলে গ্রামবাসীদের চাহিদা মিটবে কিসে? বেনেতি মশলা আর মুদির দোকান চাই-ই, চাই। মনোহারী দোকানের প্রয়োজন ছিল তখন সামান্য।

কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে দোকানী উঠে পড়ত। তারপর শৌচান্তে আটহাতি কাচা কাপড়খানা পরে দোকানের ঝাঁপ তুলে দিত বাঁশের খুঁটির মাথায়। তারপর ধুনা গঙ্গাজল দিয়ে শুভ বউনির অপেক্ষা করত। অসংযত জিনিষগুলো আবার সযত্নে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলত মাটির গামলায় মন্দির চূড়ার মত। দাঁড়ি পাল্লা আর ছোট হাত-বাক্সতে গঙ্গাজল বুলিয়ে দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিত। অবসর পেলে হুকোর বাশি জলটা ফেলে দিয়ে নূতন ক'রে জল ভরে নিত।

ব্যবসায় মধ্যে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত ব্যবহার সে যুগেও ছিল বটে কিন্তু লোকের মনে তখন পাপের ভয় ছিল। তণ্ডুল প্রভৃতিতে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করলেও ক্ষতিকর ভেজাল দেওয়ার কার্যে তখনও লোকে হাত পাকায়নি, তার কারণ বোধহয় বর্তমান যুগের মত তখন ব্যবসায়ীদের পিছনে ঝানু রসায়নবিদ পরামর্শদাতার সম্ভাব ছিল না।

পাইকারী দরে জিনিষপত্র ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ সেওড়াফুলি হাট থেকে ক্রয় করতেন, সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ শনি ও মঙ্গলবার পণ্য বোঝাই নৌকাগুলি এসে জমত রিষড়ার ঘাটে।

১৮২১ খৃঃ হুগলী জেলার দ্রব্য মূল্যের তালিকা ছিল নিম্নরূপঃ

দ্রব্য	প্রতিমণ
সুপারী	তিন টাকা বার আনা—তিন টাকা চৌদ্দ আনা
ভেবেণ্ডা তৈল...	উনিশ টাকা—কুড়ি টাকা
নারিকেল তৈল...	তের টাকা—তের টাকা আট আনা
বালাম চাউল··	এক টাকা বার আনা—এক টাকা তের আনা
উত্তম গাওয়া ঘৃত···	একুশ টাকা—একুশ টাকা আট আনা
মিছরী উত্তম...	ষোল টাকা, মধ্যম, তের—চৌদ্দ টাকা
কাশীর চিনি...	নয় টাকা—নয় টাকা আট আনা
তেঁতুল...	এগারো—বার আনা
তামাক···	তিন টাকা আট আনা—ছয় টাকা

বিলাতী পণ্য দ্রব্য

বিলাতী পণ্য দ্রব্যের ব্যবহার ছিল তখন অত্যন্ত সীমিত। শ্রীরামপুরে দিনেমার কোম্পানীর আমদানি কৃত দ্রব্যাদি তখন দালাল মারফৎ এতদঞ্চলে বিক্রী হতে থাকে। দালালদের কাজ ছিল বিলাতী দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা কিন্তু কলকাতার বাজারে তখন খাঁটি ইউরোপীয় দ্রব্য পাওয়া সহজ ছিল না। তার কারণ বিলাতী ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম খুব সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে এদেশীয় লোকের সামাজিক রীতি নীতি এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অনুকূল জিনিষপত্র প্রস্তুত ক'রে পাঠাতে আরম্ভ করে। এসম্বন্ধে প্রমথ নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর 'কলিকাতার কথা' (আদি কাণ্ড) নামক পুস্তকে 'মিল' সাহেবের মন্তব্য থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার কয়েক ছত্র হল নিম্নরূপ :—

"The company was repeatedly pressed by manufacturers at home to export larger quantities of English cloth and other

commodities, and was compelled in self-defence to yield to this pressure, although the Directors knew that it was almost impossible to create a market for the English goods in India, if the use of the articles in question chanced to be contrary to the customs and religious tenets of the natives. The climate moreover, rendered woolen clothes unsaleable ... ...the two great abstacles which met the Company at every turn were the extreme poverty of the people and their very strict caste rules."

উপরোক্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে "কলকাতা ও তার আশে-পাশের দেশীয় উৎপাদকেরা পণ্যাদি প্রস্তুত ক'রে বিলিতী কোম্পানীর লেবেল মেরে বাজারে ছাড়ত। ইচ্ছা করে যে তাঁরা ঠকাতেন তা নয়, খরিদ্দাররা বিলিতী জিনিষ শুনলে বেশি দাম কবুল করতেন সহজেই। দোকানদাররাও রেডি মার্কেটের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিত।"

শ্রীরামপুরে তখন তৈরি হত সুগন্ধি তেল, সাবান, টুথব্রাস ইত্যাদি। এমনি করে কতক খাঁটি কতক কৃত্রিম বিদেশী ভোগ্য পণ্য এতদঞ্চলের বাজারে স্থান ক'রে নিয়েছিল এবং ক্রমশঃ বিলাতি দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যদ্রব্য পিছিয়ে পড়তে পড়তে জনমানসে সমাদর চ্যুত হয়ে পড়ে।

বিলাত থেকে আমদানি কৃত দ্রব্য তালিকায় তখন 'মদ' ও স্থান পেয়েছিল এবং তার ব্যবহার শিক্ষিত ভদ্রসমাজে অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তার বিষময় ফল নিবারণ করতে এবং ব্যবহার সঙ্কুচিত করতে সমাজসেবীদের যথেষ্ট সময় ও ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'মদ খাওয়া বড় দায়,' জাত থাকার কি উপায়, 'সুরাপান না বিষপান' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেই সে যুগের মদের নেশা ও তার কুফলের চিত্র অ কিত হয়ে আছে।

ভূমিকম্প।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সকালে শ্রীরামপুর, রিষড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তীব্র ভূমিকম্পের ফলে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

তখন অধিকাংশ অধিবাসীদেরই ছিল মাটির ঘর। পাকাবাড়ী বলতে পাকড়াশী (নবীন পাকড়াশী লেনস্থ) দেওয়ানজী, দাঁয়েদের, পালেদের এবং হড় মহাশয়দেরই ছিল উল্লেখ যোগ্য। আর যাঁদের ছিল তাদের মধ্যে শীলেদের পাকা বাড়ীও গণ্য হত। অপরাপর যে দু'একখানা বাড়ী ছিল সেগুলো ঠিক অট্টালিকার মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। ১৮৪৫ খৃঃ 'কলকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায় উল্লেখ আছে যে —
"A few brick-built houses are to be seen in the village of Rishra"

সে যুগে অধিকাংশ বাড়ীই হত দক্ষিণ দুয়ারি এবং বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর নির্মিত। এখনকার মত দু'এক কাঠা জমির উপর কোনও বাড়ীই তৈরী হত না। বাস্তু সংলগ্ন একটা পুষ্করিণী অন্ততঃ থাকত, কোথাও বা সদর, খিড়কী ভেদে দুটী পুষ্করিণী দেখা যেত। খিড়কীর পুকুর একান্ত ভাবে স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত থাকত।

দক্ষিণ দিক থেকে এদেশে সমুদ্রের বাতাস বয় বলে অধিকাংশ বাড়ীই দক্ষিণ মুখী করা হত, অন্যথায় পূর্বদাবী। কথায় বলে :—

"দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা, পূর্বদ্বারী তাহার প্রজা।
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই, পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই॥"

বাড়ীর পূর্বদিকে সাধারণত পুকুর ও পশ্চিমে বাঁশ ঝাড় থাকত। "পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ খোলা।"

মাটির দেওয়াল ও উলু খড়ের ছাউনি যুক্ত ঘরের সংখ্যাই ছিল সমধিক। সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপগুলি যে শুধু পূজাপার্বণ উপলক্ষে ব্যবহৃত

হত তাই নয়, সময় বিশেষে বৈঠকখানারূপেও ব্যবহার করা হত। এই চণ্ডীমণ্ডপগুলির কাঁঠাল কাঠের উপর নক্সাকাটা খুঁটিগুলো তৎকালীন কাষ্ঠ শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিত। মাটির দেওয়ালগুলো পাট ও তুঁষের সাহায্যে দোপাট করা হত, যার ফলে বালির পলস্তারার মত মসৃণ দেখাত। ঘর-লেপা বা গোবরমাটি দিয়ে নিকানো আজ আর নেই বললেই চলে। দু'একখানা মাটির দোতলা ঘরের অস্তিত্ব তখনও রিষড়ায় বজায় ছিল।

বাঁশের ব্যবহার

তখনও পর্যন্ত করগেট টিন বা এ্যাসবেষ্টসের ব্যবহার প্রচলিত না হওয়ায় বাঁশের এবং বাঁশ থেকে তৈরী জিনিষের ব্যবহার ছিল সার্বজনীন। প্রাত্যহিক জীবনে বাশ ছিল অপরিহার্য। এক কথায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাঁশের জিনিষ ছিল নিত্য সঙ্গী, নূতন চেঁচাড়ি দিয়ে নাড়ী কাটা থেকে আরম্ভ ক'রে শ্মশান কৃত্য পর্যন্ত বাঁশ ছিল সকল কাজের অঙ্গ। বাঁশের পাতা থেকে গোড়া পর্যন্ত কোনও অংশই ফেলা যেত না। বাঁশ পাতার আটি বেধে ষষ্ঠী পূজা থেকে শুকনা পাতার জ্বালানি পর্যন্ত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আজও নিঃশেষে ফুরিয়ে যায় নি। এই বাশ নিয়ে কত ছড়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই তবে অধিকাংশ গুলোই অশ্লীলতা দুষ্ট। কথায় বলে — 'বাঁশ বনে ডোম কাণা'। 'কাঁচায় না নুইলে বাঁশ, পাকায় করে ট্যাঁস ট্যাঁস।

খনার বচনে আছে :—

"দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ।
কমেনা বাড়েনা বারমাস ॥
শুন বাপু চাষার বেটা

বাঁশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা ॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে।
দুই কুড়া ভুঁই বেরুবে ঝাড়ে ॥

বাঁশের তৈরী জিনিষপত্র বিক্রী করে ডোম ও হাড়িদের জীবিকা নির্বাহ হত। তখনকার দিনে বাঁশের দর ছিল অত্যন্ত সস্তা। ১৮৩২ খৃঃ বাঁশের দাম ছিল ১০০ খানা ১২৷৷ টাকা, কাতাদড়ি ১/· মণ ৫৲ দরমা ২০ খানা ১৲, উলুখড় ৮৲ কাহন; মজুর /১০ পয়সা থেকে দুআনা রোজ।

রিষড়ায় বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর বাঁশ ঝাড়ের অস্তিত্ব খুব বিরল ছিল না। পঞ্চাননতলা ও জি. টি, রোডের সংযোগ স্থলে প্রায় দুই বিঘা আড়াই বিঘা জমির উপর হালদার মহাশয়দের মুটি বাঁশ ঝাড় ছিল সে যুগের একটা সম্পদ। বর্তমানে সে বাঁশঝাড়ের কোনও অস্তিত্ব না থাকলেও 'বাঁশতলা বাসট্যাণ্ড' নামকরণের মধ্যে তার স্মৃতি বিধৃত হ'য়ে রয়েছে। মোড় পুকুর অঞ্চলে বাঁশের ব্যবসায় থেকে এক শ্রেণীর লোকের বেশ দু'পয়সা আমদানি হত। কলকারখানা স্থাপন উদ্দেশ্যে তার বেশকিছু অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বর্তমান টি, সি, মুখার্জী ষ্ট্রীট ও শ্রীমাণি লেনের সংযোগ স্থলে একটা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ তলদা মোটা বাঁশের ঝাড় ছিল সে যুগে একটা দর্শনীয় বস্তু। নূতন রাস্তা নির্মাণ কল্পে (শ্রীমাণিদের বাড়ী পর্যন্ত) পৌরসভা কর্তৃক জমি অধিকৃত হওয়ার ফলে সে বাঁশ ঝাড়ও বিলুপ্ত হয়েছে। বড় বড় পাকাবাড়ী নির্মাণ কার্যে বাঁশের চাহিদা (ভারা বাঁধা ও সেনটারিং কাজে) আজও পরিপূর্ণরূপে বজায় রয়েছে। টালি খোলা বা চোঙ্ খোলার তৈরী বস্তি অঞ্চলে আবাসিক গৃহগুলিতে বাঁশের ব্যবহার পূর্বের মতই অনুভূত হচ্ছে। এই বাঁশের লাঠিই ছিল সে যুগের বাঙালীর ধনপ্রাণ রক্ষার ও বলবীর্যের সহায়ক। দ্রুতগমনের পরিপূরক স্বরূপ 'রণপা' হিসাবেও বাঁশের ব্যবহার দেখা যেত।

কথায় বলে "ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি, বাঁশ বলে আমি

আপনি উঠি॥” ফাল্গুন মাসে শুকনা বাঁশ পাতাগুলো ঝরে যাবার পর সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত এবং এর ফলে কখনও কখনও অসাবধানতা বশতঃ নিকটবর্তী বেড়া বা চালাঘরে আগুন ধরে যাওয়ার মত ছোটখাট বিপত্তিও রিষড়ায় ঘটে গিয়েছে, এমনকি বাঁশ কাটতে গিয়ে বাঁশের গোড়া ছিটকে লেগে জীবনহানির সংবাদও পাওয়া যায়!

চতুষ্পাঠীর কথা

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এখানে কয়েকটি পাঠশালার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। সে সময় ছাত্রসমাজ যেমন একদিকে, কায়স্থ কুলোদ্ভব বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাসের বিভিন্ন আর্যা মুখস্থ করত তেমনই আবার ইংরাজি শব্দও ছড়ার আকারে আয়ত্ব করতে আরম্ভ করে।

আজকের যুগে মনকসা, কাঠাকালি বা কড়া, কাক, ক্রান্তি প্রভৃতি অচল হয়ে গেলেও সে সময়ে কিন্তু সমাজজীবনে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে, ঐ সমস্ত আর্যা যে কত মূল্যবান ছিল সে কথা আজ অনুমান সাপেক্ষ। কৃষিজমি বা অন্যান্য জমি ক্রয় বিক্রয় ও ভাগবাটোয়ারা কার্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্যে কাঠাকালি ও বিঘাকালির সাহায্য গ্রহণ করা হত। তা ছাড়া ছিল দলিল ও পত্রলিখন প্রণালী শিক্ষার আদর্শ। যতদূর জানা যায় হড়মহাশয়দের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসত। কালক্রমে ঐ চণ্ডীমণ্ডপটি সংস্কার অভাবে বিনষ্ট হওয়ায় ঐ পাঠশালা গড়গড়ী মহাশয়দের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

অন্যদিকে ছিল চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ পদ্ধতি অবশ্য উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামের মধ্যে তখন দুটী টোল বা চতুষ্পাঠির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বর্ত্তমানে যেখানে (ডাঃ প্রাণতোষ লাহা ষ্ট্রীটে) ৺লক্ষ্মণ চন্দ্র

ঘোষেদের আবাসভূমি সেইখানে তখন ৺গুরুপ্রসাদ তর্কভূষণ (৺হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রপিতামহ) মহাশয়ের টোল ছিল। ঐ জায়গাটা তখন টোলবাড়ী বলে অভিহিত হত। তৎপুত্র ৺মধুসূদন ভট্টাচার্যও কিছুদিন ঐ টোল পরিচালনা করেন।

কথিত আছে, কোন্নগরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় উক্ত টোলেই তাঁর প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কালে উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র অনঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে ৺হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনী পান্নামরীর বিবাহ হয়।

দেওয়ানজী স্ট্রীটে ৺গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের (৺দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্যের খুল্লতাত) প্রতিষ্ঠিত একটি টোল ছিল। তাঁর পিতা ৺রামলোচন ন্যায় ভূষণের আমলেও টোলের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। এই ভট্টাচার্য বংশের সে সময় চূড়ামণি উপাধি ছিল এবং এরা ছিলেন তখন অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী অর্থাৎ একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কোন জাতির দান গ্রহণ করতেন না। সে সময়ে রিষড়ার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির পৌরোহিত্য পদে এই ভট্টাচার্য বংশই নিযুক্ত ছিলেন। ইহারা নপাড়ী বন্দ্য ঘটীয় শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূত। মাহেশ নিবাসী সুপণ্ডিত দীর্ঘায়ু স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এই বংশেরই সন্তান।

বর্ত্তমান বান্ধব সমিতি সাধারণ পাঠাগারের অবস্থান ভূমিতে গড়গড়ী মহাশয়দের স্থাপিত একটি টোল ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

অধ্যাপকরা তখন ছাত্রদের জ্ঞানোন্মেষের জন্যে আন্তরিক ভাবেই চেষ্টা করতেন। সে যুগে বহু ছাত্রেরই স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সংস্কৃত শ্লোকগুলি মুখস্থ করা এবং প্রয়োজনমত তার ব্যবহারই ছিল এই শিক্ষার মূল কথা।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রকৃত আধ্যাপকদের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখেছেন :—

"যোঽন্ধং করোত্যাক্ষিমন্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ।
তমেবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নামধারিণঃ॥"

অর্থাৎ যিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করেন, বালককে যিনি প্রবোধিত করেন, আমি তাঁকেই প্রকৃত অধ্যাপক বলে মনে করি। তদ্ভিন্ন অপর সকলে 'অধ্যাপকনামধারী' মাত্র।

নূতন শিক্ষা পদ্ধতি

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদরী মার্শম্যান সাহেব উপরোক্ত ভাবে পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারে আগ্রহী হন। তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতি যে শুধু অসপূর্ণ ছিল তাই নয়, তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। না ছিল সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা, না ছিল সুপাঠ্য পুস্তক। পণ্ডিতদিগকে নিয়মিত বেতন দানের জন্যে অর্থের কোন নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা ছিল না।

মার্শম্যান দেখলেন, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে ভালভাল বিষয়ের সংকলন পুস্তক পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করা চাই।

এই ভাবে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতনভাবে রূপদান ক'রে শ্রীরামপুরের মধ্যে এবং আশে পাশে কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ত্রিষড়ায় কোনও মিশনারী বালক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল কিনা তার সঠিক তথ্য জানা যায় না তবে দুটী বালিকা বিদ্যালয় যে স্থাপিত হয়েছিল তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়

মিসেস্ মার্শম্যান এবং মিসেস এমিলিয়া কেরীর প্রযত্নে শ্রীরাম-পুরের চতুষ্পার্শ্বে যে ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তার

মধ্যে দুটি ছিল রিষড়ায়। এই সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলির নামের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৮২৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় দুটীর নাম ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:—

	স্কুলের নাম	ছাত্রী সংখ্যা।	উপ: গড়
১।	ডানকানি লাইন স্কুল (১নং ইসেরা)	১৬	১৪
২।	ষ্টার্লিং স্কুল (২নং ইসেরা)	২০	১৬

ইসেরা যে রিষড়ারই নামান্তর সে কথা বলাই বাহুল্য। সে যুগে ইংরেজদের মুখে রিষড়ার উচ্চারণ ছিল ইস্রো, ইসেরা, ইসারা প্রভৃতি।

এই সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা লিখন, পঠন, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান এবং সেলাইয়ের কাজ ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হত। খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থাদিও যে পড়ানো হত সে কথাও উল্লেখ্য।

এই সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেব পরীক্ষা ও পুরস্কার বিতরণের সংবাদ ১৮২৪ খৃঃ ১০ই এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পনে' প্রকাশিত হয়।

"পরীক্ষা—৫ই এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারিবাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটীতে শ্রীরামপুরের ও চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকাদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন, ঐস্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বশুদ্ধ দুইশত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশজন শব্দপাঠ করিয়া ও পঁয়ত্রিশজন নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরম আপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা কথা, বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্শম্যান উঠিয়া বালিকাদিগকে বস্ত্র সিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন, অপর সকলে সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল··· অপর বালিকারা যে সকল শিল্পকর্ম্ম অর্থাৎ, মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি

প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।”

প্রথমদিকে শ্রীরামপুরের হিন্দু প্রধানেরা বালক বিদ্যালয়ের মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেও মিশনারীদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু পরে এই সংঘের স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য সাধারণের নিকট প্রকট হয়ে পড়ে। পাঠ্য তালিকায় বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি স্থান পায় এবং এসকল পাঠ আবশ্যিক গণ্য হয়। পরীক্ষাকালে ইহারও পরীক্ষা দিতে হত। এই সমস্ত কারণে হিন্দু প্রধানগণ গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে সরে দাঁড়ান এবং উচ্চ শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দুরাও তাঁদের কন্যাদের আর এই সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না। যার ফলে উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলো অধিক দিন স্থায়ী হয়নি এবং মিশনও শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

মিশনারীদের উক্ত প্রচেষ্টা আদৌ সাফল্য লাভ করতে না পার-লেও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে তাঁদের কার্য প্রসংসনীয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ায় ইহারও কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধিত হয়।

শ্রীরামপুর কলেজ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ঘটে গেল দু'টো ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রথমতঃ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এতদঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা লাভের দ্বারো-দ্ঘাটন উপলক্ষে শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপন। কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ভারতের যুবক বৃন্দকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা ও ইঙ্গ-ভারতীয় ও ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে খৃষ্টধর্ম প্রচার কল্পে শিক্ষাদান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে এই কলেজ সম্বন্ধে লিখিত আছেঃ—

In 1818 Carey, Marshman and Ward opened the first missionary college at Serampore It rested upou the foundation of a whole group of schools which they had earlier established, and in 1827 it actually received from the king of Denmask, a charter empowering it to grant degrees'.

(Vol—I, p p. 33-34)

এই কলেজ ভবন ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ভবন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ক্যালেণ্ডারে' এই অট্টালিকা সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

"The callege building erected in 1818 by Dr. Carey and his colleagues, still remains one of the finest college building in India ."

কোন্ বিশ্বনিন্দুক এই কলেজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়া বেঁধেছিল তা জানা যায় না:—

"শ্রীরামপুর কলেজ, হ্যাভ্ নো নলেজ
বড় বড় থাম, কুছ নেই কাম॥"

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে উক্ত কলেজের খৃষ্টধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতির ফলে রিষড়ার অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানবর্গকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কলেজে প্রেরণ করতে বিরত ছিলেন। তাছাড়া কলেজে ভর্তি হবার পূর্বে যে শিক্ষামান অর্জন করা দরকার সে বিষয়ে শিক্ষা দেবার মত কোনও উচ্চ বিদ্যালয়ও তখন এতদঞ্চলে স্থাপিত হয়নি। এই সমস্ত অসুবিধার জন্যে শিক্ষাভিলাষী ছাত্রবৃন্দকে তখন কলকাতা হিন্দু কলেজ বা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে গিয়ে ভর্তি হতে হত।

সমাচার দর্পণ।

শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপনের পর ১৮১৮ খৃঃ এপ্রিল মাসে

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র "দিগ্দর্শন—অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর এই পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায়।

উক্ত তারিখের একমাস পরে ১৮১৮ খৃঃ ২৩.শ মে (বাং ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) বাংলা দেশের প্রথম সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়।

এই সাপ্তাহিক পত্র ক্রমশঃ অর্দ্ধ সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রতি শনিবার ও বুধবার প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

বলা বাহুল্য যে সমাচার দর্পণে রিষড়ার সংবাদও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

'সমাচর দর্পণ পঞ্চানন কর্মকারের হাতে তৈরী বাংলা ছাপার হরফে ছাপা হয়। প্রথম বাঙালী, যিনি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন – 'বাঙ্গাল গেজেটি—১৮১৮ সালেই, তিনি হলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তাঁর বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের কাছে বহড়া গ্রামে।

১৮১৮ খৃঃ ৩০ শে এপ্রিল ডাঃ মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে যে ইংরাজী মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় তার স্বত্ব ১৮৭৪ খৃঃ 'ষ্টেটস্ম্যান' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী কিনে নেন এবং প্রথমে 'ষ্টেটস্ম্যান এণ্ড ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' এই যুক্ত নামে অভিহিত হয়।

সংবাদ পত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (দৈনিক) পত্রিকায় ১৪/৪/১৮৫১ তারিখে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহার কয়েকছত্র নিম্নে উল্লেখ করা হল :—
ইংরাজী ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর হইতে সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইবার অগ্রেও কতিপয় পুস্তক বঙ্গীয়াক্ষরে মুদ্রিত হয় তথাপি সংবাদ পত্রের প্রচার না থাকাতে উপদেশ ও নানা বিষয়ের আন্দোলন বিরহে তদানীং সেই মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারের বিশেষ উপকার দর্শে নাই।

বিবিধ প্রকার বিষয়ে প্রসঙ্গ সংবাদপত্রেই প্রথম হয় তাহার দ্বারাই জ্ঞানার্থি ও কার্য্যাদি এবং সাধারণের বা স্বদেশের হিতার্থি পুরুষেরা স্ব২ অভিষ্ট বিষয়ের উপায় অনুসন্ধান করেন।"

শ্রীরামপুরে কাগজের কল।

মিশনারীগণ কলেজ স্থাপন ও সংবাদ পত্র প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। পাদরী ওয়ার্ড সাহেব শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুতের জন্যে একটি কারখানাও স্থাপন করেছিলেন।

লেখাপড়ার সঙ্গে যে কাগজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে কথা আজকের যুগে কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। এ যুগের কোন ছাত্রকে যদি সেকালের মত কলাপাতায় বা তালপাতায় লিখতে বলা হয় তা হলে সেটা নিছক তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যি কথা বলতে কি বর্ত্তমান যুগ, কাগজেরই যুগ, সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে 'সংবাদ পত্রের' আগমন থেকে দিনেব শুরু আর সারাদিন ছাপানো বই, কাগজ, ফাইল, পোষ্টকার্ড, খাম, ওয়াল পোষ্টার, দোকানে দোকানে কাগজেব বিভিন্ন আকারের ছোট বড় ঠোঙ্গা, চমৎকার রংবেরংয়ের ছাপা নোটের তাড়া, ক্যাশ সার্টিফিকেট, বণ্ড সবইত কাগজের। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকে বোধহয় কারেন্সি নোটের স্বপ্নও দেখে থাকে। কিন্তু যে সময়ের কথা উপরে আলোচনা করা হচ্ছে সে সময় কাগজ এত সহজ লভ্য ছিল না, তাই মিশনারীগণের কার্যকলাপ এতদঞ্চলে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত করার বাষ্পীয় কল ১৮২০ থেকে ১৮৬৫ খৃঃ পর্যন্ত চালু ছিল; এবং এই কাগজ শ্রীরামপুরের কাগজ বলে পরিচিত ছিল। মিশনারিগণ উক্ত কলের কাগজ দিনেমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এমনকি সাধারণকে পর্যন্ত বিক্রয়

করতেন। এই কাগজের কল এখন যেখানে ইণ্ডিয়া জুটমিল' স্থাপিত হয়েছে ঐ স্থানে ছিল। তারপর এই কলটী "বালী পেপার মিল কোম্পানী" কিনে নেন এবং তাঁদের প্রস্তুত বাদামি রংয়ের কাগজ এতদঞ্চলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বালির কাগজ নামে অভিহিত হত ছাত্র সমাজে এবং জন সাধারণের ব্যবহরার্থ প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্বে দেশীয় প্রথায় তৈরী কাগজই এখনকার অভাব পূরণ করত। দশঘরা, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে মুশলমান কাগজিরা সাধারণত এইসব কাগজ প্রস্তুত করত।

হাতে লেখা পুঁথি

কলে তৈরী কাগজের প্রচলন হলেও তখন পর্যন্ত ভট্টাচার্য মহাশয়রা বিশেষ করে বৈকুণ্ঠ নাথ হড় ও পাকড়াশী বংশীয় দশ কর্মান্বিত শাস্ত্রজ্ঞরা স্বহস্তে পুঁথি লিখতে অভ্যস্ত ও পারদর্শী ছিলেন। খাঁকের বা বাঁখারির কলমে তখন দিশী কালী দিয়েই তাঁরা বিবিধ দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি, চণ্ডী, বৃর্ষোৎসর্গ, ব্রত প্রতিষ্ঠাদি সংক্রান্ত পুঁথি লিখছেন। কেউ কেউ আবার স্মৃতি ও ব্যাকরণের পুঁথিও লিখে রেখে গেছেন। সে সমস্ত হাতে লেখা পুঁথি দেখলে তাঁদের অসীম ধৈর্য্য ও সুন্দর হস্তাক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত পুঁথি লেখার সাজ সরঞ্জামের মধ্যে থাকত কাঠের বাঁটের ছুরি (মধ্যে মধ্যে লেখনীর মুখ সরু করে চেঁচে নেওয়ার জন্যে), কাঁচা মাটির আধারের মধ্যে প্রোথিত মাটির দোয়াত (সহজে উল্টে যাতে না পড়ে) আর বালির পুঁটুলি (ব্লটিং পেপারের কাজ করার জন্যে)। পাশেই থাকত একটা কাঠের পিড়ের মধ্যে গর্ত করা দু'তিনটা সসাজ হুঁকা কলকে আর চকমকি।

এই সমস্ত পুঁথি লেখার জন্যে তুলোট কাগজ বা তালপাতাই অধিক ব্যবহৃত হত। এই সমস্ত তালপাতা প্রথমে দীর্ঘদিন পুকুরের

পাঁকে পুতে রেখে পাকান হত। তারপর দুধে সিদ্ধ করে, শাঁখ দিয়ে মসৃণ করা হত। পরে সাইজ করে পাতাগুলো সমানভাবে কেটে নিয়ে কাঠি বাদ দিয়ে মাঝখানে একটা ছিদ্র করা হত এবং তার মধ্যে সরু পাকান সুতা পরিয়ে দু মুখে গাঁইট দিয়ে রাখা হত। এই সুতোটা হত বেশ লম্বা, তাই দিয়ে পুঁথিখানা সাতপাক বা তার অধিক পাকে বেঁধে রাখা হত। উপরে জড়ানো থাকত সাদা বা লাল রংয়ের কাপড়, পুঁথিখানাকে জলবায়ু এবং ধূলাবালির প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে!

এধরণের পুঁথি, লেখকের এবং রিষড়ার অন্যান্য দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ গৃহে যে কত বিনষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। তার কারণ, ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত পুঁথি প্রথমে লোকে অশুদ্ধ ও ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ বলে অব্যবহার্য জ্ঞান করত কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগে অর্থাৎ খড়গামালা তন্ত্রের বচন অনুযায়ী :—

"লেখন্যা লিখিতং প্রাজ্ঞৈর্ম্মাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ। শিল্পাদিনির্ম্মিতং যত্তু পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্ব্বদা॥" হস্তলিখিত পুঁথির মত মুদ্রিত পুস্তকও পাঠ্য বলে গৃহীত হওয়ায় প্রাচীন পুঁথির পরিবর্ত্তে ছাপান পুঁথির ব্যবহার দ্রুত প্রসারলাভ ক'রে, যার ফলে হস্তলিখিত পুঁথিগুলি অনাদৃত ও অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। ভট্টাচার্য বংশের ইংরেজী শিক্ষিত পুত্রেরা ক্রমশঃ চাকুরীজীবি হওয়ায় যজন যাজন বৃত্তিহীন হয়ে পড়েন। পরে পৌত্রবধূরা জানাল'র তাকে কতকগুলো ছেঁড়ামহলা ন্যাকড়ায় জড়ানো কীটদষ্ট কাগজের স্তূপকে ঘরের জঞ্জাল বোধে ঘরের বাইরে ফেলে দেন। শুষ্ক কাঠের পাটাগুলো কোথাও কোথাও বা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই পুঁথিগুলোই ছিল সে যুগে ভট্টাচার্য মহাশয়দের বড় যত্নের ও প্রাণ প্রিয় বস্তু। ভাদ্রমাসে সারাদিন রৌদ্রে দিয়ে আবার সেগুলোকে সযত্নে যথাস্থানে তুলে রাখতেন। মধ্যে মধ্যে ঝাড়াঝুড়াও করতেন। অনভ্যাসের ফলে হস্তলিখিত পুঁথির বর্ণবিন্যাসও ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।

ছাপা বই হারিয়ে গেলে আবার কেনা যায়, কিন্তু পাণ্ডুলিপি বা পুঁথির বেলায় তা সম্ভব নয়। তাই এইসমস্ত পাণ্ডুলিপি বা পুঁথির মধ্যে চুরি করা বা নষ্ট করা সম্বন্ধে কঠোর দিব্যি দিলেশা দেওয়া থাকত :—

"যত্নেন লিখিতং চেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ॥" ইত্যাদি

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাদের পুস্তকের মলাটের উপর বা আখ্যাপত্রের উপর লিখে রাখত :—

"করোনা করোনা ভাই এই বই চুরি।
উপরে যাহার নাম সেই অধিকারী॥" ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই কি ব্যবসা ক্ষেত্রে, কি রাজ্য শাসন বিষয়ে বাঙালীরা ক্রমশঃ ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে থাকে এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার জন্যে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপারে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়ে। ছাত্র সমাজও ইংরেজী শব্দ ছড়ার আকারে মুখস্থ করতে আরম্ভ করে।

এই সময়ের কিছু পরেই 'ওয়ার্ডবুক' ছাপা হতে আরম্ভ হয়েছিল। ত্রিবড়ার শিক্ষানবীশরা ইংরেজী শব্দ অর্থ সমেত মুখস্থ করে দু'একটা ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজী বাক্য তৈরী করতে ও বলতে শিখেছিল।

'গড্ ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর, কম মানে এসো।
ফাদার বাপ, মাদার মা, সিট মানে বসো॥
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন, ফাদার সিষ্টার পিসী।
ফাদার- ইন-ল মানে শ্বশুর, মাদার সিষ্টার মাসী॥

আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি।
আস্ মানে আমাদিগকে, গ্রাউণ্ড মানে জমি॥
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত।
উইক্ কে সপ্তাহ বলে, রাইস মানে ভাত॥" ইত্যাদি

শব্দ যোজনার নিম্নলিখিত উদাহরণ অনেকেরই জানা আছেঃ—

"আইকাম্, বাইকাম তাড়াতাড়ি,
বড় মাষ্টার শশুর বাড়ী।
রেণ কাম্, ঝমাঝম,
পা পিছ্লে আলুব দম।"

'টুমেন ধাপুস, ধুপুস্, ওয়ান ম্যান সেঁকে দেয়, তবে ত সাহেব রাইস হয়।''

নবীন ছাত্র সমাজ যখন এইভাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন কিন্তু ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা ভুলেও ঐ ম্লেচ্ছ ভাষার আমল দেন নি। তাঁরা তখনও চিনির বদলে শর্করা, ঘিএর পরিবর্ত্তে ঘৃত, গরুর বদলে গাভী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পানীয় হিসাবে একমাত্র গঙ্গা জলই ব্যবহার করতেন। মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচাদি বিষয়ে এবং দক্ষিণ কর্ণে উপবীত জড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন।

তখন শর্করা বা চিনি বলতে দেশী গুড় থেকে উৎপন্ন চিনিই বোঝাত। কাশীর চিনির মূল্যাধিক্য বশতঃ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হত না। মিলের তৈরী চিনি তখনও প্রচলিত হয় নি। সুখচরে তৈরী গুড় চিনির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রিষড়ার হাটে বাজারে ও ময়রার দোকানে তখন এই চিনিই বিক্রী হত। (পৃঃ ১৪২)

দেবসেবার জন্যে মিছরি, তাল মিছরি, নাবাত, ঘোষা মোণ্ডা, বাতাসা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে ঘরে তৈরী নারিকেল নাড়ু, নারিকেল সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতিও সময় সুযোগ মত দেওয়া হত। সন্দেশ রসগোল্লা বা লেডিকেনির ব্যবহার তখনও প্রচলিত হয়নি। বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ সীতাভোগ, মিহিদানা রিষড়ার

অধিবাসীদের পক্ষে তখন সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য ছিল না। বড় জোর পদব্রজে গিয়ে জনাইএর মনোহরা, শ্রীরামপুরের গুঁপো সন্দেশ প্রয়োজন মত সংগ্রহ করা হত।

আকর গ্রন্থরাজি

১। কেরী সাহেবের মুন্সী—প্রমথ নাথ বিশী।
২। কোন্নগর প্রকাশিকা—একাদশ সংখ্যা-ফাল্গুন, ১৩৫৬।
৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত—অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ সংকলিত।
(শ্রীনলিনী কান্ত চক্রবর্তীর সৌজন্যে)
৪। সাহিত্য সাধক চরিত মালা—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। জোড়া সাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৬। মাহেশ মঙ্গল—সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৭। শ্রীরামপুর মহাকুমার ইতিহাস—বসন্ত কুমার বসু।
৮। পূজা পার্বণ—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।
৯। তিনশতকের কলকাতা—নকুল চট্টোপাধ্যায়।
১০। হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র।
১১। ঐ ঐ ঐ—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা—যোগেশ চন্দ্র বাগল।
১৩। সদালাপ—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।
১৪। বেনের মেয়ে—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
১৫। কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ।
১৬। প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র—সমাচার দর্পণ—বিনয় ঘোষ (বেতার জগৎ, ৭/১০।১৯৬৮)
১৭। স্মৃতিচারণা (পাণ্ডুলিপি)—পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বরফ ও সোডাওয়াটার

দেখতে দেখতে রিষড়াবাসীদের অনাস্বাদিত পূর্ব বরফ আর সোডা ওয়াটার বাজারে এসে গেল। হুগলীতে তখন বরফ কলে বরফ তৈরী হয়ে কলকাতায় ইউরোপীয় মহলে চালান যেত। কিন্তু দুর্মূল্য তার ফলে জনসাধারণের পক্ষে তখন সেই বরফ কিনে খাওয়া সম্ভব হত না। কুঁজোর জলেই তাঁরা নিদাঘে তৃষ্ণা নিবারণ করতেন। হুগলী ছাড়া নিম্নবঙ্গে তখন আর কোথাও বরফের কল ছিল না।

বরফের পর, কলকাতায় সোডাওয়াটার আমদানি হয়েছিল বিলেত থেকে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে। ১৪্ টাকা ডজন আর বোতলের জন্যে দোকানদারের কাছে ২ টাকা জমা রাখতে হত। তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ টালফ্ কোম্পানী সোডাওয়াটার আমদানি করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে "উহা উৎকৃষ্ট পানীয় ও হজমের মহৌষধি।" আরও লেখা থাকত যে, বোতল কাত করে না রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে।"

বিলাত থেকে জাহাজে আসতে অনেক দেরী হত বলে কলকাতায় কয়েকজন বিদেশী কেমিষ্ট সোডাওয়াটার তৈরী করতে শুরু করেন, সে হল ১৮১৬ সালের কথা। তাঁরা বিজ্ঞাপনে লিখতেন—"সি,এইচ' প্রস্তুত সোডাওয়াটার যে কোন বিদেশ থেকে আমদানি করা অথবা ভারতে প্রস্তুত সোডাওয়াটার থেকে উত্তম মানের। আমাদের প্রস্তুত সোডাওয়াটারের উপকারিতা দেখে বিজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের পান করতে বলেন।"

এই সোডাওয়াটার তখন বিক্রি হত ন'টাকা ডজন হিসাবে কাজেই সকলের পক্ষে ক্রয় যোগ্য ছিল না। পরে অবশ্য আরও সুলভ মূল্যে বিক্রী হত এবং রিষড়ার বাজারেও পাওয়া যেত। ৭০/৮০ বছর আগে এ সম্বন্ধে একটা ছড়া প্রচলিত ছিল:—

"দুই তিন আনা ভিন্ন সোডা নাকি মিলে।
খাসা ভাব পাই, এক ঘষা পাই দিলে॥"

গঙ্গা বক্ষে ষ্টীম লঞ্চ

আনুমানিক ১৮২০ সালের আগেই ভাগীরথী বক্ষে ষ্টীম লঞ্চ যাতায়াত শুরু করে। কলকাতা থেকে ব্যারাকপুর লাট বাগান পর্যন্ত এই ষ্টীম লঞ্চ প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করত। তখন থেকেই কলকাতা ও টিটাগড়ে জাহাজ তৈরীর কাজ চলতে থাকে। ১৮২৩ খৃঃ হুগলী পর্যন্ত প্রথম বাষ্প চালিত পোত চলতে শুরু করে, এবং ১৮২৬ খৃঃ দৈনিক যাত্রীবাহী ষ্টীমার সার্ভিস চালু হয় চুঁচুড়া থেকে (সদর আদালত) কলকাতা পর্যন্ত যে দু'খানা ষ্টীমার প্রথম যাতায়াত করত তাদের নাম ছিল 'কমেট' ও 'ফায়ারফ্লাই'। তখন প্রতি আরোহীর ভাড়া ছিল আট টাকা। রিষড়ায় কোনও ষ্টীমারঘাট প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

"As early as 1828, a line of steamers ran daily between Hooghly and Calcutta, carrying the mails & callings at Chinsurah, Chandernagar etc.····The steamers are stern-wheelers of light draught, and carry passengers and smaller goods."—Dist. Gazetter, Hooghly. L. S. S. Omally.

অশিক্ষিত লোকেরা তখন এই জাহাজ আসতে দেখে বলত, "ধোঁয়া কলের লা আসছে" জাহাজগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটবড় ঢেউ এসে পাড় তোলপাড় করে ফেলত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মুগ্ধ নেত্রে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আনন্দলাভ করতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ব্যারাকপুরে উপরোক্ত লাট বাগান ও লাট ভবন স্থাপিত হয়েছিল (১৭৯৮/৯৯ খৃঃ) লর্ড ওয়েলেসলির আমলে-কলকাতার অসহ্য গরমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় এবং অবসর কালীন বিশ্রাম সুখ উপভোগের আবাস হিসাবে। তিনিই সপ্তাহান্তে একদিন অর্থাৎ রবিবার কর্মবিরতি হিসাবে ছুটির দিন ধার্য করেন।

নৌকায় যাতায়াত সুলভ ও মনোরম হলেও বিপদমুক্ত ছিল না। ঝড় ঝাপটায় অনেক সময় নৌকাডুবিতে লোকের প্রাণহানি ঘটত। তাছাড়া জোয়ার ভাঁটার টানে যেতে আসতে অযথা অনেক সময় অতিবাহিত হত।

রিষড়ার তৎকালীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে কোনও লিখিত ইতিহাস না থাকলেও তাঁদের মধ্যে তৎকালে যে এই রকম বিপাকে কেউ কখনও পড়েন নি একথা বলা যায় না।

১৮২৩ খৃ: প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌর মোহন আঢ্য মহাশয় একদিন তাঁর বিদ্যালয়ের জন্যে একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধানে শ্রীরামপুরে এসে ফেরার পথে (রিষড়ার কাছাকাছি) নৌকাডুবিতে মৃত্যু মুখে পতিত হন,— এটি একটি বাস্তব ঘটনা। এই দুর্ঘটনার সংবাদে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত মর্মাহত হন। নৌকা থেকে অবতরণের সময় সামান্য অসাবধানতার ফলে ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কয়েকবার। শ্রীরামপুরের কেরী সাহেবও এই রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে অব্যাহতি পান নি।

এই সমস্ত বিপদ এড়াবার জন্যে অনেকেই তখন পদব্রজে সালিখা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে হাটখোলা, কুমারটুলি অঞ্চলে কার্য নির্বাহ করতেন। এই প্রসঙ্গে ৺ধর্মদাস হড় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। নৌকায় যাতায়াত করা অপেক্ষা পদব্রজে যাওয়াই তিনি অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে করতেন।

উত্তরপাড়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত ষ্টীমার সার্ভিস চালু হলে, রিষড়ার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই উত্তরপাড়া পর্যন্ত পদব্রজে গিয়ে ওখান থেকে বাষ্পীয় পোতে যাতায়াত করতেন। ১৮৫৪ খৃ: রেলপথ স্থাপিত হবার পরেও উক্ত প্রথা অনেকাংশে প্রচলিত ছিল, তার কারণ রিষড়া ষ্টেশন স্থাপিত হয়েছিল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে। ৺বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায় (সোনাবাবু) মহাশয়কে অনেক

সময় এই পথে যাতায়াত করতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯২৯/৩০ খৃঃ বালী ব্রীজ (বর্ত্তমান বিবেকানন্দ সেতু) নির্মিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত উক্ত ষ্টীমার সার্ভিস বজায় ছিল এবং রিষড়ার অধিবাসী ৺গোকুল চন্দ্র ঘোষকে (৺কালী পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী) অনেকেই তখন উত্তরপড়ার ঘাটে এই ষ্টীমার সার্ভিসের সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখে থাকবেন।

ঘড়ির প্রচলন

ঘড়ির প্রচলনও তখন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, ডেভিড হেয়ারের দৌলতে। ঘড়ির কারিগর ও ব্যবসায়ী হিসাবে হেয়ার সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। ১৮১৬ খৃঃ তিনি তাঁর ঘড়ির ব্যবসায় এক আত্মীয়কে সমর্পন করে এতদেশীয় গণের কল্যানে আত্মোৎসর্গ করেন এবং একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্টা করেন।

যাইহোক, এই সময় থেকে রিষড়ার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ঘড়ির পকেটে গোলাকার ও চেপটা সাইজের ঘড়ি সোভা পেতে থাকে। ক্রমশঃ ঘড়ি ও ঘড়ির গার্ড চেন বিবাহের যৌতুক হিসাবে প্রদত্ত হতে থাকে। কিছুকাল পরে সোনার ঘড়ীও ধনী মহলে ব্যবহৃত হতে থাকে। সদাগরী হৌসে চাকুরীজীবিদের পকেটে কালকারে জড়ান নিকেল কেসের ঘড়ি তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বেলা ১টার সময় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি হলে সকলে ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় এই ঘড়ির সম্বন্ধে লিখেছেন—

"স্থির চোখে ধীরমনে যে দেখিবে ঘড়ী।
সে বলিবে অবিকল ঈশ্বরের ঘড়ী॥
এক কলে ঠিক চলে বিরূপ না হয়।
প্রতিক্ষণে করিতেছে কালের নির্ণয়॥
এক দুই ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি যাহা হয়।

কাল পরিচয় সে যে কাল পরিচয় ॥
এক দুই তিন করি একে আসে ফিরে।
এক দুই তিন করি ফিরে যায় ফিরে ॥
প্রাণীর সহিত ঠিক তুলনা তাহার।
বিকল হইলে কাঁটা চলেনাকো আর ॥
গুণে জ্ঞানে যে করেছে ঘড়ীর সৃজন।
কখনই নহে সেই লোক সাধারণ ॥
কোথায় আছেন তিনি ভূলোক ছাড়িয়া।
উদ্দেশে প্রণাম করি দেবতা বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে ঘড়ির প্রচলনের পর থেকেই সময়ের একটা সূক্ষ্ম হিসাব এবং বাঁধাবাঁধি ভাবের উদয় হয়। ক্রমশঃ ঘড়ী মেরামতের প্রয়োজনে উপযুক্ত কারীগরী শিক্ষারও প্রয়োজন দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রিষড়ার দাঁ বংশীয় (৺পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-তাত-পুত্র) ৺অক্ষয় কুমার দাঁ'ই বোধহয় এই এই ব্যবসায়ে প্রথম লিপ্ত হন।

ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন।

খাস রিষড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঘোড়ার গাড়ীর (ভাড়াটে) প্রচলন হয়নি বটে কিন্তু শ্রীরামপুরে ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় মিশনারীদের অনুরোধে তাঁর ভবনের সংলগ্ন জমীতে একটি ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা স্থাপন করেন। তাঁর আস্তাবলে তখন তিনখানা পাল্কী গাড়ী একখানা বগীগাড়ী ও দশটা ঘোড়া ছিল। মিশনারী পাদরীরা ছাড়াও স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তিরা এইসব ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া নিতেন। ব্যয় বাহুল্যের জন্যে সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হত না। (দূরত্ব হিসাবে শ্রীরামপুর থেকে রিষড়ার ভাড়া ছিল ছয় আনা থেকে আট আনা) তাঁরা প্রয়োজন মত,

বিশেষ করে মহিলাদিগের স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্যে পাল্কী, ব্যবহার করতেন। ১৮৫৫ খৃঃ ওয়েলিংটন জুটমিল স্থাপিত হওয়ার পর ইউরোপীয়ানদের শ্রীরামপুর ষ্টেসনে যাতায়ত করার সুবিধার্থে রিষড়ায় জি,টি, রোডের পার্শ্বে (মিলের গেটের সন্নিকটে) ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা স্থাপিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরাও মধ্যে মধ্যে এই গাড়ী ভাড়া করতেন।

কেরী সাহেবের নিজের নৌকা থাকলেও তিনি মাঝে মাঝে টম্‌টম্‌ গাড়ী করে জি, টি, রোড দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতে যেতেন। এরপরেই উল্লেখযোগ্য হল ৺কালী কুমার দের (বক্সীর) ঘোড়ার গাড়ীর কথা, সেকথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

দামোদরের বন্যা।

ইতিপূর্বে যা কোনদিন ঘটতে শোনা যায়নি তাও ঘটে গিয়েছিল· ১৮২৩ খৃ: (বাং ১২৩০)। দামোদরের প্রবল বন্যার ফলে গঙ্গায় জলস্ফীতি, যার ফলে রিষড়ায় জি, টি, রোড পর্যান্ত ভাগীরথীর জল প্লাবিত হয়েছিল। শ্রীরামপুর নগরী তিনদিন জলমগ্ন থাকার ফলে অনেক গৃহ ও কুটীর ধরাশায়ী হয়েছিল। গৃহহীন ব্যক্তিরা অনন্যোপায় হয়ে কলেজ ভবনে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছিলেন। মিশনারীরা তাঁদের আশ্রয় ও খাদ্যাদি প্রদান ক'রে জীবনরক্ষা করেন। বৃক্ষলতাদিও বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। যোগাযোগ রক্ষার জন্যে জলপ্লাবিত রাস্তার উপর দিয়ে নৌকা পর্যন্ত চালাতে হয়েছিল।

On the 26th Sept. 1823 the Damodar again rose in high flood and bursting over its banks inundated the country upto the Hooghly river, which also rose to an unprecedented height ...... in the streets of Serampore boats were plying, the College being surrounded by water, ... Dist. Gazetteer L. S. S. Omally.

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আঘাত।

১৮১৭ খৃঃ মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। বলাবাহুল্য ঐ কলেজের সুনাম ও শিক্ষাব্যবস্থা তখন বহু ছাত্রকেই আকৃষ্ট করেছিল। রিষড়া, কোন্নগর প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকজন ছাত্রও উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল। কিন্তু যদিও নামে এটি হিন্দু কলেজ, কার্যতঃ এর শিক্ষা প্রণালী ছিল পাশ্চাত্য ধরণের। ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হয়ে ছাত্রদল সমাজ-সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং নিজেদের আচার আচরণে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রচলন করেন। এই উন্নাসিক পরিবর্ত্তনের জন্যে অনেকেই ঐ কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজীওকে দায়ী করেন। সত্যই তখন নাস্তিকতা ও অনাচারের প্লাবন বইতে আরম্ভ করেছিল এবং এই ভাবেই হয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলের সৃষ্টি; যাঁরা গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার দিকেই অধিক উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে তাঁদের অধিকতর আসক্তি দেখা দিয়েছিল। ধীরে ধীরে এই সমস্ত কুপ্রথা ও ভাবধারা রিষড়ার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবিস্তর সংক্রামিত হয়ে পড়েছিল। তাদের এই ধর্মবিদ্বেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নাস্তিকতা তখনকার দিনের গোঁড়া হিন্দু সমাজের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করেছিল। এতদিন ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী কর্ত্তব্যকর্ম অনুষ্ঠানে মানুষের মনে কোনও দ্বিধা সংকোচ ছিল না কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রচারকার্যের ফলে তাদের সে অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হতে আরম্ভ করে। অবিচারে সমস্ত শাস্ত্রব্যবস্থা মেনে নিতে লোকে তখন থেকেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। সে যুগের কথা ছিল :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যঃ বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে॥"

অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা বিচার না করে কেবল মাত্র শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কোন কার্য করবে না, কারণ যুক্তি শূন্য বিচারে ধর্মনাশ হয়ে থাকে।

অবশ্য, ডিরোজিও'র সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগীদের মধ্যে যাঁরা উত্তরকালে যশস্বী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরিণত বয়সে আত্মস্থ হয়েছিলেন এবং দেশের হিতকর বিবিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কোন্নগরের শিবচন্দ্রদেব ও রিষড়ার ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সতীদাহ প্রথা নিবারণ।

রাজা রামমোহন রায় ৫০ বৎসর বয়সে ১৮১৪ খৃঃ কলকাতায় এসে বসবাস করেন এবং অবশিষ্ট জীবন দেশের উন্নতি কল্পে ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। ১৮২১ খৃঃ তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন এবং উহার মাধ্যমে তৎকালীন মিশনারীগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি সেই সময় প্রতিরোধ না করলে বাংলা দেশের বহু হিন্দু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতেন।

সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তিনি প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন এবং বহু পুস্তকও রচনা করেন। নারী জাতির মুক্তির জন্যে তাঁর প্রাণপাত আয়াস শেষ পর্যন্ত ফল-প্রসূ হয়। এর জন্যে তাঁকে বহু বিদ্রূপ বাণ সহ্য করতে হয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে রচিত গান তখন গ্রামে গ্রামে প্রচলিত হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণ কল্পে কেরী সাহেবের অবদানও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সতীদাহ নিবারণের সপক্ষে ও বিপক্ষে সে সময়ে যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, রিষড়ার অধিবাসীরা যে সেই উত্তপ্ত

আবহাওয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না একথা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়েও সেই প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের দলাদলি, ইউরোপীয় শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত নবীনের দল এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান দাবী করেছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উক্ত প্রথা কিঞ্চিৎ শিথিল করতে চেয়েছিলেন।

একথা সত্য, যে অনেক বিধবা স্বামীর মৃত্যুর পর দেবর বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হয়ে ভরণ পোষণের নিমিত্ত নির্মম ব্যবহার ও লাঞ্ছনা সহ্য করা অপেক্ষা স্বামীর চিতায় সহগমন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করতেন এবং 'সতী' নাম পাবার মোহে স্বেচ্ছায় নীরবে দহন যন্ত্রনা সহ্য করে আত্মবিসর্জন করতেন। বহু স্ত্রী বর্ত্তমানে সকলের পক্ষে যথা সময়ে এসে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁরা দু'তিন দিন পরে অনুমৃতা হতেন।

ইংরেজ সরকার অবশ্য একদিনে এক কথায় আইন করে এই প্রথা রহিত করতে অগ্রসর হন নি, তাঁদের আশঙ্কা ছিল তার ফলে হয়তো একটা বিপ্লব বা বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমে তাঁরা জেলা শাসক ও পুলিসের কর্তাদের উপর নির্দেশ দিয়েছিলেন উক্ত বিষয়ে যাতে কারও প্রতি বলপ্রয়োগ না করা হয়। শেষ পর্যন্ত লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিলাতের ডিরেক্টরদিগের সহানুভূতি সূত্রে ১৮২৯ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর আইন দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সতীদাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন।

এদিকে শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারীর নিকট থেকে উক্ত আইনের ঘোষণাপত্রের একখণ্ড প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের দ্বারা সেই ঘোষণা পত্রের অনুবাদ করে প্রচারার্থ শ্রীরামপুরে ও ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে বিতরণ করেন। শ্রীরামপুরের স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ মিশনারীদের প্রচারিত বিজ্ঞাপন পাঠ করে তাঁদের প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে

যথোচিত লাঞ্ছিত করেন। তিনি ইতিপূর্বে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে 'সতীদাহ ধর্ম্মসম্মত হলেও কর্ম্মসম্মত নহে।' (Friend of India —page 310, 1804) এই কারণেই তাঁর প্রতি অনেকেই কুপিত হয়েছিলেন এবং অশালীন ব্যবহার করতে কুণ্ঠীত হন নি।

সরকারী আইনের বিরুদ্ধে রিষড়াবাসীরা সোচ্চার হয়ে না উঠলেও উক্ত ব্যাপারে তাঁদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করতে এবং উল্লাস প্রকাশ করতে ক্ষান্ত হন নি।

উক্ত আইনে এরূপ উল্লেখ ছিল যে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে সতীদাহ কার্যে কোন প্রকার সহায়তা করবে তারাও নরহত্যা-পরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডনীয় হবে।

হুগলী জেলায় ভাগীরথীর পশ্চিমতীরেই অধিকাংশ সতীদাহ সম্পন্ন হত। ১৮২৯ খৃ: হুগলীর জেলা শাসক হ্যালিডে সাহেব স্বচক্ষে সহমরণ প্রত্যক্ষ ক'রে লিখেছিলেন :—

"Such things were frequent in Hooghly as the banks of that side of the river were considered particularly propitious for such sacrifices."

রিষড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তৎকালে যে সমস্ত সতীদাহ হয়েছিল তার কোন কোনটির উল্লেখ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়।

১৮২০ খৃ: ৮ই জানুয়ারি সমাচার দর্পণে রিষড়ায় অনুষ্ঠিত সহমরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। (৮৬ সংখ্যা, ১২২৬/২৫ পৌষ)

"৫ই জানুয়ারি ২২ শে পৌষ মোং রিষড়া গ্রামের এক ব্যক্তি বারুই জাতি মরিয়াছিল—তাহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছে।"

এরপর বোধহয় রিষড়ায় আর কোন সতীদাহ হয়নি। কোন্নগর নিবাসী কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে চারজন স্ত্রী

তৃতীয় দিনে অনুমৃতা হন। এ'কদিন দাউ দাউ ক'রে স্বামীর চিতা জ্বলেছিল। (সমাচার দর্পণ— ১৫ই নভেম্বর ১৮২৩)

এক কথায়, এযুগটা ছিল রামমোহনের যুগ। তাঁর সাহস, অগাধ পাণ্ডিত্য, সুবুদ্ধি-প্রসূত কার্যকলাপ দেশবাসীকে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিল ; নূতন চিন্তাধারার আলোকে উদ্ভাসিত এবং নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছিল। তিনিই ছিলেন আধুনিক যুগের স্রষ্টা ও পথিকৃৎ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে তাঁর পিতা রামকান্ত শ্রীরামপুরের পণ্ডিত শ্যামসুন্দর বাচস্পতির কন্যা তারিণী দেবীকে বিবাহ করেন।

রাজার প্রচলিত জীবনীতে তাঁর জন্মস্থান রাধানগর বলে উল্লিখিত হলেও শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ও প্রত্ন তাত্বিক শ্রীফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু প্রাচীন কাগজপত্র থেকে প্রমাণ করেছেন যে তৎকালীন সর্বজন আচরিত প্রথানুযারী তদীয় জননী তারিণী দেবী শ্রীরামপুরে পিতৃ গৃহে অর্থাৎ স্বনামধন্য দেশগুরু ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে সন্তান প্রসব করেন এবং ষষ্ঠদিনে সূতিকা-ষষ্ঠী পূজার পর ৭ম দিনে নবপ্রসূত সন্তানসহ ১৬ বেহারার ডোলে ক'রে রাধানগরে শ্বশুরালয়ে নীত হন। —(বসুমতী—২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২)

শ্রী রামপুর পঞ্জিকা।

এই সময় শ্রীরামপুরে যে দুটী ঘটনা ঘটেছিল তার দ্বারা এতদঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয়েছিলেন। প্রথমটি হল ১৮২৫ খৃঃ শ্রীরামপুর পঞ্জিকার প্রথম প্রকাশন। হিন্দুদের সকল প্রকার বারব্রত, ধর্মকর্ম এবং বিবাহাদি সংস্কার কার্যে পঞ্জিকার প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। এখনকার মত দেওয়াল-পঞ্জিকা না থাকায়, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমার সঠিক বিবরণ

জানবার জন্যে তখন ভট্টাচার্য বাড়ী ছুটতে হত।

ইতিপূর্বে পঞ্জিকা বিশেষ সহজলভ্য ছিল না, এবং পঞ্জিকা বললে নবদ্বীপ পঞ্জিকাই বোঝাত। সেই পঞ্জিকার প্রধান প্রধান বিধান ও ধর্মকৃত্যগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাতে লিখে নিতে হত। কাজেই ছাপার অক্ষরে পাঁজি পেয়ে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বহু অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

সেই সময় শ্রীরামপুর পঞ্জিকা ছাড়াও খানাকুল ও বালির পঞ্জিকাও প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৩০ খৃ: শ্রীরামপুর 'চন্দ্রোদয়' প্রেস থেকে কেশব কর্মকার কর্তৃক যে মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে ১৮৩১ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর (২১শে ভাদ্র ১২৩৮) সমাচার দর্পণে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয় :—

"পুস্তক বিক্রয়:—পশ্চাৎলিখিত পুস্তক সকল চন্দ্রিকা কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে। ১২৩৮ সালের পঞ্জিকা···মূল্য ১ টাকা।" এই পঞ্জিকার পাতার সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শত।

গ্রহাচার্য গণ নূতন পঞ্জিকা প্রকাশের পর গৃহস্থবাড়ীতে ঘুরে ঘুরে বর্ষফল শুনিয়ে যেতেন। সকলে শুদ্ধাচারে গলবস্ত্র হয়ে ভক্তিভাবে রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতির প্রভাব এবং ব্যক্তিগত বর্ষফল ও মাসফল শুনতেন এবং তদনুযায়ী শক্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতেন। গ্রহাচার্যগণ প্রত্যেক বাড়ী থেকে উপযুক্ত সিধা ও পয়সা সংগ্রহ করতেন। পঞ্জিকা দেখার বিদ্যাটি তখনও সকলে আয়ত্ব করতে পারেন নি। এর জন্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হত।

তখনকার পঞ্জিকা মধ্যে অবশ্য আজকের মত সচিত্র বিজ্ঞাপনের গোলকধাঁধা থাকত না ; বড়জোর থাকত দু'একটা কবিরাজী ওষুধের নিষ্প্রাণ ঘোষণা। পূজাপার্বণের ছবি দু'একটা থাকত কাঠের ব্লকে তৈরী।

লেখকের গৃহে রক্ষিত শতাধিক বর্ষের অতি প্রাচীন পঞ্জিকা-গুলোর আখ্যাপত্র কালের প্রলেপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। ১২৬৮ সালের পঞ্জিকার অক্ষত আখ্যাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :—

নূতন পঞ্জিকা।

শকঃ ১৭৮৩ সন ১২৬৮ ইং ১৮৬১/৬২

নবদ্বীপাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুত শ্রীসতীশ চন্দ্র নৃপস্তেবনুজ্ঞয়া

সৎ পঞ্জিকেয়ং সম্মুদ্রিতা

আদিত্যাদি নবগ্রহরতশিবাঃ সংনম্য সৎপঞ্জিকাং

শ্রীমন্মাধবভূসুরো বিতনুতে গঙ্গাধবাদেশতঃ।

শাকে বহ্নি গজাশ্বচন্দ্র বিমিতে চন্দ্রোদয়ে যন্ত্রকে

শিল্পাঢ্যে নচ কৃষ্ণচন্দ্র গুণিনাদিষ্টা প্রযত্নাদভূৎ

বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রচলিত।

বঙ্গদিনের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতি দিবসীয় তথ্যাদি জ্ঞানার্থ নিরূপণ করিয়া প্রাত্যহিক লগ্ন মুহূর্ত্ত ভুক্তি এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সম্মত শুভক্ষণ শ্রাদ্ধদিনাদি নির্ণয় পূর্ব্বোক্ত ও খোনার নানা প্রকার বচন এবং হরিভক্তি-বিলাসের মত একাদশীর ব্যবস্থা।

গঙ্গাধর কর্ম্মকারের অনুমত্যনুসারে

শ্রীরামপুর

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই পঞ্জিকা যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি মোং শ্রীরামপুরে আসিয়া লইবেন আর কলিকাতার হাড়কাটার গলির পঞ্চাননতলার নিজ উত্তর নং ৭ বাটীতে পাইবেন।

নববর্ষ উৎসব

রিষড়ায় তখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দোকানের সংখ্যাও বেশ কিছু বেড়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে মুদিখানার দোকানেই সর্বাধিক হালখাতা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। নববর্ষের সাদর সম্ভাষণের 'গণেশ-মার্কা' লালচিঠির প্রচলন ছাপাখানার দৌলতে ক্রমশঃ চালু হয়ে গিয়েছিল। সে উৎসবটি ছিল আনন্দ-মুখর। মোণ্ডা মেঠাই ও পান গোলাপজলের বিনিময়ে চক্ চকে রূপোর টাকা গুণে দিতে হত দোকানদারের প্রতিনিধির হাতে, সেগুলো দুটো আঙ্গুলের সাহায্যে টুশকি মেরে সশব্দে বাজিয়ে নিত। কখনও কখনও কালবৈশাখীর ঝড় ঝাপটায় দোকানদার ও খরিদ্দারের মন বিষন্নতায় ভরে উঠত। নববর্ষে পূজানুষ্ঠানের ব্যয় ও উৎসবের তৎকালীন আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যেত। দোকানদার বাকী-বকেয়া আদায়ের সুযোগ থেকে হত বঞ্চিত।

নববর্ষ মানেই নূতন যুগের আশা। একটা বছরকে বিদায় দিয়ে নূতন বর্ষকে আহ্বান করা। দুঃখ-নিশার অবসানে সুখের দিনের অরুণোদয়। পুত্রকন্যার বিবাহের দিন স্থির, সুলভে প্রচুর শস্য সম্পদ প্রাপ্তির আশা। গর্ভবতী গাভীর বৎসলাভের মাধ্যমে মাণিক পীরের দরগায় ও বাবা সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবার মানত; সব একসঙ্গে এসে মানুষের মনে উঁকি ঝুঁকি মারত। তার হয়তো কতকগুলো পূরণ হত, কতকটা বা অপূর্ণ থেকে যেত। ঘূর্ণায়মান কালচক্রে এইভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়ে যেত।

—

বিশ্বম্ভর সেন।

উপরোক্ত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রিষড়ার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি, যাঁরা শিক্ষায়, দীক্ষায় এবং সমাজ সেবার মাধ্যমে রিষড়ার মুখ উজ্জল করেছিলেন।

তাঁদের পরিচয় দেবার আগে বেনিয়ান বিশ্বম্ভর সেনের কথা বলা দরকার। যদিও তিনি কলকাতার অধিবাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর কর্মময় জীবনের, সৌভাগ্য অর্জনের প্রাণকেন্দ্র ছিল রিষড়ায়। সামান্য অবস্থা থেকে কি ভাবে তিনি ধনকুবের আখ্যা লাভ করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে।

রিষড়ায় Chintz ফ্যাক্টরি ছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ডাঃ ক্রফোর্ড তাঁর মেডিকেল গেজেটিয়ারে লিখেছেন যে—"In 1822 a Mr. J. Nasmyth had a Chintz factory at Rishra." ঐ কারবার উঠে যাওয়ার পর এখানে 'Bandanas' (বন্দনাজ) নামক ছাপা রুমালের কারবার আরম্ভ হয়।

হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁর পুরাতনীতে লিখেছেন—"শতাধিক বৎসর পূর্বে এখানে সাহেবদের ছাপা কাপড়ের একটি বড় কারখানা ছিল এই কারখানা দীর্ঘকাল ধরিয়া একে একে বহু ইউরোপীয়ের হস্তান্তরিত হওয়ার পর বিশ্বম্ভর সেন নামক এক ব্যক্তির হাতে আসে। এই ব্যক্তি মাসিক ৮/১০ টাকা বেতনে প্রথম কার্য আরম্ভ করিয়া শেষে ঐ কার্যের দ্বারাই প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছিলেন। বিলাতি কলের বস্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার এই ব্যবসা ক্রমে লোপ পায়। পরে উহার পরিবর্তে রেশমী রুমাল ছাপার কাজ এই স্থানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।"

"One of the places of peculiar interest in Rishra is a factory which must have existed a century ago, and which, after passing through various hands became the property of one Bissembher Sen in 1833."

"Chintz This industry, of which I find mention as early as 1822, is said (like indigo) to have been originally introduced by Mr. Princep. In the above year Mr. J. Nasmyth had a chintz manufactory at Rishra, and

there appears to have been one also at Champdani, a little higher up the river. Both are now the sites of large and thriving jute mills. At the former place Warren Hastings used often to reside ; ... ... This industry, like that of the ordinary cloth-weaving, was ruined by the cheaper Manchester goods of the same kind. That of printing bandanas or silk handkerchifs had in 1845 taken its place, and that in Rishra was then owned by one Bissembher Sen & Champdani by Mr. W. Storm."

—A Sketch of the Administration of the Hooghly Dist.—George Toynbee.

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এখন যেখানে হেষ্টিংস জুটমিল, সেইখানেই ছিল বিখ্যাত রেশমী রুমাল ছাপার কারখানা যাকে ভর করেই স্বত্বাধিকারী বিশ্বম্ভর সেনের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'য়ে তাঁকে কোটিপতি করে তুলেছিলেন এবং তার দৌলতেই তিনি বেনিয়াম বিশ্বম্ভর সেন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

রিষড়ায় ভারতের প্রথম জুটমিল স্থাপনে তাঁর অবদানের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে 'রিষড়ার প্রসঙ্গে' লিখেছেন যে :—

"রিষড়ায় কলিকাতা নিবাসী বিশ্বম্ভর সেনের নীলের ব্যবসায় ছিল। যখন নীলের ব্যবসায় মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, তখন ১৮৪৪ খৃঃ বিশ্বম্ভর সেন ও মিঃ ডবলিউ ষ্টর্ম রিষড়ায় ছাপা রুমালের কারবার করেন। বিশ্বম্ভর অতি সামান্য অবস্থা হইতে কোটিপতি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ওয়েলিংটন মিল এর জায়গাও বিশ্বম্ভর সেনের ছিল। বিশ্বম্ভর রিষড়ায় একটি ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান হেষ্টিংস মিল ও উহার রেসিডেন্টাল কোয়ার্টারের মধ্যে যে রাস্তাটি আছে, উহার পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গার উপর

ঐ ঘাট বর্ত্তমান। কালের বিষম পরিবর্ত্তনে উহার নাম হইয়াছে হেষ্টিং ঘাট। কারণ উহার দুই পার্শ্বেই মিলের জায়গা। আবার উহা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাট নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ৺বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ছিলেন, তখন তাঁহার পিতা শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ঐ রাস্তার নাম হয় শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাট ষ্ট্রীট।"

হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁর 'পুরাতনীতে' এই ঘাটের যে আলোক চিত্র প্রকাশ করেন তা যথাস্থানে পুর্নমুদ্রিত হয়েছে। এই ঘাটের চাঁদনি জীর্ণদশা প্রাপ্ত হওয়ায়, হেষ্টিংস মিল কর্ত্তৃপক্ষ ১৯২৮/২৯ খৃঃ উহা পুনর্নির্মাণ করেন। সেই সময় চাঁদনির শীর্ষদেশে ঘাট প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত শিলালিপিটি স্থানান্তরিত হয়। দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কাজেই এই ঘাট প্রতিষ্ঠার সঠিক সন, তারিখ পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটি ১৮৩৫ থেকে ১৮৪০ খৃঃ ধরে নিলে খুব ভুল হবে বলে মনে হয় না, কারণ ঐ সময় থেকেই তাঁর লক্ষ্মীলাভের সূত্রপাত। প্রাচীনত্বের দিক থেকে তিলোক রাম দাঁর ঘাটের পরেই এর স্থান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে ১৯১৬/১৭ খৃঃ উক্ত ঘাট, চাঁদনি ও শিবলিঙ্গ সহ দু'টি ঠাকুর ঘর এবং তৎসংলগ্ন জমি ও ভাড়াটিয়া লাইন ঘরগুলি হেষ্টিংস মিলের স্বত্বাধিকারী বার্কমায়ার ব্রাদার্স কিনে নেন।

উক্ত সম্পত্তি কেনা বেচা সংক্রান্ত যে মামলার সৃষ্টি হয় তা শেষ পর্যন্ত হুগলী সবঅরডিনেট জজ ললিত মোহন দাসের এজলাসে ১৯১৯ সালের ৩১ শে মার্চ্চ নিষ্পত্ত হয়। (সুট নং ৭২/১৯১৭)

মামলার রায় অনুযায়ী বিবাদীপক্ষ সমস্ত সম্পত্তি মাত্র ৪১০০ টাকায় বিক্রয় করতে বাধ্য হন। বার্ক মায়ার ব্রাদার্স অবশ্য ঐ স্নানের ঘাট এবং উহার উত্তর পার্শ্বে শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্ত্তৃক নির্মিত ফিমেল ঘাট এবং চাঁদনির উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত শিবলিঙ্গ দুটী সাধারণের ব্যবহার্য বলে স্বীকার ক'রে নেন। রায়ের

অংশ বিশেষ পাঠক বর্গের অবগতির জন্যে নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

"In the present case the plffs have relinquished all claims in respect of the two rooms under the chandni in which the Sivalingas are located and also in respect of the bathing ghat which has been constructed by the Municipality for the use of the females······There is no reason to suppose that this will in any way interfere with the right of the public or cause any annoyance to them---." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উক্ত মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও রায়ের নকল স্বর্গীয় চুনীলাল মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ইহাতে উল্লেখ আছে যে পূর্বে শিবলিঙ্গ দুটির নিত্য পূজক ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ পরে উড়িষ্যাবাসী পূজক নিযুক্ত হন। আরও জানা যায় যে ৺বিশ্বম্ভর সেনের পুত্র শ্রীনাথ সেন অপুত্রক অবস্থায় ১৮৮১ খৃ: পরলোক গমন করেন এবং তদীয় বিধবা পত্নী আন্তরমণি দাসী (এতদঞ্চলে ঘাটের গিন্নী নামে পরিচিতা) বাং ১৩১৬ সালের কার্ত্তিক মাসে (ইং ১৯০৯) পরলোক গমন করার পর সমস্ত সম্পত্তি শ্রীনাথ সেনের ভাগিনেয়গণ: মহেশ চন্দ্র মল্লিক, রাম সেবক মল্লিক, গোপাল চন্দ্র মল্লিক ও গোকুল চন্দ্র মল্লিক হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত হন।

বিশ্বম্ভর সেনের ধনাঢ্যতা সম্বন্ধে 'কলকাতা রিভিউ' নামক পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:—

"At the northern extrimity of this village stands a factory which has existed for half a century, and passed successively through hands of various European houses of business into those of its late possessor Bissumbhar Sen. It was one of the oldest and most profittable chintz factories in the coutry, having been established not long after

Mr. princep had introdueed the art. The house and grounds now belonging to the family of Bissumbhar Sen, who affords an example of the large fortunes which the vast traffio of the country and especially of calcutta, combined with the confidence of our institution, inspire, enable natives to accumulate in the space of a single life.

This man began his career upon eight or ten rupees a month, and before his death had created a large fortune of some two hundred thousand pounds out of nothing, by dint of economy, Skill and perseverance ."

Calcutta Review, 1845. Vol—IV

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিশ্বম্ভর সেন সামান্য অবস্থা থেকে কিভাবে নিজের চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যাবসায় গুণে মৃত্যুকালে প্রায় দুইশত হাজার পাউণ্ড রেখে যেতে পেরেছিলেন। ব্যবসাসূত্রে তিনি বহু ব্যবসায়ীইউরোপীয়ানের সংস্রবে এসেছিলেন সত্যি কিন্তু ইংরেজী ভাষায় খুব একটা কেতা দুরস্ত ছিলেন না। তৎকালীন সাধারণ বাঙালীদের মতই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী ভাষায় (চীনা ইংলিশ) কাজ চালিয়ে দিতেন এবং সেকালের সাহেবরা তার মর্মোদ্‌ঘাটন করতে পারতেন। এ সম্বন্ধে ৫ই জানুয়ারী ১৯৭১ সালের যুগান্তরে শ্রীবিমল বসু লিখিত বিশ্বম্ভর সেন সম্বন্ধে যে কাহিনীটি প্রকাশিত হয় তা বিশেষ কৌতুকপ্রদঃ—

"শুনলে অবাক হবে যে অল্পবিদ্যাই সেকালে ভয়ংকরী না হয়ে শুভংকরী হয়ে উঠত। ভয়ংকর বিপদ আর সংকট থেকে এটাই অল্পবিদ্যাধারীদের ত্রাণ করত। সেকাল বলতে আমি বলছি ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন শুরুর গোড়ার দিকটা আর কি।

'গিলেণ্ডার্স আরবট' হল সেকালের সবচেয়ে নাম করা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। সদর অফিস ছিল এদের এই সুতানটি—গোবিন্দপুর

কলকাতায়। আর কলকাতা অফিসের বড সাহেব ছিলেন মিষ্টার অ্যাণ্ডারসন। ······শ্রীবিশ্বম্ভর সেন মশাইয়ের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে তাঁর লেনদেন ছিল। সেনমশাই ছিলেন শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। মস্ত ধনী লোক। তিনি একাই ছিলেন পঁচিশটি ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বেনিয়ান। বিশেষ ইংরেজী জানতেন না—কয়েকটি ইংরেজি শব্দ সম্বল করে তিনি সাহেব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চমৎকার কথাবার্ত্তা বলতেন। শব্দের ভাঁড়ারে যখন টান পড়ত হাত পা নেড়ে ভুরু নাচিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে কাজ সারতেন।

একবার হয়েছে কি গিলেণ্ডার্স কোম্পানী থেকে এক জাহাজ তিল চালান গিয়েছে লিভার পুলের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে। একদিন সেখান থেকে খবর এল মাল এসেছে বটে তবে কয়েকটন কম।

খবর শুনে তো বড় সাহেব অ্যাণ্ডারসন্ ক্ষেপে অস্থির। যাকে সামনে পান তাকেই ধমকান। অফিসের সুনাম আর রইল না। ছিঃ ছিঃ দেড়টন মাল কম !

এমন সময় বিশ্বম্ভর বাবু অফিসে এলেন। বাঘ যেমন বিকট গর্জন করে শিকারের ওপর ঝাঁপিযে পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে চেয়ারে বসে বসেই হুংকার ছাড়লেন অ্যাণ্ডারসন। তিনি ভাবলেন আসল অপরাধীকে এবার পাওয়া গেছে সেনই যত অনর্থের মূল। লিভার-পুলে মাল কম যাওয়ার জন্যে তুমিই দায়ী বিশ্বম্ভর।

সেন মশাই হাসিমুখে শান্ত গলায় বললেন : আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ······

আমিই দোষী। কিন্তু স্যর, কাগজ কলমে একটু হিসেব করবেন অনুগ্রহ করে ?

— হিসেব ! সাহেব তো অবাক ! হিসেব ! কিসের হিসেব !

অবিচল কণ্ঠে সেন মশাই বললেন—চটপট লিখুন সার— ফ্রমমাই গো-ডাউন টু ইয়োর গো-ডাউন, ফ্রম ইয়োর গো-ডাউন ;

টু কাসটমস হাউস্, ফ্রম কাসটমস হাউস টু রিভার ব্যাংক, ফ্রম ব্যাংক্ টু শীপ, ফ্রম শীপ টু লিভারপুল পোর্ট ; স্যর-ইফ্ লিটল্ লিটল্ ফল, হাউ মাচ রিমেন ?

বিশ্বম্ভরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি শুনে আর তাঁর বুঝিয়ে বলার ভঙ্গি দেখে সাহেবের রাগ জল হয়ে গেল—তিনি কৌতুকে আমোদে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।''

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, সেন মশাই ব্যবসায়ে কোটিপতি হয়ে ছিলেন সত্যি, কিন্তু তিনি রিষড়ায় ও তার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলোর অধিবাসীদের অর্থ উপার্জ্জনের পথও খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং একটা আদর্শের প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে ছিলেন পরবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের অনুকরণের জন্যে। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

উপরোক্ত গল্প লেখক, সেন মহাশয়কে শ্রীরামপুরের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রিষড়ায় না ছিল পোষ্ট অফিস, না ছিল রেলওয়ে ষ্টেশন। পৌরসভা বলতেও সেই শ্রীরামপুর। শুধু ওয়েলিংটন জুট মিল কেন হেষ্টিংস মিলও তাঁদের চিঠির কাগজে ঠিকানা লিখতেন 'শ্রীরামপুর' বলে।

প্রাচুর্যের যুগ

'হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁর পুরাতনীতে লিখেছেন যে ,রিষিড়ার সমৃদ্ধিও এখনকার তুলনায় (পুরাতনী লেখার সময় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) পূর্বে অধিক ছিল,'' সত্যই তখন রিষড়ার সীমিত লোক সংখ্যা হেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাববোধ ছিল না, দ্রব্যমূল্যও ছিল অত্যন্ত সুলভ। আজকের মত লোক সংখ্যার আধিক্য (বাঙালী ও অবাঙালী) সে যুগে এমন অসহনীয় হয়ে ওঠে নি।

ব্রহ্মোত্তর ও দেবত্তোর কৃষিভূমি থেকে তখন বহু পরিবারেই ধান, চাল, খড়, গুড়, আলু প্রভৃতি বামুনআড়ি, মোড়পুকুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই করে এসে উপস্থিত হত। তার কোন হিসাব নিকাশ থাকত না। জনমজুর ও বাড়ীর পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যরাই তা গুদামজাত ও মরাই ভর্তি করে তুলে রাখত। তখন প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বাড়ীতে থাকত একজন করে পুরাতন ভৃত্য বা পরিচারিকা। এরা ভৃত্য হলেও সংসারের একজন বলেই গণ্য হত, এবং এদের বুদ্ধি, পরামর্শ ও সততাপূর্ণ ব্যবহার এবং সহযোগিতা ছিল সকল ব্যাপারে অপরিহার্য। সংসারের যাবতীয় ভার গৃহকর্ত্তা এদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে গান, বাজনা, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেতে থাকতেন। এমনকি কুটুম্বিতা রক্ষা করতেও এদের সাহায্যের প্রয়োজন হত।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরাতন ভৃত্য' নামক কবিতায় এই শ্রেণীর সর্বত্যাগী, আত্মভোলা, মান অপমানহীন, অনাত্মীয় হয়েও পরমাত্মীয়ের মত সেবা-পরায়ণ পরিচারক বৃন্দের চরিত্র চিত্রণ করে এদের অমর করে দিয়ে গেছেন। শুধু ভাত কাপড় আর পূজাপার্বণে এবং বিবাহাদি উৎসব অনুষ্ঠানে এরা নগদ দক্ষিণা কিছু কিছু পেত এবং দেশঘর বলতে যাদের কিছু ছিল, সেখানে পাঠিয়ে দিত। মাস-মাহিনা বলতে তেমন কিছু ছিল না। এদের অনেকেই আসত, বান, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাকে গৃহ পরিজন হারিয়ে সম্পূর্ণ একক ভাবে। আজীবন প্রভুর বাড়ীতে থেকেই ৺গঙ্গা লাভ করত।

রিষড়ার বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা এই শ্রেণীর পুরাতন ভৃত্যদের কথা আজও স্মরণ করে থাকেন। এদের সততা, আসন্ন মৃত্যুমুখ থেকে পুত্রকন্যাদের প্রাণ বাঁচান প্রভৃতি কত কথাই এঁরা আজও ভুলতে পারেননি। বাল্যস্মৃতি চারণায় হয়তো অনেকেরই মনে পড়ে যায় সেই পুরানো মুখখানা, সেই হাতখানা, যে হাতে করে টিফিনের সময় স্কুলে

পৌঁছে দিত, দুধ নারকেল নাড়ু বা ফল মিষ্টি, আবার কখন কখন সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে আসত—গাড়ী-ঘোড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

সে যুগের সঙ্গীত চর্চা

এই প্রাচুর্যের যুগেই রিষড়ায় জন্মলাভ করেছিল সঙ্গীত চর্চার উপযুক্ত অবসর। নীলকমল পাকড়াশী মহাশয় (শ্রী অমর নাথ পাকড়াশীর পিতামহ) ছিলেন সে যুগের একজন সঙ্গীত শিল্পী। সেতার বাজনায় তাঁর বেশ হাত যশ ছিল। রিষড়ার বাহিরে খড়দহ, বল্লভপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গীতকলা পরি-বেশন করতেন।

শীলেদের বাড়ীতেও পুরাতন পূজার দালানে সঙ্গীত চর্চার আসর বসত বলে জানা যায়, এইখান থেকেই প্রসিদ্ধ কবিয়াল কৈলাস আশের (বারুই) সঙ্গীত শিক্ষায় অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, এবং পরবর্ত্তী জীবনে তিনি তাঁর 'বিদ্যা সুন্দর' পালা গানে বহু আসর মাত করে-ছিলেন, সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

বংশ বিস্তারের দ্বিতীয় স্তর।

ইতিমধ্যে রিষড়ায় আরও কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার বিভিন্ন সূত্রে এসে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় বংশগুলি অন্যতম।

বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূত ভট্টনারায়ণ বংশের পণ্ডিতরত্ন মেলের

রামদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভঙ্গ) প্রথম রিষড়ায় আসেন। তাঁর ধর্মদাস, রামলোচন, রামজয়, রামমোহন, কাশীনাথ ও কালীনাথ নামক ছয় পুত্র। ধর্মদাসের দুইপুত্র—রামচাঁদ ও নীলমণি। রামচাঁদের বংশে রায় সাহেব ঠাকুরদাস বন্দোপধ্যায়ের জন্ম। রামলোচনের বংশে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউসনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শরৎচন্দ্র। রামলোচনের তৃতীয় পুত্র রামনারায়ণের দুইপুত্র,—বৈদ্যনাথ ও তারকনাথ। রামজয়ের বংশে মুন্সেফ্ নিবারণ ও তৎপুত্র মণিলাল। কাশীনাথের বংশে সন্তোষ, সুধীর, এককড়ি, লক্ষ্মীকান্ত। নীলমণির বংশে সতীশচন্দ্র ও তৎপুত্র শশাঙ্ক। রামদুলাল বন্দ্যোঃ থেকে বর্ত্তমানে ছয় পুরুষ চলছে।

দ্বিতীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ আরম্ভ হয়েছে ভবাণী শঙ্কর থেকে। তিনি দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের অনুজ রামমোহনের কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। এই সম্বন্ধে দেওয়ানজী বংশের পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি থেকে কিয়দংশ উদ্ধার যোগ্য :—

"উপস্থিত এখানে কালীতলার নৈকস্য কুলিন বন্দ্যোপাধ্যায়-গণের পরিচয় কিছু দিতেছি। দাওয়ান রামমোহন, দাওয়ান রামনিধির অনুজ ভ্রাতা। অর্থাৎ আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের এক কন্যা আনন্দময়ীর গর্ভে দয়ালচাঁদ, বদনচাঁদ ও তারাচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। দয়ালচাঁদের পুত্র নীলকণ্ঠ, বদনচাঁদের পুত্র বামাচরণ ও তারাচাঁদের পুত্র গোবিন্দলাল ও প্যারীলাল ও এক কন্যা পতিত-পাবনী, যাঁহার স্বামীর নাম ছিল উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, যাঁহার বাটি ইদানীং হেডমাষ্টার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা ৺নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রয় করিয়া এবং কিছুকাল ভোগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন।

নীলকণ্ঠের, কিশোরীলাল, অমৃতলাল, প্রিয়নাথ, শশীভূষণ ও বিদ্যাভূষণ এই পাঁচপুত্র জন্মে। সুতরাং ইঁহারা দাওয়ানজী বংশের

দৌহিত্র সন্তান। ইহাদিগের আদি ভিটা কোথায় ছিল আমি জানিনা।

দাওয়ানজীরা কন্যাদানের সময় কিছু ২ ভূমিও (বাসের জন্য) দান করিতেন কারণ তখনকারের বর্দ্ধিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশের প্রথাই এইরূপ ছিল।"

এর পর উল্লেখ করতে হয় কাশ্যপ গোত্র সম্ভূত দক্ষবংশ, দেবাইগোষ্ঠী, পণ্ডিতরত্ন মেল মধুসূদনের প্র-পৌত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনিই প্রথম রিষড়ায় এসে বসবাস করেন। তাঁর অপর চার ভ্রাতা ছিল। চণ্ডীচরণের পুত্র মহেশ এবং তৎপুত্র তেজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি নবীন সেন মহাশয়ের আমলে পুলিশ বিভাগে চাকরী করতেন এবং তৎকালে তাঁর ঘোড়ার গাড়ী ছিল বলে কথিত হয়। ইঁহার কন্যার সঙ্গে ভাণ্ডারহাটি নিবাসী ৺দ্বারিকানাথ বন্দোপাধ্যায়ের প্রথম বিবাহ হয়। তিনি রিষড়া ষষ্ঠীতলাষ্ট্রীটে (বর্ত্তমান এন, কে, ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটে) বসবাস স্থাপন করেন। ইঁহার সম্বন্ধে পরে আলোচিত হয়েছে।

ইঁহাদের বাড়ীর সন্নিকটেই উল্লেখ যোগ্য হলেন হরমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁর তিন পুত্র, নবকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ ও নিবারণ চন্দ্র। নবকৃষ্ণের পুত্র সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ নিবাসী), গোপীকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস।

ইঁহাদের পাকা পূজার দালান কালক্রমে ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। শোনা যায়, ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল উলা বা বীরনগর।

পূর্বোক্ত রামদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়গণের বংশ তালিকা রিষড়া নিবাসী তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে এবং অর্থানুকুল্যে আড়িয়াদহ (দক্ষিণেশ্বর) নিবাসী কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংকলন করেন এবং মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় বন্দ্যোপাধ্যায়গণের (দেওয়ানজীদের দৌহিত্র সন্তান)

বংশ তালিকাও বর্ত্তমানে মুদ্রিত আকারে উক্ত বংশের অনেকের গৃহেই অবস্থিত আছে।

দেওয়ানজী বংশ ও দেওয়ানজী ষ্ট্রীটস্থ চট্টোপাধ্যায় বংশের (ইঁহাদের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে) মুদ্রিত বংশ তালিকাও তাঁদের সমগ্র পরিচয় বহন করছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত বংশগুলি (তিন পুরুষে একশত বৎসর হিসাবে) এবং পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটস্থ মুখোপাধ্যায় বংশ ও হালদার বংশ দেড়শত থেকে কিঞ্চিৎ অধিক দুইশত বৎসরের মধ্যে রিষড়ায় আগমন করেন বলে মনে হয়। রিষড়ার শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে ইঁহাদের অবদান বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিশেষ বিশেষ উন্নতিমূলক কার্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে এইসব বংশের ব্যক্তি বিশেষের বিশিষ্ট অবদান উল্লেখ করা ছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের জীবনী লিপিবদ্ধ করা যে বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্ভব নয়, সে কথা সহজেই অনুমেয়। অনবধানতা বা অজ্ঞতাজনিত ত্রুটী বিচ্যুতি মার্জনীয়। সুযোগ পেলে, দ্বিতীয় সংস্করণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের পরামর্শ ও উপদেশ কার্যকরী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

গুপ্তবংশ

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগের বৃদ্ধিও প্রাসঙ্গিক, কাজেই ডাক্তার বৈদ্যের প্রয়োজনীয়তা তখন থেকেই বিশেষভাবেই অনুভূত হতে থাকে। শিশুদের চিকিৎসার জন্যে অবশ্য তখনও বর্ষিয়সী অভিজ্ঞা মহিলাদের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হতে থাকে।

গুপ্তবংশের (বৈদ্য) রামজীবন গুপ্ত আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রিষড়ায় বসবাস স্থাপন করেন। তাঁর চারপুত্র:— পীতাম্বর, দীগম্বর, নীলাম্বর

ও ত্রিপুরারী গুপ্ত। ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বৈদ্যবংশ সম্বন্ধে লিখেছেন যে "ইহারা তৎকালে প্রসিদ্ধ বৈদ্য ছিলেন, ইঁহারা তন্ত্রোক্ত নিয়মে নিজেরা ঔষধ প্রস্তুত করিতেন। এই বংশের আশুতোষ গুপ্তকে (ত্রিপুরারী গুপ্তের পুত্র) আমরা চিকিৎসা করিতে দেখিয়াছি, চাকরি করিতে দেখিনাই। শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ গুপ্ত ইনিও কিছু ২ চর্চ্চা রাখিতেন এবং চাকরিও অর্থাৎ পণ্ডিতি করিতেন।"

অন্যান্য বংশ।

রামজীবন আশ, রামদাস শীল প্রভৃতি বারুজীবিরাও তখন রিষড়ায় বসবাস করছেন। শীলেদের তখন পাকা পূজার দালানে দুর্গোৎসব হত। সে পূজার দালানের ধ্বংশাবশেষ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বজায় ছিল। পঞ্চানন তলা, ষ্ট্রীটের স্বরূপচন্দ্র লাহা, অক্রুর লাহা প্রভৃতি বারুজীবিদের বংশও ছিল তখন উল্লেখযোগ্য বংশগুলির অন্যতম। ইঁহাদের বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা যথা স্থানে আলোচিত হয়েছে। স্বজাতীয় ব্যবসায়ে ইঁহাদের অবদানের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে এবং তৎকালীন রিষড়ার জনসংখ্যার অনুপাতে ইঁহাদের স্থান একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করত।

ভূতের ভয়।

রিষড়ায় তখন ভূত, প্রেত, ডাইনী প্রভৃতির ভয় বিশেষ ভাবেই বজায় ছিল। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই সব অপদেবতারা বিরাজ করতেন। বিশেষ ক'রে, এঁদের অস্তিত্বের আবাসস্থল ছিল মানুষের তৎকালীন বিশ্বাসের উপর নির্ভর শীল।

ভূত থাকলেই ওঝা থাকতে হবে। সে যুগে ভূত ছাড়াবার কতরকম প্রক্রিয়ার কথা লোক মুখে প্রচলিত ছিল। শুধু কি তাই,

ছোট ছেলে মেয়েদের ডাইনীতে রক্ত শুষে খেয়ে নিত বলে কত বিচিত্র আশঙ্কার কথা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। রিষড়ার মধ্যে কয়েকটি স্থান ছিল ভূত প্রেতের আবাসস্থল হিসাবে মার্কামারা. রাতের অন্ধকারে সেই সব জায়গা দিয়ে যাবার সময় স্বভাবতই মানুষের গা ছমছম করত এবং দ্রুত তালে পা ফেলে 'রামনাম' করতে করতে এলাকাটা পার হয়ে যেত।

মুন্সী মশাই শ্রীমাণি বাড়ী থেকে রাত্রে শীতল দিয়ে ফেরার সময় মাঝপথে বেনে পুকুরের পশ্চিম ধারে ঘোষেদের বাড়ীর পাশের বড় তালগাছটা থেকে একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে দুধের ঘটিটা হঠাৎ তুলে নিলে। উনিত হাতে পৈতা জড়িয়ে রামনাম করতে করতে শূণ্যহস্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। পরের দিন সকালে দুধের ঘটিটা পড়ে থাকতে দেখা গেল তাল গাছটার নীচে।

হড়মশাই আসছেন লাহা বাড়ী থেকে, পথের মাঝে তাঁর আগে আগে মনে হচ্ছে একটা গরু চলেছে ঘাস খেতে খেতে; মস্ মস শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় গরু? গো-ভূত না হয়ে যায় না। দুপাশে বাগান, জনমানব শূণ্য অন্ধকার রাতে এহেন অবস্থায় অতিবড় সাহসীরও বুক দুরদুর করে উঠে। সাহসে ভর ক'রে তিনি হাতের লাঠিটা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে এগিয়ে আসেন লোকালয়ের মধ্যে। মুখে চলছে শুধু রাম নাম।

পাকড়াশী মশাই আসছেন বেনেদের বাড়ী থেকে সত্যনারায়ণ সেরে। পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটছে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে দেখেন বড় ভুরকুণ্ড গাছটার গোড়া থেকে, সাদা ধবধবে থান পরা একজন মেয়েছেলে অন্ধকারে সরে গেল। এর আগে এই বংশেরই আরেকজন দেখেছিলেন একটা কাল কুকুরকে লক্‌লকে জিভ বের ক'রে দেওয়ানজীদের হেলা কাঁঠাল গাছটায় নীচে অদৃশ্য হয়ে যেতে।

এমনই সব গল্প কাহিনী তখন লোকের মুখে মুখে শোনা যেত।

বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে আসর জমে উঠত। শিশুরা ভয়ে ঠাকুর-মাকে জড়িয়ে ধরে কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ত। ঠাকুরমা অবশ্য ছড়া কেটে বলতেন :—

"ভূত আমার পুত, শাঁখচুন্নি আমার ঝি।
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?"

গলায় দড়ি দিয়ে কিম্বা কাপড়ে আগুন ধরিয়ে বা বিষ খেয়ে আত্মঘাতীরাই প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়ে এইভাবে ঘুরে বেড়াত বলে লোকে বিশ্বাস করত। ব্রাহ্মণরা অপঘাতে মৃত্যু হলে ব্রহ্মদৈত্য হত ইত্যাদি। পুকুর পাড়ে আলেয়া ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের কোন রকম সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ঝড় নেই, ঝপটা নেই, ঘরের দরজা জানালাগুলো আপনা থেকে বন্ধ হচ্ছে আবার খুলে যাচ্ছে কোনও অদৃশ্য প্রেতাত্মার হস্তক্ষেপে, এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে শোনা যেত। গয়াধামে প্রেত শিলায় পিণ্ডদান করলে তবে এইসব প্রেতাত্মা মুক্তি পেত। কিন্তু গয়াধামে যাওয়া আজকের মত সহজ সাধ্য ছিল না। উপযুক্ত সঙ্গী চাই, চাই পথ খরচা, তার উপর সুদীর্ঘ পথ হাঁটার মত শক্তিমান পুরুষ। এ তিনের সমন্বয় ঘটানো অনেক সময় দুষ্কর হয়ে উঠত। কাজেই দীর্ঘদিন ধরে চলত পূর্বোক্ত ধরণের ভূতের উপদ্রব। তার উপর ভূতে পাওয়া রোগী বা রোগিণীদের অবস্থা ছিল আরও সাংঘাতিক। ওঝাদের মন্ত্রতন্ত্রের ফলে এবং নানাবিধ প্রক্রিয়ার ফলে এই সব রোগীরা অনেক সময় প্রেতাত্মার কবল থেকে উদ্ধার পেত। অবশ্য ওঝাদের মধ্যেও এ বিষয়ে শক্তির তারতম্য ছিল।

বর্তমানে লোক সংখ্যার চাপে আর বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাইএ এই সমস্ত অপদেবতারা অন্তর্হিত হয়েছে বটে কিন্তু সে যুগে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন এবং ওঝাদেরও সমাদর ছিল প্রচুর। সুখের বিষয় আজ সে ভূতও নেই, আর ওঝাও নেই।

পাথুরে কয়লার প্রবর্ত্তন।

কেরোসিন তৈলের (খনিজ) অস্তিত্ব সম্বন্ধে তখনও লোকের কোনও ধারণা না থাকলেও খনিজ পাথুরে কয়লার অস্তিত্ব তখন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কাঠের জ্বালে রান্নার দুর্গতির কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৭৭)। বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে কাঠ পাতা ভিজে থাকলে যে কি দুর্ভোগ ভুগতে হত সে সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের নিম্নলিখিত কবিতার মধ্যে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় :—

"রান্নাঘরে কান্নাহাটী ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,
কোনো মতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোখে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে
চুলোশুদ্ধ ঢোলে যায় চুলো॥"

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক অত্যুৎসাহী উইলিয়ম জোন্স প্রথমে রাণীগঞ্জে কয়লা খনি খননের কাজ আরম্ভ করেন। রেলপথের সূচনা না হওয়ায় তখন নৌকা যোগে ঐ কয়লা এতদঞ্চলে সরবরাহ করা হত। রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা আর মেদনীপুর থেকে লবণ তখন নৌকায় ক'রে দামোদর নদ দিয়ে আমদানি হত। সে সময় হাওড়া জেলার আমতায় বহু লবণ ও কয়লার গোলা ছিল। এতদঞ্চলের ব্যবসায়ীরা ঐ স্থান থেকে আমদানি করতেন। নৌকা বোঝাই ঐ সমস্ত কয়লা ও লবণ দামোদর নদ দিয়ে গঙ্গায় এসে পড়ত এবং ভাগীরথীতীরস্থ স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত দ্রব্যসকল গোলায় গোলায় সরবরাহ করা হত।

কয়লার দাম পড়ত তখন মণ প্রতি পাঁচ আনা সাড়ে পাঁচ আনা। ১৮৩৭ খৃঃ কার-ঠাকুর কোম্পানী জাহাজটানা ব্যবসা খোলেন এবং কয়লা আমদানি করতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, রিষড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা

ক্রমশ: এই পাথুরে কয়লার ভক্ত হয়ে পড়েন এবং এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। শিশু ও রোগীদের পথ্য তখনও অবশ্য কাঠের জ্বালেই পাক করা হত। তখন এই লবণ ও কয়লার আড়ত খুলে কিছু কিছু ব্যবসায়ী একটা নূতন পথের সূচনা করেন, যার ফলে কিছু লোকের দৈনিক কাজকর্ম জুটে যায়। এইভাবে, ক্রমশ: কৃষি-নির্ভরতা হ্রাস পেতে থাকে এবং জ্বালানী কাষ্ঠের প্রয়োজনীয়তা মন্দীভূত হয়।

উত্তরে শেওড়াফুলির হাট (শনি ও মঙ্গলবার) এবং কলকাতার সঙ্গে সাপ্তাহিক দু'দিন (সোম ও শুক্রবার) ব্যবসায়িক যোগসূত্র সুদৃঢ় হওয়ায় রিষড়ার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা অনেক সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কলকাতার সদাগরী অফিসে চাকুরী সূত্রে এবং বড় বড ব্যবসায়ীদের দালালদের অধস্তন কর্মচারী হিসাবে জীবিকার্জনের একটা নূতন দিগন্ত খুলে যায়। রেলপথ বা হাওড়াব্রীজের কথা তখনও অচিন্তানীয়ই ছিল। যোগা-যোগ রক্ষা ক'রে চলছিল মহাজনী নৌকা ও ষ্টীমার সার্ভিস। যার দৌলতে কিছু কিছু অবাঙালী মাঝি-মল্লারাও এতদঞ্চলে জীবিকার্জনের সুযোগ লাভ করে।

নীল চাষের অবনতি ও মদের কারখানা।

বিভিন্ন কারণে, বিশেষত: নীলচাষীদের উপরে নীলকর সাহেব-দের অত্যাচারের ফলে যে নীল চাষ ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায় সে কথা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

রিষড়ায় তখন ইউরোপীয় প্রথায় মদ ও চিনির কারখানা স্থাপিত হয়। এই মদ ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ছাড়াও ইউরোপ ও অষ্ট্রেলি-য়ায় চালান যেত :—

During this period, non-official Europeans were

mainly engaged in the manufacture of indigo, sugar and rum……In 1795, Regulation XXIII was passed to settle the relations between the ryoits, the indigo-planters and the Govt. ……The natives, moreover, were hostile to the industry and assaults & riots were not infrequent."

The manufacture of rum according to European methods was another industry of some importance... The busines prospered for some years, the rum being not only supplied to the troops in India but also exported to Europe & Australia, and the sales in 1829 amounted to 61028 gallons. Other distilleries sprang up at Ballavpore, Rishra Konnagar etc, but owing to the fall in the price of rum exported to Europe the industry became extinct about 1840."
—Occupations, Industries & Trade (Hooghly Dist. Gazetteer Mr. O'mally)

রিষড়ার মদের কারখানার মালিক ছিলেন মিঃ জি, ম্যাকনেয়ার।

— O —

আকর গ্রন্থরাজি

১। পুরাতনী--হরিহর শেঠ।
২ হুগলী জেলার ইতিহাস—সুধীর কুমার মিত্র।
৩। শ্রীরামপুর মহাকুমার ইতিহাস—বসন্ত কুমার বসু।
৪। শিবচন্দ্রদেব ও বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী—অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী।
৫। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী—ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৬। স্মৃতিচারণা (পাণ্ডুলিপি)—পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৭। স্বরূপ চন্দ্র লাহা ও অক্রূর লাহার বংশ তালিকা—শ্রীধনঞ্জয় লাহা ও শ্রীআদি কেশব লাহার সৌজন্যে।

৮। আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৯। বড়ির গয়না—মধুব্রতা···যুগান্তর ১৪/১ ৭১।

১০। বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ।

১১। হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

১২। পথ যে আমায় ডাকে—বেদুইন।

১৩। শ্রীরামপুর পৌরসভার শতবার্ষিকী—স্মরনিকা গ্রন্থ।

১৪। সেকালের এক বিস্মৃত শিক্ষক—শৈলেন কুমার দত্ত। আঃ বাঃ পত্রিকা ৬।২।৭২

১৫। এক যে ছিল টাকা—অমলেন্দু সেন, আনন্দবাজার ২১।১ ৭৩

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি।

কলকাতায় যখন ইয়ং বেঙ্গলের যুগ, নিষিদ্ধ মাংস, মদ্য ও মুসলমানের দোকানে পাঁউরুটি খেয়ে যখন ইংরেজী শিক্ষিত তরুণরা স্বজাতীয় রীতিনীতির পিণ্ডদানে উৎসাহী সেই সময় রিষড়ায় কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হন। পরবর্তীকালে যাঁদের ব্যক্তিত্ব, অধ্যবসায় ও জীবিকার্জ্জনের নব নব পদ্ধতি রিষড়াকে স্বাবলম্বিতার পথে এবং শিক্ষা দীক্ষায় যুগোপযোগী উন্নত স্তরে স্থান করে দিয়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য ব্যক্তিদের বিশেষ বিশেষ কার্যাবলী উল্লেখ করা ছাড়া তাঁদের সমগ্র জীবনী আলোচনা করা এই গ্রন্থ মধ্যে সম্ভব নয়। সে ত্রুটি অবশ্যই মার্জ্জনীয়।

এই সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জননীরা ছিলেন সে যুগের ধর্মপরায়ণা সুগৃহিনী। স্বামী পুত্রকে স্বহস্তে রন্ধন করে খাওয়ান ছিল সে সময়ে নারীধর্মের অন্যতম সার্থকতা। এমন অনাবিল তৃপ্তি বোধহয় আর কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না। অতিথির সেবা এবং গরীব দুঃখীদের যথা সাধ্য দান ছিল গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। সাধারণতঃ বিশেষ কারণ ছাড়া ভিখারীকে বড় একটা কেউ বিমুখ করতেন না। ভিখারীরাও গৃহীর মঙ্গল কামনা করেই ভিক্ষা চাইত, গৃহিনীরাও স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা করেই ভিক্ষা দান করতেন। পরিচিত বাউল ও অন্যান্য গায়কদের কুশল সংবাদ নিতেন।

বাউলদের সাজ পোষাকই ছিল আলাদা। গায়ে গলাকাটা আলখাল্লা, মাথায় ঝুটি বাঁধা চুল, কোমরে বাঁধা ডুগি আর ডান হাতে একতারা।

গিন্নীমার অনুরোধে বাউল তার এক তারায় টুং টাং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ডুগিতে টোকা মেরে মধুর স্বরে গান ধরে:—

"ও হরি তোর চরণ ধরি
যাধার মান শুনিস্ না,
কুলনারীর রূপ নেহারী
অমন পাগল হোস না।"

গান শুনতে শুনতে গিন্নীমা বিভোর হয়ে যান, ক্ষণেকের জন্যে সংসারিক চিন্তার পরিবর্তে পারমার্থিক চিন্তা এসে মনকে গ্রাস করে ফেলে। সম্বিৎ ফিরে এলে বাউলকে হয়তো বা অনুরোধ করেন সেই পুরানো শালগ্রামের গানটা গাইবার জন্যে। মা জননীকে খুসী করবার জন্যে বাউল সহাস্যে হাত উঁচু করে, ডুগিতে টোকা মেরে গাইতে সুরু করেঃ—

"বাবা শাল গেরাম, কোন্ মুখেতে বাঁশরী বাজাও ?
তোমার বুকে তুলসী পিঠে তুলসী,
গঙ্গাজল খাও কলসী কলসী,
কোন্ মুখে বাঁশরী বাজায়ে
গোপীগণের মন ভুলাও ? ইত্যাদি

গানের শেষে গিন্নীমা থালায় ভরা চাল আর পয়সা বাউলের কাঁধের ঝুলিতে ঢেলে দেন। জয়-হ'ক বলে বাউল বিদায় নেয়।

কালী কুমার দে

উপরোক্ত সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিলেন দুই ভাই—কালীকুমার ও চন্দ্র কুমার দে। পিতা মাধবচন্দ্র দের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তার উপর অল্প বয়সে পুত্র দুটিকে রেখে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতাও 'সতী' হয়েছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কালী কুমারের জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ১৮২৫/২৬ খৃষ্টাব্দে আর কনিষ্ঠ চন্দ্রকুমার জন্মেছিলেন ১৮৩০ খৃঃ। অল্প বয়সে তাঁরা পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় পিতার মাতুল রিষড়া নিবাসী ৺রসময় মিত্রের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এই রসময় মিত্রই রিষড়ার

ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন কিন্তু অকালে তাঁর পুত্র বিয়োগ হওয়ায় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দৌহিত্র ৺ষষ্ঠীচরণ দত্ত (শ্রীহরেন্দ্র কুমার দত্তর পিতামহ) এবং ভাগিনেয়-পুত্রদ্বয়কে বিভাগ বণ্টন করে দেন। এঁরা ছিলেন উচ্চ কায়স্থ বংশ এবং কালী কুমারের 'বক্সী' উপাধি ছিল এবং ঐ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

কালী কুমার ছিলেন আবাল্য কঠোর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। কালক্রমে তিনি যৌবনে পদার্পন করে ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থশালী হয়ে ওঠেন এবং একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ হিসাবে রিষড়ার অধি-বাসীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। নিজে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওয়ায় কনিষ্ঠ চন্দ্রকুমারের লেখাপড়া শিক্ষার দিকে বিশেষ যত্নবান হন।

রিষড়ায় তখন পল্লীগ্রামের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভাবেই বজায় ছিল। উঠানে দাঁড়ালে সকাল সন্ধ্যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যেত। লাউ কুমড়ার মাচা ছিল তখনও অধিকাংশ গৃহস্থের অঙ্গন শোভা। স্ত্রী-লোকেরা তখনও বারব্রত ও নিয়ম পালনে ছিলেন যত্নবতী এবং দেব-দ্বিজে ছিল অবিচল নিষ্ঠা।

রেল লাইনের অস্তিত্ব না থাকায় মোড়পুকুরের সঙ্গে ছিল অখণ্ড যোগাযোগ। সামাজিক মেলামেশাও ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ, তাছাড়া, জি, টি, রোডের ধারেই ছিল হাট, বাজার, দোকান, পাশার এবং ভোগ্যপণের বিপণি। কাজেই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় নিত্যই আসতে হত বড় রাস্তার দিকে, তার ফলে মেলামেশা এবং আলাপ অলোচনার সুযোগ অক্ষুন্ন ছিল।

কালী কুমারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায়, তিনি কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর সহায়তায় বিলাতী মদের Indent Business করার সুযোগ লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সে সময়ে কলকাতার ইউরোপীয় ও ভারতীয় মহলে মদের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, কার-ঠাকুর কোম্পানী নাকি কলকাতায় মদের স্রোত

রইয়েছিলেন বলে তুর্নাম রটে গিয়েছিল এবং ছড়ার সৃষ্টিও হয়েছিল।

মোটকথা, কালী কুমার দে (বক্সী) এই মদের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং এই ব্যবসায় সূত্রে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম তুর্গের বিশিষ্ট সামরিক অফিসার এমন কি লাট সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। অর্থ এবং প্রতিপত্তি তুই-ই তখন তাঁর করতল গত। অধিকাংশ দিনই তিনি তাঁর নিজস্ব জুড়িগাড়ীতে করে কলকাতায় যাতায়াত করতেন। সময় বিশেষে নৌকাতেও যেতেন।

তাঁর পিতার মাতুল-প্রদত্ত জায়গাজমি ছাড়াও তিনি বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন বলবান তেমনই রাশভারী। সাধারণ লোকে তাঁকে দেখে সভয়ে দূর দিয়ে যেতেন, কারণ টেরিকাটা বা চুলের বাহার করা ছেলে ছোকরাদের দেখলে তিনি কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করতেন।

তাঁর তুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। স্ত্রীর নাম ছিল বিশ্বেশ্বরী দাসী। মেয়ে তুটির নাম রেখেছিলেন—সুখদা আর মোক্ষদা। পুত্রের নাম ছিল হীরালাল। এঁদের সম্বন্ধে যথা স্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি শুধু অর্থ উপার্জন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, রিষড়ার বহু জনহিতকর কার্যেরও তিনি ছিলেন প্রবর্তক। কয়েকজন ব্যক্তির চাকুরীর মূলেও ছিল তাঁর সুপারিশ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ৺বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এবং ৺কৈলাশ চন্দ্র লাহা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রিষড়ায় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। পাঠশালা ও চতুষ্পাঠী ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। শ্রীরামপুর কলেজ ও তৎসংলগ্ন কলি-জিয়েট স্কুল স্থাপিত হলেও সেখানকার খৃষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি একটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল, কাজেই এখানকার ছাত্রবৃন্দকে উত্তর-পাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হত।

উক্ত বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৬ খৃঃ। রিষড়ার বেশ

কিছু সংখক ছাত্র তখন নৌকা যোগে এই বিদ্যালয়ে পড়তে যেতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ৺বিহারী লাল মুখোপাধ্যায়, ৺শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে রমাই বাবু (৺বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা). ৺বেণীমাধব ভট্টাচার্য, ৺কালা চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ দা প্রভৃতি।

ছাত্রবৃন্দের এই অসুবিধা দূরীভূত হয় ১৮৫৪ খৃঃ কোন্নগরে ৺শিব চন্দ্র দেব কর্তৃক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকে। তখনও কিন্তু পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। কালী কুমার দে-ই (বক্সা) এই অভাব পূরণ করে দেন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রিষড়ায় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করে। রিষড়ায় উচ্চ শিক্ষা লাভের সোপান হিসাবে এটা তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি। এই বিদ্যালয় ভবনটি আজ আর নেই কিন্তু নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত আলোকচিত্র ও প্রস্তর ফলকটির সহযোগে একটা রূপরেখা গড়ে তোলা হয়েছে, তার আলোকচিত্র গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গেই কালী কুমার স্বনামধন্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য সে পরিচয় ঘনিষ্টতর হয়ে উঠেছিল নানা কারণে, বিশেষতঃ তাঁর দুই জামাতার মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য— বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খৃঃ সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন মাসিক অতিরিক্ত দুইশত টাকা বেতনে বিশেষ স্কুল পরিদর্শক (Special Inspector of Schools) নিযুক্ত হন।

উপরোক্ত ১৮৫৭ সালটি বাংলা দেশের ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই স্মরণীয় হয়ে আছে, দুটি কারণে। প্রথমটি হল—কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি হল—সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

এই ঘটনার দু'এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৫/৫৬ খৃষ্টাব্দে মাহেশ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তার মূলেও ছিল বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের প্রেরণা ও আনুকূল্য। শোনা যায়, তিনিই উক্ত বিদ্যালয়ের (বর্তমান ইউ, পি, স্কুল) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। স্বভাবতই, প্রাক্ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রিষড়ার কয়েকজন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দাস পাড়ার সতীশ চন্দ্র দাস। তখনও ওয়েলিংটন জুট মিলের এলাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়নি, কাজেই ছাত্রবৃন্দ, বালক সুলভ চপলতা বশতঃ জি, টি, রোড দিয়ে না গিয়ে মিলের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করত। তৎকালীন দরয়ানরাও এবিষয়ে কোন বাধা দিত না।

মাহেশ বঙ্গ বিদ্যালয়ে রিষড়ার ছাত্রদের ভর্তি হওয়ার আরও একটি কারণ হল, এই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন রিষড়া নিবাসী ৺নবকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। অভিভাবকগণ এই সুযোগে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৺ কালীকুমারের দুটি জামাতা, দুটিই রত্ন। প্রথম হলেন জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র। তিনি ১৮৬৭ খৃঃ জুন মাসে হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী জজ নিযুক্ত হন এবং ভবানীপুরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে একটি বাটি ক্রয় করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নূতন বাটীতে আসার পরই তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী প্রসন্নময়ী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে একপুত্র ও এক কন্যা রেখে পরলোক গমন করেন।

জননীর উপরোধে তিনি রিষড়া নিবাসী কালী কুমারের কন্যাকে তৃতীয়া পত্নীরূপে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তিনি অত্যন্ত সুখী হয়েছিলেন।

তাঁর মাছধরায় খুব সখ ছিল, তাই বিচারপতির গুরুদায়িত্ব পালনের অবসর সময়ে রিষড়া, কোন্নগর প্রভৃতি অঞ্চলে মাছ ধরতে যেতেন। তখন অবশ্য এখনকার মত টিকিট কেটে মাছধরার প্রথা প্রচলিত হয়নি। লোকে সখ ক'রে বাটীর সন্নিকটস্থ বাগানের পুকুরে মাছ ছেড়ে রাখত এবং সময় বিশেষে, উৎসবাদি অনুষ্ঠানে বা

আত্মীয় স্বজন এলে হুইল ছিপে এইসব পুকুরে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতেন।

ছিপে মাছ ধরার নেশা তখন অনেকেরই ছিল এবং তার সাজ সরঞ্জামও ছিল বিভিন্ন ধরণের। রিষড়ার হড়বংশীয়দিগের মধ্যে দু'একজন ছিলেন এবিষয়ে সবিশেষ দক্ষ। রোগীর পথ্য থেকে আরম্ভ করে, পূজাপার্বণে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাছের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। কথায় বলে মাছেই মানুষের 'নজর' বোঝা যায়। তাই গায়ে হলুদের তত্ত্বে, নূতন কুটুম্ব বাড়ীতে বড় মাছ পাঠাতে সকলে ব্যতিব্যস্ত হতেন।

মাছ যে শুধু রসনার তৃপ্তি সাধনই করত তাই নয়; ললিত কলার অনুশীলনে, ক্ষীরের ছাঁচে, পিষ্টক এবং মিষ্টান্নাদির গঠনেও তখন মৎস্য-চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হত। অলঙ্কারের মধ্যেও মৎস্যাকৃতি, মৎস্য-চিহ্ন শোভা পেত। এমনকি কাপড়ের পাড়ে, মেয়েদের হাতের শাঁখায় মাছের সারি বিদ্যমান থাকত। বাংলা সাহিত্যে তাই মাছের কথার ছড়াছড়ি।

ভাগীরথী তীরবর্তী শ্বশুরালয়ে এসে মিত্র মহাশয় বিবিধ মাছের সঙ্গে গঙ্গার ইলিশমাছের আস্বাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করতেন। এই ইলিশমাছ ছিল তখন যেমন সুলভ তেমনি প্রাচুর্যে ভরা। টাকি অঞ্চল থেকে আগত মাছধরার জেলে ডিঙ্গিগুলো তখন গঙ্গাবক্ষ ছেয়ে রাখত।

দুঃখের বিষয় মাত্র ৭ বৎসর কাল বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৮৭৪ খৃঃ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী বৃদ্ধাজননী, সপ্তদশ বর্ষীয়া তৃতীয়া পত্নী ও দুইপুত্র এবং এককন্যা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর তৃতীয় পত্নীর (কালী কুমার দের কন্যা সুখদাময়ী-মতান্তরে ক্ষীরোদাময়ী) পুত্র ভূপেন্দ্র নাথের বয়স ছিল মাত্র ছয় মাস। এই কারণে তিনি তাঁর মেসোমহাশয়, তখনকার 'হিন্দু পেট্রিয়াটের' স্বত্বাধিকারী রায়বাহাদুর রাজকুমার সর্বাধিকারীর

তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

রাজকুমার সর্বাধিকারী কালী কুমার দের দ্বিতীয়া কন্যা মোক্ষদাময়ীকে বিবাহ করেন। ইনিও ছিলেন সে যুগের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তাঁর কোনও সন্তানাদি ছিল না। শেষ জীবনে তিনি কাশীধামে ১৯১১ খৃঃ ৯ জুন দেহরক্ষা করেন।

মোক্ষদাময়ী সর্বাধিকারীর নামেই দেওয়ানজীদের দের খাজনাপত্রের রসিদ কাটা হত।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে (৩য় খণ্ডে) রাজকুমারের সম্পর্কে লিখেছেন যে "তাঁহার সহধর্মিনীও বিদুষী মহিলা। তাঁহার 'হরিনামাবলী নামক পঞ্চাশৎ গীতিকার একখানি বই আছে।"

যাই হোক, এখন আবার কালী কুমার দের (বক্সীর) কথায় ফিরে আসা যাক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মদের ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সৈন্যবিভাগের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন, সেই সময় ঐ দুর্গ থেকে গোরা সৈনিকেরা ব্যারাকপুর সেনা নিবাসে যাতায়াত করত 'জলি বোটে' ক'রে। ঘটনাচক্রে একদিন রিষড়ার কয়েকজন কুঠিওয়ালাবাবু (সদাগরী অফিসের কর্মচারী) নৌকাযোগে যথারীতি কলকাতা অভিমুখে যাচ্ছিলেন। ইচ্ছা ক'রেই হোক বা অসাবধানতার ফলেই হোক হঠাৎ কুঠিওয়ালা বাবুদের পানসি নৌকার সঙ্গে গোরাদের জলিবোটের ধাক্কা লেগে নৌকা উলটে যায়, তার ফলে অনেকেই জলে পড়ে যান। এই নিয়ে উভয়পক্ষে কিছু বাক-বিতণ্ডা চলে কিন্তু গোরা সৈনিকেরা তাচ্ছিল্যভরে হাসতে হাসতে নিজেদের গন্তব্য পথে চলে যায়।

জলকাদা মাখা অবস্থায় সেদিন অনেকেরই আর অফিসে যাওয়া ঘটে উঠল না। তাঁরা তখন সেই অবস্থায় কালীবাবুর নিকট গিয়ে

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে অনুরোধ করেন।

কালীবাবু তঁদের আশ্বস্ত ক'রে সেইদিনই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মেজর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে উপরোক্ত অন্যায় আচরণের বিচার প্রার্থনা করেন।

আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন সকালে মেজর সাহেব কয়েকজন গোরা সৈনিককে নিয়ে লঞ্চে ক'রে কালীবাবুর প্রকাণ্ড আটচালার সম্মুখস্থ প্রশস্ত উঠানে এসে হাজির। সংশ্লিষ্ট কুঠিওয়ালা বাবুদের ডেকে আনা হয় কিন্তু সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিহিত সেই সমস্ত গোরাদের মধ্য থেকে দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। অতিকষ্টে, অনেকক্ষণ ধ'রে দেখে দেখে দু'চারজনকে অপরাধী বলে দেখিয়ে দেন। মেজর সাহেব তখন তাদের বেত্রাঘাত প্রভৃতি শাস্তি দিয়ে সাবধান ক'রে দেন।

সুখের বিষয়, উপরোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা ভবিষ্যতে আর শোনা যায় নি।

কালী কুমার দের সম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি ছিল যে তিনি একটা পাঁঠার মাংস একাই খেয়ে ফেলতেন। শুধু তাই নয়, সেই সব পাঁঠাকে একটা গর্তের মধ্যে চাপা দিয়ে দম বন্ধ ক'রে মেরে ফেলা হত যাতে কাটতে গিয়ে তাদের রক্তক্ষরণ হয়ে না যায়। দুঃখের বিষয় একটা আশ্বিনে ঝড়ে (সঠিক সাল তারিখ জানা যায় না) তাঁর নিজের আটচালা চাপাপড়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনেকে ঐ ভাঙ্গা চালাটাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। সেই জায়গাতেই নাকি বার্কনায়ার সাহেব অধুনালুপ্ত বাংলো প্যাটার্ন বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ ক'রে দেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক তাঁর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তাটি কালী কুমার দে লেন নামে অভিহিত হয়। ইহার পশ্চিমাংশ এখন ধর্মদাস হড় লেন নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কিশোরপুত্র হীরালাল ও বিধবাপত্নীর দেখা শোনা করার ভার পড়ে স্বভাবতই দুই বিবাহিতা কন্যার উপর। এবিষয়ে মোক্ষদাময়ী সর্বাধিকারীর নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কথিত আছে, কালীকুমার দে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ভবনটি একবার আগুন লেগে পুড়ে যায়। মোক্ষদাময়ীর অর্থানুকূল্যেই উহা পুনর্নির্মিত হয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হয়েছে।

কালীকুমারের পুত্র হীরালাল ছিল কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিধবা মাতার ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পূর্বে পুত্রবধূর মুখ-দর্শন। তাই তিনি অল্প বয়সে একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেবার উদ্যোগ আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু বিধি বাম, তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল।

সম্ভবতঃ ১৮৮৪/৮৫ খৃঃ রিষড়ায় কলেরা মহামারীতে হীরালাল বিবাহের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ রোগে রিষড়ার আরও কয়েকজন প্রতিভবান যুবক প্রাণ হারায়।

হীরালালের অকাল মৃত্যুতে তার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সব পণ্ড হয়ে যায়। পুত্র-শোকাতুরা জননী, বিবাহ উপলক্ষে যে সমস্ত ডালের বড়ি তৈরী করে রেখেছিলেন তা সমস্তই ক্ষোভে দুঃখে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে দেন। ভাগীরথী তীরবর্তী অধিবাসীরা ঐ সমস্ত বড়ি কুড়িয়ে নিয়েছিল বলে শোনা যায়।

এর পর থেকেই বিশ্বেশ্বরী দেবী দান ধ্যান, বার ব্রত প্রভৃতি পুণ্যকর্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৮৯৩ খৃঃ (বাং ১৩০০ সাল) স্বর্গীয় স্বামী কালী কুমার দের স্মরণার্থে পার্শ্ববর্ত্তী ঘাটগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের চাঁদনিযুক্ত ঘাট নির্ম্মাণ করে জনসাধারণের ব্যবহারার্থে উৎসর্গ করে দেন। (চাঁদনি শির্ষে শীলা-লিপি দ্রষ্টব্য) কথিত আছে এতদুপলক্ষে এক প্রস্থ দ্বাদশ দানের পরিবর্তে (ভূম্যাসনং জলঞ্চান্নং বস্ত্রং তাম্বূলকং কলম্। গন্ধশ্ছত্রং পাদুকা চ শয্যা শৃঙ্গী চ দ্বাদশঃ) উক্ত দ্রব্যগুলি প্রত্যেকটি সোপানের উপর পৃথক পৃথক ভাবে

উৎসর্গ করেন এবং রিষড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করেন। এতদ্‌ উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন এবং দান দ্রব্যাদি দেওয়া হয়।

সে যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে কূপ, তড়াগ সোপান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা কার্যের দ্বারা ইষ্টকাদি পরমাণু সংখ্যক শতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গবাস হয়ে থাকে। দেব-পিতৃ ও মনুষ্যগণের প্রীতি লাভের জন্যেও সোপান উৎসর্গীকৃত হত।

''সর্বভূতেভ্য উৎসৃষ্ট' ময়ৈতৎ সোপানমূর্জ্জিতং
যমস্তাং সর্বভূতানি স্নান পানাবগাহনৈঃ॥

উক্ত কার্যের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েছিলেন কিনা তা চাক্ষুষ দেখা না গেলেও, শত শত নরনারী আবাল বৃদ্ধ বণিতা যে এই ঘাটে পুণ্য সলিলা গঙ্গা বক্ষে প্রতিদিন অবগাহন স্নান করে অদ্য-বধি তৃপ্তি লাভ করে আসছেন একথা বলাই বাহুল্য। এই ঘাটটি আয়তনে অপেক্ষকৃত ছোট হলেও এর সোপান নির্মাণে কিছু নূতনত্ব আছে এবং জি, টি, রোড থেকে সরাসরি দৃষ্টি গোচর হয়।

মুন্সী বংশ

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রিষড়ার মুন্সী বংশ উঁহাদের পৌরো-হিত্য পদে নিযুক্ত হন। যতদূর জানা যায় ৺গঙ্গানারায়ণ মুন্সী মহাশয় (বাৎস্য গোত্র) জনাই থেকে রিষড়ায় এসে বাস স্থাপন করেন। তাঁর দুই পুত্র ৺তারক প্রসাদ এবং ৺নীলকণ্ঠ। কালী কুমার দের বণিতা বিশ্বেশ্বরী দাসী উভয় ভ্রাতার বসবাসের জন্যে সমান অংশে কিছু জমিসহ কোঠা বাড়ী নির্মান করে দেন।

এই মুন্সী বংশ ষষ্ঠিতলা ষ্ট্রীটস্থ শ্রীমানি বংশেরও পুরোহিত ছিলেন। তারক প্রসাদ মুন্সীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চুনীলাল

এতদঞ্চলে পাঠশালার পণ্ডিত হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এসম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

"চক্রবর্ত্তী বংশও খুব ভদ্র বংশ। ৺মথুরানাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ৺যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। হড় মহাশয়দিগের সঙ্গে এঁদের যথেষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে জানা যায় আবার চক্রবর্ত্তী মহাশযদের সঙ্গে ৺গিরীশচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়েরও খুব নিকট সম্পর্ক। দীর্ঘাঙ্গী মহাশয় প্রথমে হড় পাড়ায় বাস করতেন তারপর দেওয়ানজী বাটীর পশ্চিমে ঘোষেদের জমিতে বাস স্থাপন করেন।"

৺মথুরা নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তান্ত্রিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। শোনা যায় তাঁর একটি পরিচিত শৃগাল প্রতিদিন রাত্রে তাঁর আহ্বানে এসে শিবা-বলি গ্রহণ করত।

ভাঙ্গা ঘাট।

১১৭০ সালে ৺ত্রিলোকরাম দাঁ যে একটি পাকা ঘাট নির্মাণ করে দেন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে (পৃঃ ১৮৫)। কিন্তু শতাব্দীব ব্যবধানে গঙ্গার প্রবল স্রোত প্রবাহে উক্ত ঘাটটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি ভাঙ্গা ঘাট নামে পরিচিত হয়। দাঁ বংশীয় ৺গোপাল চন্দ্র দাঁ ও ৺কালিদাস দাঁ জন সাধারণের সুবিধাথে ১২৯৯ সালে (ইং ১৮৯২) উহা পুনর্নির্মাণ ক'রে দেন। নূতন ক'রে নির্মিত হওয়া সত্বেও উহার 'ভাঙ্গা ঘাট' নামটা অদ্যাবধি মুছে যায় নি। এই ঘাটের পাশেই শ্মশান ভূমি থাকায় মুখরা কটুভাষিণী স্ত্রীলোকেরা অপরকে গালাগাল দেবার সময় 'ভাঙ্গা ঘাটে যাও' বলে উল্লেখ করতেন।

হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র এই ঘাটটি সম্বন্ধে লিখেছেন যেঃ—

"রিষড়ার স্নানের জন্য যে ঘাটটি এখনও বিদ্যমান আছে উহা

১১৭০ সালে তিলোকরাম দাঁ প্রতিষ্ঠা করেন বলে লেখা আছে। পরবর্তী কালে গোপাল চন্দ্র দাঁ ১২৯৯ সালে উহা পুনঃ নির্মাণ করেন। এইরূপ সুন্দর গঙ্গা স্নানের ঘাট মাহেশ ছাড়া খুব অল্পই দেখা যায়। ঘাটের দুইদিকে স্ত্রীলোকেদের বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য দুইটি বড় ঘর দাঁ বংশের শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাঁ ও কালিদাস দাঁ তাঁহাদের সহধর্মিনী সৈরিন্ধ্রবালা দাসী ও মনোমোহিনী দাসীর স্মরণার্থে ১লা মাঘ ১৩১০ সালে নির্মাণ করিয়া দেন।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে আসন্ন মৃত্যুকালে অন্তর্জলি করার প্রথা প্রচলিত থাকায় রিষড়া, মোড়পুকুর প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা এই গঙ্গার ঘাটে রোগীদের এনে রাখতেন এবং পরিচর্য্যাকারীদের সুবিধার্থে এই ঘাটের উভয় পার্শ্বে দুটি টিনের ছাউনী 'গঙ্গাবাসী' ঘর সংযুক্ত হয়।

ঘাটের গিন্নী।

৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি চারণায় লিখেছেন "—ঘাটের গিন্নিকে বিধবা অবস্থায় দেখিয়াছি, তাঁহার পুত্র ছিল না, দুটি কন্যা ছিল মাত্র। তাঁহারাও মাঝে মাঝে মাতার কাছে আসিত। তাঁহারা সুবর্ণ বণিক ছিলেন, এবং দেব-দ্বিজে ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। আমাদের দেশের প্রায় সকলেই বিশেষতঃ দাওয়ানজী পাড়া ও তৎসংলগ্ন স্থানের লোকের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি পাড়ার গিন্নিদের সহিত প্রায়ই তাস খেলিতে আসিতেন ও সদালাপ, ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদি ভালবাসিতেন। আমার দাদা ৺চারু চন্দ্র, ৺বামাচরণ, শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার সহিত তাস খেলিয়াছে।"

শোনা যায়, তিনি নাকি খুব ভাল বড়ি দিতে পারতেন। তখন পোষড়ার_ হাটে এই বড়ির একটা বিশেষ স্থান ছিল। কান, কানবালা,

ঝাপটা, চিক্, জশম বাজু ইত্যাদি গয়নার আকারে বড়ি তৈরী করা হত। তাছাড়া শালের কলকা-এসব আকৃতির বড়িও ছিল। এইসব বড়ি তৈরীর জন্যে কোনও ছাঁচের বালাই ছিল না। কতকটা জিলিপি তৈরি করার মত একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে ডালবাটা পুরে হাতের চাপ দিয়ে এইসব গয়না-বড়ি তৈরি করা হত। শুকুলে এগুলো হয়ে উঠত ক্ষণভঙ্গুর, তাই খুব সন্তর্পণে ব্যবহার করা হত।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন আচার তৈরির কথাও উল্লেখ্য। কুলের আচার, আমের আচার, তেঁতুলের আচার, আমসত্ব প্রভৃতি তখন প্রায় প্রতি বাড়ীতেত বর্ষিয়সী মহিলারা প্রস্তুত করতেন এবং সেগুলোকে শুদ্ধাচারে নাতি-নাতনিদের স্পর্শ বাঁচিয়ে শুষ্ক পাত্রের গলায় কাপড় বেঁধে রৌদ্রে দিতেন আবার তুলে রাখতেন। পৌষমাসে পিঠে পার্বণ উপলক্ষে বিভিন্ন ধরণের পিষ্টক নির্মাণেও এঁরা ছিলেন বিশেষ দক্ষ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এই পৌষ পার্বণ উপলক্ষে তাঁর দীর্ঘ কবিতার মধ্যে লিখেছিলেন :—

'কত্তাদের গাল গল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুইপার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান কোসে॥" ইত্যাদি

কথায় কথায় আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে গেছি কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফিরে যেতে হচ্ছে।

চায়ের কথা।

বর্তমানে বিষড়ার অধিবাসীদের মধ্যে চায়ের প্রচলন প্রায় সার্ব্বজনীনত্ব লাভ করলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চায়ের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একমাত্র সাহেবদের ও সাহেব-ঘেঁসা উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হত।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত ভারতে চায়ের চাষ আবাদ আরম্ভ হয়নি. লর্ড বেন্টিঙ্কই প্রথম ১৮৩৪ খৃঃ চীন দেশীয় চায়ের চারা আনিয়ে এদেশে (হিমালয়স্থ অঞ্চলে) তার চাষ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ আসাম অঞ্চল থেকে চায়ের কিছু নমুনা কলকাতায় পাঠান হয়েছিল এবং সম্ভবতঃ কার-ঠাকুর কোম্পানীই প্রথম কলকাতায় চায়ের আমাদানী করেন। অবশ্য আপামর জনসাধারণের মধ্যে চায়ের ব্যবহার প্রচলিত হতে আরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল।

'কলকতার কথা' নামক পুস্তকের ক্রোড়পত্রের উল্লেখ থেকে চায়ের প্রচলনে প্রথম দিকে যে কি রকম বাধার সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্টই বোঝাযায় :—

"For example, the East India Company succeeded within half a century, in making tea an article of universal consumption in England. But in India the process was almost imposssible"

শোনা যায়, এতদঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দেওয়ার পর থেকেই চায়ের ব্যবহার ঔষধ হিসাবে প্রথম প্রচলিত হয়। একথা বলা বাহুল্য যে রাজার সিংহাসন যত দ্রুত বদলায়, প্রচলিত রীতি-নীতি বা সামাজিক প্রথা তত দ্রুত বদলায় না। নূতন বিদেশী জিনিষের ত'কথাই নেই।

মুদ্রার কথা

শের-শাহের আমলে তঙ্কা বা টাকার প্রচলনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। মোগল রাজত্বের সময়ই সর্বপ্রথম গোলাকার টাকা প্রচলিত হয় এবং তুরানি ভাষা তঙ্কা থেকেই টাকা শব্দের উৎপত্তি।

১৭৬৫ সালে শাহআলম বাদশাহের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলেও তাঁদের তখন মুদ্রা ঘটিত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না, ১৭৭৩ খৃঃ কোম্পানী প্রথম মুদ্রা সংস্কারে হাত দেয় কিন্তু তখন সে টাকা পয়সা সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেনি। কোম্পানীর অধিবৃত এলাকার মধ্যে তখন যে সব বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, সেগুলোকে একেবারে বাতিল করে দিয়ে কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহের নামেই নূতন টাকা চালু করেন—তার নাম হয় 'সিক্কা' টাকা ও সিক্কা পয়সা। 'সিক্কা' কথাটার অর্থ রাজকীয় ছাপ। এই সব মুদ্রার এক পিঠে সিক্কা কথাটার ছাপ থাকত বলে লোকে একে সিক্কা টাকা বলত। অপর পিঠে ছাপা হত 'শুভ রাজ্যাভিষেকের উনবিংশ বর্ষে মুরশিদাবাদে মুদ্রাঙ্কিত।' এটা ছিল একটা বাঁধি গৎ, বৎসরান্তে এর কোন পরিবর্তন হত না।

দেখতে দেখতে প্রায় সত্তর বছর পরে ইংরেজদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলে এবং তারই সুযোগে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বৃটিশ ভারতে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড মুদ্রার নাগ পাশে (Acts XVII and XXII of 1835) সমস্ত আর্থিক লেন দেন আবদ্ধ হয়। ঐ মুদ্রার উপর পিঠে ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম ফোরের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছিল। এর পর থেকে মুদ্রার উপর পরবর্তী সম্রাটের প্রতিকৃতি ছাপা হতে থাকে। ১৮৩৬ সালের (Act XVII) আইন অনুযায়ী কোম্পানীর মোহরও প্রচলিত হয়েছিল, তখন তার দাম ছিল ১৬ টাকা চার আনা। (Toynbee.)

উইলিয়ম ফোরের মৃত্যুর পর ১৮৩৭ খৃঃ জুনমাসে ভিক্টোরিয়া পিতৃব্যের শূণ্য আসনে অভিষিক্তা হন। তখন থেকে মুদ্রাতে তাঁর প্রতিকৃতি ছাপা হতে থাকে কিন্তু ১৮৭৭ খৃঃ ১ লা জানুয়ারী তিনি ভারতেশ্বরী উপাধি ধারণ করবার পূর্ব পর্যন্ত (Empress of India) তাঁর মাথায় মুকুটযুক্ত প্রতিকৃতি ছাপা হত না, ঝুঁটি মার্কা টাকাই

ছাপা হতে থাকে।

তাঁরিই রাজত্ব কালে ১৮৫২ সালে অর্দ্ধপয়সা ও সিকি পয়সা প্রচলিত হয় এবং অর্দ্ধপয়সার পরিবর্ত্তে সিকি পয়সায় ফেরি-ষ্টিমারে গঙ্গা পারাপার প্রথাও প্রচলিত হয়েছিল। (দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর'-১২-১-১৮৫৩)। তাঁর আমলেই রূপার দুয়ানীর প্রচলন হয় কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি বশতঃ তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

রিষড়ার কোনও কোন অধিবাসীদের গৃহে উপরোক্ত প্রাচীন মুদ্রাগুলি আজও সযত্ন রক্ষিত আছে এবং সেগুলোর আলোকচিত্র এই গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে মুদ্রিত হয়েছে।

জনৈক ইংরাজ কবি মুদ্রার দ্বারা চারদফা কার্য সমাধা হয় বলে উল্লেখ করেছেন :—

"Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ বস্তুর মাধ্যম, পরিমাপ, মান এবং সঞ্চয়।

মুদ্রার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল বোধহয় :— 'Money is sweeter than honey'। মধু হতেও মধুরতর।

ফার্সী ভাষার অবসান।

পলাশীযুদ্ধের পরে অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজরা রাজকার্যাদি নবাবী আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন কাজেই আরবি ফার্সীর সমাদরও তাই অনেকদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা এ ভাষা বাতিল করে দেন।

এতদিন পর্যন্ত এই ফার্সী ভাষাই ছিল আদালতের ভাষা এবং দরখাস্ত প্রভৃতি এই ফার্সী ভাষাতেই লেখা হত। ১৮৩৬ খৃঃ যদিও প্রথম বাংলা ভাষার প্রচলন হয় এবং ১৮৩৭ খৃঃ এপ্রিল মাসে ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে ফার্সীভাষা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু

আদালত; কাছারি, হাকিম, পেশকার, জওয়ানবন্দী, উকিল, এজলাস, আসামী, ফরিয়াদী প্রভৃতি শব্দ আজও প্রচলিত রয়েছে।

অন্যদিকে আবার এই খৃষ্টাব্দ থেকেই রেভিনীউর হিসাব বাংলা মাসের পরিবর্ত্তে ইংরাজী মাস ধরা আরম্ভ হয়।

"The year 1836 also witnessed a change in the official language of the Courts. The Bengalee superseding the Persian. The Euglish, were also substituted for the Bengali mouths in the revenue accounts."

—Hooghly Past & Present—S C. Dey. P-189.

বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত পরিবর্ত্তন বাংলা ভাষার উৎকর্ষের সহায়ক হয়েছিল এবং উকিল, মোক্তারগণ ক্রমশঃ বাংলা ভাষায় (প্রথম দিকে ফার্সী-বহুল) দরখাস্ত জওয়ানবন্দী প্রভৃতি লেখা আরম্ভ করতে থাকেন।

সাধারণ কথা ও লেখা ভাষার মধ্যেও ব্যবহৃত আরবি ফার্সী শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ বিদায় নিতে থাকে।

শ্রীরামপুর হাসপাতাল।

এই সময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৮৩৬ সালে স্থানীয় অধিবাসীদিগের আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে শ্রীরামপুরে দিনেমার কোম্পানী কর্ত্তৃক হাসপাতাল স্থাপন। ১৮৪৫ খৃঃ শ্রীরামপুর নগরী ইংরেজ অধিকারে আসার পর এই আরোগ্য-নিকেতনের নাম হয় 'ওয়ালস্ হাসপাতাল'।

উক্ত ঘটনা যদিও রিষড়া বাসিদের মনে একটা আশার সঞ্চার করেছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত রিষড়ায় ইউরোপীয় প্রথায় চিকিৎসালয় বা চিকিৎসক কিছুই ছিল না, কিন্তু যান-বাহনের সুযোগ সুবিধা না থাকায় রোগীদের ঐ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্ট সাধ্য

ব্যাপার ছিল, পাল্কীতেও সহজে রোগীদের বহন করতে সম্মত হত না, 'ডুলি' ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সামাজিক পরিবেশও তখন ঠিক ইউরোপীয় প্রথায় চিকিৎসা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠে নি, একটা অন্ধ কুসংস্কার দেশবাসীকে গ্রাস করে রেখেছিল।

তখন অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে হাসপাতালে গেলে রোগী আর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে না, তাছাড়া ওখানে মেথর, মুর্দ ফরাসের হাতে আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করতে হবে। কাজেই 'যাক প্রাণ, তবু যেন জাত খোয়াতে না হয়', এই ধরণের মনোভাব বেশ কিছুদিন বজায় ছিল। ছাই পাঁশ বিলিতী ওষুধ খাওয়ার চেয়ে কবিরাজী বড়ি অনুপান সহ 'পাথরের খলে' মেড়ে খাওয়ার অভ্যাস লোকে সহজে ত্যাগ করতে পারেনি।

ঠিক এরই আগের বছর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। চিকিৎসালয় হলেই চিকিৎসক চাই, কাজেই এই চিকিৎসক সৃষ্টির জন্যে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ভাবেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। বহুদিনের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রে বৈদ্যবাটীর মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় তাঁর চারজন ছাত্রকে নিয়ে শবদেহে ছুরি চালাবার কৃতিত্ব অর্জন করেন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে।

তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়।

ডঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়।

উপরোক্ত সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রিষড়ার দেওয়ানজী বংশের নীলমাধব মুখোপাধ্যায়—আনুমানিক ১৮২৫/২৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম জগবন্ধু এবং পিতামহ জনার্দ্দন হলেন দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম সহোদর। জনার্দ্দন পূর্বেই পৃথগান্ন হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে

কিছু বলার আগে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রিষড়ায় তখন উচ্চ শিক্ষা লাভের কোনও সুযোগ ছিল না। কাজেই তাঁকে কলকাতার হিন্দু কলেজে গিয়ে ভর্তি হতে হয়েছিল। ১৮৪০ খৃঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন — মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, গিরীশচন্দ্র দেব (কোন্নগর), গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। রাজনারায়ণ ইতিপূর্বে ছিলেন হেয়ার সাহেবের স্কুলের ছাত্র।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে — "পরলোকগত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। গিরীশচন্দ্র দেব (কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) অনেককাল হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা কার্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন ক'রে এক্ষণে পেন্সন নিয়েছেন।"

হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপনান্তে নীলমাধব মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং ছাত্রাবস্থায় ১৮৪৭ সালে শবব্যবচ্ছেদ কার্যের জন্যে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট লাভ করেন, (সংবাদ প্রভাকর — ১৬/৬/১৮৪৭)। উত্তরকালে তিনি তৎকালীন কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হিসাবে পরিগণিত হন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে রিষড়ার প্রসঙ্গে নীলমাধব সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা ভ্রমাত্মক বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন — "যে পাঁচজন ছাত্র সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন, তাঁহারা কুসংস্কার ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করায় কলিকাতা দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। ইঁহাদের অন্যতম নীলমাধব মুখোপাধ্যায় রিষড়ার দেওয়ানজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

বলা বাহুল্য, অপর কোন ঐতিহাসিক তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি। পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ১৮৩৬ খৃঃ

নীলমাধব বাবুর বয়স ছিল মাত্র ১০/১১ বৎসর।

যাইহোক, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনী পাঠে জানতে পারা যায় যে নীলমাধব কিছুদিন মেডিকেল কলেজের ডিমন্‌ষ্ট্রেটররূপে কাজ করেছিলেন এবং অক্ষয়বাবু কিছুদিন তাঁর চিকিৎসাধীনও ছিলেন।

স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশযের অনুজ শম্ভুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে নীলমাধব ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তালতলা নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ভারত বিখ্যাত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতা) সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। এই স্থানেই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। প্রসঙ্গটি ছিল নিম্নরূপ :—

"তৎকালে তালতলা নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের ন্যায় সুবিজ্ঞ লোক অতি বিরল ছিল। তিনি অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবুই স্বয়ং দাদাকে ইংরাজী ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার ছাত্র বাবু নীল-মাধব মুখোপাধ্যাযের উপর ইংরাজী পড়াইবার ভারার্পণ করেন···।"

বলা বাহুল্য, যে উপরোক্ত ঘটনাটি বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি প্রত্যেক জীবনী লেখক উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে— "নীলমাধব বাবুও ডাক্তার হইয়া বিবিধ প্রকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন।" তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এমন নিবিড় ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে নীলমাধবের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন।

শম্ভুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত জীবন চরিত্র থেকে নীল-মাধবের বিবাহ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহচর্যের কথাও জানতে পারা যায় :—

"১৮৬৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর পাড়ার বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে আঘাত পান।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁহার পবনবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে যাইয়া অবস্থিতি কবেন, তিনি ও তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ও ভাগিনেয় বেণীমাধব ও ভ্রাতৃ জামাতা নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।"

এরপর সম্ভবতঃ তিনি ১৮৬৬/৬৭ সালে রিষড়া পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটে কোন এক মোদকের কাছ থেকে পুরাতন বাটী ক্রয় করে তার সঙ্গে পূজার দালান, দ্বিতল সদর বাটী নির্মান ক'রে এখানে বাস করতে থাকেন এবং ১৮৭০ খৃঃ রিষড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয় যে বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্য ও সাহচর্য তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে তিনি নাকি পরবর্ত্তী কালে Civil Surgeon (সিভিল সার্জেন) পদে উন্নীত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না। পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি চারণায় লিখেছেন যে — "শ্রীনারায়ণের এক পুত্র জনার্দ্দন হইতে জগবন্ধু, নীলমাধব, ক্ষেত্রমোহন ও হরিদাস। নীলমাধব তৎকালীন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তারের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিলক্ষণ পরিচয় ও আস যাওয়া চলিত"

ডাঃ চন্দ্র কুমার দে, এম ডি.

এরপর উল্লেখযোগ্য হলেন —ডাঃ চন্দ্র কুমার দে, (কালী কুমার দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) তাঁর জন্ম হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এবং কালী কুমারের প্রযত্নে তিনি কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে প্রেরিত হন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি বরাবরই পরিচিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ও অধ্যয়নশীলতা ছিল অফুরন্ত। তিনি দ্বাদশটি ইউরোপীয়

ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক-পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর মেডিকেল কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

"The foundation of the Calcutta University in 1857 and the affiliation of the Medical college with it in the same year demanded a further modification of the education carriculum....... The University entrance examination was also made the portal of admission into the primary classes of the Medical College, and examination to take place at the end of the third and fifth sessions.

Since this year the University has been controlling the medical examination at the medical Colleges affiliated to it,"

সঠিক জানা না গেলেও, একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি ১৮৫৭ খৃঃ বা তৎ পূর্বেই মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৬২ খৃঃ পঞ্চম বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণ হবার পর সর্বপ্রথম এম, ডি, উপাধি ভূষিত হন।

পর বৎসর, ১৮৬৩ খৃঃ উপরোক্ত উপাধি লাভ করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও ডাঃ জগবন্ধু বসু।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ডাক্তারি পাশ করলে কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের জি, এম, সি, বি, অর্থাৎ 'গ্রাজুয়েট অব মেডিকেল কলেজ, বেঙ্গল' উপাধি দিতেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুমোদনের পর মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের এল, এম, এস ; এম, বি, ও এম, ডি উপাধি দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

এম, ডি, উপাধি ভূষিত হবার পর ডাঃ চন্দ্রকুমার অল্পদিনের মধ্যেই যশস্বী চিকিৎসক হিসাবে খ্যাত লাভ করেন। ইতিপূর্বে তিনি

তৎকালীন কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসীদের গৃহ চিকিৎসক হিসাবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন।

১৮৫৯ সালের আগষ্ট মাসে লিখিত একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় লিখেছেন যে — "আমি কি অশুভক্ষণে রোগের হস্তে পতিত হইয়াছি, কিছুতেই ইহার নিষ্কৃতি হইবার পথ দেখিতেছিনা,··· ··· এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমার দের ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি। দুই বেলাই অন্নভোজন করি, তাহার মধ্যে একবেলা মাংসের কাথ ভোজন করিয়া থাকি।"

১২৬০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ৺যদুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণে যাবার পূর্ব বৎসরে অর্থাৎ ১২৫৯ সালের মাঘ মাসে (ইং ১৮৫৩) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'তীর্থ ভ্রমণে' লিখেছেন :—

"আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণতুল্য শ্রীমান প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী আমার অতিশয় ব্যামোহ সংবাদে কলেজে ছুটি লইয়া বাটীতে আসিয়া সাতদিবস থাকিয়া আমাকে সমভ্যার করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতার বহুবাজারের বাসাতে লইয়া গেলেন। তথায় নৌকারোহণে জলপথে গমন হইল। বাসায় পঁহুছিয়া অনেক ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইলেন।

রিশড়া-নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দে বহুমত পরিশ্রম এবং যুক্তিমতে চিকিৎসা করিয়া প্রথমে জ্বর পরিত্যাগ করাইলেন; পরে শূলব্যাধির চিকিৎসা করিয়া অনেক উপশম করিলেন ······"।

কেউ কেউ বলেন যে ডাঃ চন্দ্রকুমার নাকি বিলাত গিয়েছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে অন্যত্র কোনও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না; তবে তিনি যে জার্মান বৈদ্যশাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন সে সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁর প্রসিদ্ধ সুরধুনী কাব্যের দশম সর্গে উল্লেখ করেছেন :—

"গুণবন্ত চন্দ্রদেব রোগীর নিস্তার,
জরম্যান্ বৈদ্যশাস্ত্র অনুবাদকার।"

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ১৮৭১ খৃঃ বালিকাদের বিবাহযোগ্য নিম্নতম বয়স নিরূপন করার জন্যে ভারতবর্ষের হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ চিকিৎসকদের মতামত জানতে চেয়ে এক পত্র লেখেন, তদুত্তরে যে সমস্ত অভিমত পাওয়া যায় তার মধ্যে ডাঃ টি, চার্লস্ এবং ডাঃ চন্দ্রকুমার দের মতানুযায়ী চৌদ্দবৎসর বয়ঃসীমাই গ্রহণ যোগ্য বলে স্থিরীকৃত হয়।

ডাঃ চন্দ্রকুমার যে কেবলমাত্র চিকিৎসক হিসাবেই তৎকালীন কলকাতা সমাজে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাই নয়, ব্যক্তি হিসাবেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। স্যর দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাঁর 'স্মৃতিরেখায়' লিখেছেন যে—

'কলিকাতা বহুবাজার লোহাপটী, ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে বহু মহাত্মা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ··· বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ··· নীলমনি মুখোপাধ্যায় ··· কালীকুমার দে, চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি।'

১৩৩৯ সালের 'প্রবর্ত্তকে'র ভাদ্র সংখ্যায় তিনি লিখেছেন — "এখন আমাদের রেফিউজ প্রতিষ্ঠান (The Refuge) বহুবাজার ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে স্থান পাইয়াছে, সেই বাটীতে মিস্ পিগট নাম্নী এক বিদুষী মহিলার স্কুল ছিল। তিনি সমাজসেবা করিতেন। পিতৃদেব, খুল্লতাত রায়বাহাদুর রাজকুমার সর্বাধিকারীর নিকট আত্মীয় ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে ও ছাত্রনেতা রেঃ কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বাঙালী তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।"

চন্দ্রকুমার তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ১৫২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে (কলকাতা) বসবাস করতে বাধ্য হলেও রিষড়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অক্ষুন্ন। শোনা যায়, ১৮৭০-৭২ খৃঃ রিষড়ায় ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি প্রতি

রবিবার রিষড়ায় এসে ৺গোপাল চন্দ্র দাঁর বহির্বাটীতে অথবা দাঁয়েদের পূজা মণ্ডপে (আটচালায়) বসে বহু রোগীকে ঔষধ দিতেন।

কোন্নগর নিবাসী শিবচন্দ্র দেবের অন্তরঙ্গদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন যে সে যুগের বাঙালী ডাক্তারদের আজকের মত উন্নত ধরণের চিকিৎসার সুযোগ ছিল না। শুধু যে বিভিন্ন ওষুধেরই অভাব ছিল তাই নয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং রসায়নাগারও ছিল অত্যন্ত নগণ্য। চিকিৎসকদের মধ্যে আবার বৈজ্ঞানিকের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ চন্দ্রকুমার দে. এম, ডি, পরলোক গমন করেন। দুঃখের বিষয় তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে রিষড়ার কোনও রাস্তা অদ্যাবধি তাঁর নামে অভিহিত করা হয়নি।

নরেন্দ্র লাল দে।

ডাঃ চন্দ্র কুমারের চারিপুত্রের মধ্যে প্রায় সকলেই রিষড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। চারপুত্র হল, নন্দ, নরেন্দ্র, উপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র।

জ্যেষ্ঠ নন্দলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, উপাধি লাভ ক'রে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এম, এ, উপাধি লাভ কবাব পর ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনিও পিতার ন্যায় দশটি ইউরোপীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। আজীবন চিরকুমার অবস্থায় সাহিত্যানুশীলনে ব্যাপৃত থাকা কালীন ১৯১৩ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

তৃতীয় উপেন্দ্রলাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাটিন ভাষার এবং সাহিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম, এ, পাশ করেন এবং তারপর 'বঙ্গবাসী' কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন। কিন্তু ইনিও

অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রলালের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না ইনিও অল্পবয়সে দুইপুত্র ও এক কন্যা রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রদের নাম—ধীরেন্দ্রলাল ও বীরেন্দ্রলাল।

মধ্যমপুত্র নরেন্দ্রলাল ১৮৫৮ খৃঃ সুপ্রাচীন রিষড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। এর পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একই বৎসরে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে বি, এ ও এম-এ, উপাধি লাভ করেন। পাঠ্যাবস্থায় নরেন্দ্রলাল প্রায়ই তাঁদের রিষড়ার বাটীতে অবস্থান করতেন এবং অবসর পেলেই বাটীর সম্মুখস্থ গঙ্গায় সন্তরণ করতেন।

বলা বাহুল্য যে তাঁর সমবয়সী রিষড়ার যুবক ও কিশোরেরা গঙ্গায় সাঁতার দিতে খুবই ভালবাসতেন এবং এটা ছিল এক প্রকার তাঁদের নিত্যকার অভ্যাস। এই সাঁতার কাটা প্রসঙ্গে দু'একজন আবার আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ডাঃ ফণীন্দ্রলাল দাঁ হলেন তাঁদের অন্যতম, নৌকার নঙ্গরে বিঁধে গিয়ে তাঁর একটি পা আজীবন স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেছিল ।

মেয়েদের মধ্যেও সাঁতার কাটার অভ্যাস তখন বেশ প্রচলিত ছিল। অনেকেই খিড়কীর পুকুরে ঘড়ার সাহায্যে সাঁতার শিখতেন এবং সখিদের সঙ্গে পুকুর পারাপার প্রতিযোগিতায় বিশেষ আনন্দলাভ করতেন এবং অনেক সময় আনন্দাতিশয্যে স্থান কালের জ্ঞান হারিয়ে অসংযত হয়ে পড়তেন।

যাইহোক, এই সাঁতার কাটাকে কেন্দ্র ক'রে নরেন্দ্রলাল রিষড়ার তৎকালীন বহু যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যায়ামের ফলেই তিনি খুব বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং দীর্ঘজীবিও হয়েছিলেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিদ্যার সর্বপ্রধান গুণ 'বিনয়' অর্জন

করেন এবং মেধাবীছাত্র হিসাবে শিক্ষক ও সহপাঠিদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ আইন পাশ করার পর তিনি কিছুদিন দার্জিলিং সেণ্টপলস্ স্কুলে গণিতের অধ্যাপনা করেন কিন্তু শীতাধিক্য বশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ক'রে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে (এক্ষণে স্কটিস্ চার্চ্চেস কলেজ) অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি প্রফেসর এন. এল, দে নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং দশ বৎসরকাল এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বহু গৃহ-ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যার বি, সি, মিত্র, স্যার পি, সি, মিত্র, রায়বাহাদুর কৈলাস চন্দ্র বসু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবহারজীবিগণ।

১৮৯২ সালে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় কলেজ পরিত্যাগ ক'রে কলকাতা পুলিশ আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডিত্যের বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতার (ডাঃ চন্দ্রকুমার) মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে রিষড়ার বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্যে প্রায়ই রিষড়ায় আসতে হত এবং সেই সূত্রে তাঁর পূর্ব পরিচিত বাল্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করার সুযোগ পেতেন। শোনা যায়, ৺চূনীলাল মুন্সী মহাশয় এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তদারক বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।

তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভাতপুত্র হীরালালের অকাল মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ৺কালীকুমার দের অংশ (অপর কোনও দৌহিত্র সন্তান জীবিত না থাকায়) জাষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রের পুত্র ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী প্রাপ্ত হন এবং বাকি অর্দ্ধাংশ নরেন্দ্রলাল তাঁর ভ্রাতৃগণের সঙ্গে প্রাপ্ত হন।

ভূপেন্দ্র নাথের বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনার ভার ন্যস্ত ছিল ৺দ্বারিকা-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে।

১৯০৫ সালে তাঁরা উভয় পক্ষই তাঁদের রিষড়াস্থিত বিষয় সম্পত্তি হেষ্টিংস মিলের স্বত্বাধিকারী বার্কমায়ার ব্রাদার্সের অন্যতম এ্যাডাম বার্কমায়ারকে বিক্রয় করেন। প্রথমে ১৯০২ খৃঃ ভূপেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে ক্ষতির নিমিত্ত এবং কিছুটা অমিতব্যয়ীতার ফলে অর্থের অনটন হওয়ায় তাঁর ১/২ অংশ ৺পুর্ণচন্দ্র দাঁর নিকট দশহাজার টাকায় বন্ধক রাখেন কিন্তু সুদে আসলে এই টাকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯০৫ সালে বিক্রয় করে দেন এবং ঐ সালেই পূর্বোক্ত এ্যাডাম বার্কমায়ার (স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী) সাহেব পূর্ণবাবুর নিকট থেকে কিনে নেন। (দলিলগুলির বিবরণ দেওয়ানজী বংশের শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

১৮৯৩ সালে নরেন্দ্রলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ফেলো নির্বাচিত হন এবং আজীবন উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত এবং তাঁর পারিবারিক মূল্যবান ও সুবৃহৎ পুস্তকের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গের মধ্যেই তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করেন।

১৯৩৬ সালে তিনি আইন ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি এড্‌ভোকেট এন, এল, দে নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতার জন্যে বিচারক-মণ্ডলী ও সমব্যবসায়ীরা তাঁকে বিশেষ সমাদর করতেন।

ওকালতি ব্যবসার দ্বারা তিনি নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে কোনও দিনই সচেষ্ট ছিলেন না এবং কোনও কালে 'বড়লোক ঘেঁষা'ও ছিলেন না, অথচ হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস্ থেকে আরম্ভ করে সমাজের প্রত্যেক স্তরের গণমান্য ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করে নিজেদের সম্মানিত বোধ করতেন।

১৯৪১ খৃঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে কলকাতা আমহার্ষ্ট

স্ট্রীটের ভবনে তিনি দেহ রক্ষা করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র মন্মথনাথ দে ১৯০৫ সাল থেকে ইংলণ্ডের অধিবাসী হন।

(তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে প্রকাশিত জীবনীপুস্তক এবং শ্রীহরেন্দ্রকুমার দত্তর সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি অবলম্বনে)।

প্রফেসর এন, এল, দের মৃত্যুতে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদ পত্রেই তাঁর গুণাবলীর পরিচয় দিয়ে শোক প্রকাশ করা হয়।

রায়বাহাদুর মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'আমার দেখা লোক' নামক পুস্তকে লিখেছেন— "প্রফেসর এন, এল, দে—এম, এ, বি-এল, চন্দ্রকুমার দে এম-ডির পুত্র। ইঁহার ন্যায় ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত লোক বিরল।

তিনি আরও লিখেছেন— শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাল দের বাটীতে একদিন খাঁ সাহেবের (মাথু) গান হইয়াছিল। ইনি ছিলেন দিল্লীর ভূতপূর্ব সম্রাট ৺বাহাদুর শার সভা গায়ক।"

মানুষের জন্ম হয় একস্থানে আর কর্মসূত্রে মৃত্যু হয় অন্যত্র। খ্যাতনামা ব্যক্তি ও মনীষীদের জীবনেই প্রায় দেখতে পাওয়া যায় এই ধরণের ঘটনা।

কৈলাস চন্দ্র লাহা।

ডাক্তার ও প্রফেসরের পর রিষড়ার দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর কথা আলোচনা যোগ্য :—

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলেন ৺কৈলাস চন্দ্র লাহা, তাঁর পিতামহ অক্রুর চন্দ্র লাহা আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর দশকে রিষড়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন এবং জাতীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এঁরা হলেন বারুজীবী বা পর্ণবণিক ; নবশাখের অন্তর্ভূক্ত।

কৈলাস চন্দ্র আনুমানিক ১৮২৫ খৃঃ রিষড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম রামধন লাহা। রামধনের অবস্থা প্রথমদিকে খুব স্বচ্ছল না থাকলেও কলকাতা, সুখচর, পাণিহাটি, খড়দহ প্রভৃতি অঞ্চলে পানের ব্যবসায় সূত্রে অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হন। যত দূর জানা যায়, তাঁর আমল থেকেই মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি-যুক্ত চণ্ডীমণ্ডপে ৺শারদীয়া দুর্গা পূজা প্রচলিত হয়।

কৈলাস চন্দ্র প্রথমে তাঁর পিতার সঙ্গে জাতীয় ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং সপ্তাহে ২ দিন কলকাতায় নৌকাযোগে যাতায়াত করতেন। কলকাতার তখন দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অর্থ উপার্জনের বিশেষ সুযোগ ছিল।

কথিত আছে, কলকাতায় নিজের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা কালীন রিষড়ার প্রসিদ্ধ মদ্যব্যবসায়ী ৺কালীকুমার দের দোকানে তিনি যাতায়াত করতেন। এবং স্বগ্রামবাসী হিসাবে তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত হন।

সৌভাগ্যক্রমে, এইখানে তিনি একজন ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টারের সুনজরে পড়ে যান এবং কালীকুমার দের সুপারিশ ক্রমে তাঁর অধীনে সামান্য বেতনে একটি চাকরী লাভ করেন। কালক্রমে কৈলাস চন্দ্রের ব্যবসায় বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও সততার গুণে তিনি তাঁকে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই কৈলাসচন্দ্র নিজের নামে স্বাধীনভাবে ছোটখাট কণ্ট্রাক্টের কাজ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রচেষ্টায় ত্রিপলের ব্যবসায়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন কিন্তু নিরুৎসাহ না হয়ে পুনরায় উক্ত ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হন। এই সময়ে তিনি কাশীধামে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে একটি ব্রীজ নির্মাণের কণ্ট্রাক্ট পান এবং তার টোল-ট্যাক্স আদায়েরও ভার প্রাপ্ত হন। এই ব্যবসায়ে উপার্জ্জিত অর্থে তিনি কাশীধামে (রাজঘাটে) একটি বাটী ক্রয় করেন। এরপর তিনি কানপুরেও একটি ব্রীজ নির্মাণ করেন। ইমারতি নির্মাণ কার্য ছাড়াও তাঁর পাটের ব্যবসায় ছিল বলে জানা যায়।

এইভাবে উত্তরোত্তর ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের ফলে তিনি কানপুরে পীলখানা রোডে দু'খানি বাড়ী নির্মাণ করেন।

বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে তিনি পৈতৃক বাসভবনের আমূল সংস্কার ক'রে সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা এবং প্রাচান চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য সূক্ষ্ম অলংকরণ বিশিষ্ট পাকা পূজার দালান তৈযারী করান। খিলানগুলিতে তৎকালীন শিল্পকলার নিদর্শন আজও বর্ত্তমান। এই শিল্পরীতিতে পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রভাব বর্ত্তমান বলে মনে হয়। (গ্রন্থ মধ্যে আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)

তাঁর পিতার আমল থেকে অদ্যাবধি অধস্তন চার পুরুষ ধরে (প্রায় দেড়শত বৎসর) দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হযে আসছে। রিষড়ার হড় বংশীয়েরাই ছিলেন তাঁদের পৌরোহিত্য পদে অধিষ্ঠিত।

আনুমানিক ১৮৭০/৭২ খৃঃ তিনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার 'মুখোপাধ্যায' মহাশযদিগের নিকট থেকে দশআনি জমিদারির অর্দ্ধাংশ পত্তনি গ্রহণ করেন। যার ফলে, তাঁর অধীনে জমিদারির কায পরিচালন উপলক্ষে কয়েকজন গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে এককড়ি গোমস্তা (এককড়ি রায়) এতদঞ্চলে বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, জমিদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীই তখন জমিদার নামে অভিহিত হতেন।

রিষড়া অনাথ আশ্রম পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার প্রান্তে গঙ্গার ঘাট বলতে কিছু ছিল না। কাঁচা ঘাটেই লোকে তখন স্নানাদি কার্য সমাধা করতেন। গ্রামবাসীদের এই অভাব দূরীকরণার্থে কৈলাস চন্দ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৮) চাঁদনীযুক্ত সুদৃশ্য পাকা ঘাট নির্মাণ করান। চাঁদনীর দুপাশে দুখানি বড় বড ঘর ঘাটের শোভাবর্দ্ধন করে (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)। রিষড়ায় 'থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি' অনুমতি সূত্রে কিছুদিন চাঁদনির উত্তর পার্শ্বস্থ ঘরটি ব্যবহার করতেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হয়েছে।

এই ঘাটের উপরেই রয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির। শিব লিঙ্গটি তিনি কাশীধাম থেকে নির্মান করান। কথিত আছে, প্রতি-ষ্টার কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে,— 'কৈলাশ ! তুই যে আমার বিগ্রহ গড়তে দিয়েছিস, সে ত' আসল কষ্ঠি পাথরের নয়।' নিদ্রাভঙ্গে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অনতিবিলম্বে কাশীধামে গিয়ে নির্মীয়মান মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আসল কষ্টিপাথরের নূতন বিগ্রহ নির্মাণ করান এবং যথাকালে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং হৃদয়ে অনাবিল তৃপ্তি লাভ করেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যে শিবপূজা সম্বন্ধে লিখেছেন:···

'যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
কত জন্ম অবনী মণ্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে সেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
চামর ঢুলায় যেবা হর সন্নিধানে।
স্বর্গ লোকে চলি যায় চড়িয়া বিমানে॥'

দুর্গোৎসব ছাড়াও তিনি প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উৎসব সম্পন্ন করতেন এবং এই উপলক্ষে অনেক বাজী পোড়ান হত। তবে দুর্গোৎ-সবই ছিল তাঁর সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। গ্রামের সকলেই প্রায় তখন নিমন্ত্রিত হতেন। এই উপলক্ষে শুধু রিষড়ায় নয়, কোন্নগরেও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'সামাজিক' বিতরণ করা হত।

একাধিক দুঃস্থ পরিবারের প্রতিপালনের ব্যবস্থাও তিনি করে গিয়েছিলেন। কালক্রমে তিনি স্বজাতিদিগের 'সমাজপতি' হিসাবে পরিগনিত হন।

যুগের প্রভাবে এবং ইউরোপীয়ানদের সংসর্গের ফলে তিনি পান দোষে দুষ্ট ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক ও বিনয়ী। দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল তাঁর অক্ষুন্ন। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁকে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বাহিরে থাকতে হত কিন্তু দেশে

ফেরার পর তিনি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন এবং তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করতেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর (২৪ শে ভাদ্র ১৩০৮) তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পরেই ১৯০২ খৃঃ ২রা জানুয়ারী (১৯শে পৌষ ১৩০৮) তাঁর পতিব্রতা সহধর্মিনী প্রসন্নময়ীও ৺কাশীধামে পরলোক গমন করেন। কথিত আছে, প্রসন্নময়ী ছিলেন অত্যন্ত সুলক্ষণা সাধ্বী রমণী। তাঁর সঙ্গে বিবাহের পর থেকেই কৈলাস চন্দ্রের সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। মৃত্যুকালে তিনি, শশীভূষণ, আশুতোষ ও শ্রীনাথ এই তিন পুত্র রেখে যান।

১৯২৮ সালের ৪ঠা মে তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ জি, টি রোড থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি 'কৈলাশ চন্দ্র লাহা ঘাট লেন' নামে অভিহিত করেন।

এই বংশের অন্যান্য কৃতি সন্তানদের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

স্বরূপচন্দ্র লাহা।

ব্যবসায়ী হিসাবে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ৺স্বরূপচন্দ্র লাহা। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দী তখন প্রায় মধ্য গগনে।

তখনও একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা পুরামাত্রায় প্রচলিত ছিল এবং গৃহিণীরাই ছিলেন সে প্রথার প্রাণকেন্দ্র। অতিথি অভ্যাগত আপ্যায়নে, সংসারের দাস দাসী থেকে আরম্ভ ক'রে শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের সুখ সুবিধ এবং সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। বারমাসে তের পার্বণের যথাযথ আয়োজন, দুর্গোৎসবের একমাস

আগে থেকে ভাঁড়ার গোছান ; মাঙ্গলিক দ্রব্যাদির সংগ্রহ এইসব ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য দুরূহ ব্যাপার।

গৃহকর্তা অধিকাংশ সময়ই সদর বাটীতে বা কর্মস্থলে থাকতেন ; তিনি সাধ্যমত অর্থের সংস্থান করতেন মাত্র এবং বিষয় সম্পত্তির ও ব্যবসায় সংক্রান্ত পরিচালন ভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত। অন্দর মহলের ঐ সমস্ত ঝামেলার ব্যাপারে তিনি থাকতেন একপ্রকার নির্লিপ্ত।

কাজেই, একটি সুবৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব যাঁকে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বহন করতে হত, সেই সব গৃহিণীদের নিজের সুখসুবিধার কথা চিন্তা করবার অবসর থাকত না, আজকের দিনের ছোট পরিবারের গৃহকর্ত্রীরা বোধহয় উপরোক্ত অবস্থার কথা চিন্তাই করতে পারবেন না।

যাইহোক, তখনও ভাষা আজকের মত মার্জিত হয়নি। হ্যাঁলা, ওলো, ও পোড়ারমুখী প্রভৃতি সম্বোধন এবং 'গঙ্গাজল' 'সাগর' বকুলফুল, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি সখী সম্বন্ধ পাতান তখন খুবই প্রচলিত ছিল। এবং পরস্পর আদান প্রদানের ব্যবস্থাও বজায় ছিল।

বাড়ীর পড়ুয়ারা তখন রেড়ির তেলের প্রদীপের আলোতেই লেখাপড়া করত। এই প্রদীপ হাওয়া বাতাসে নিভে গেলে পুনরায় জ্বালান খুব সহজ ছিল না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারের রাজত্ব, তার উপর ভূতের ভয়, এর মধ্যে আলো নিভে গেলে অবস্থাটা যে কি দাঁড়াত তা সহজেই অনুমেয়।

এর উপর সে সময় আবার ছিল চোর ডাকাতের উপদ্রব। ধন-অপবাদ যাদের ছিল তদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ডাকাতির চিঠি আসত, যার ফলে পাড়ার মধ্যে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হত। পাড়া-পড়শীদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়ে যেত। বাড়ীতে লাঠি, বল্লম, সড়কি, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্র, যার যা ছিল তা গোপনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হত। সজাগ থেকে, পালাক্রমে রাত্রে বাড়ী পাহারা দেবার ব্যবস্থাও

করা হত।

ইংরেজ সরকার ঠগীদের দমন করতে পারলেও এইসব ডাকাত দলকে কারারুদ্ধ করতে বা নিশ্চিহ্ন করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। হুগলী জেলায় ছিল তখন কয়েকজন কুখ্যাত ডাকাতের দল। তারা শুধু স্থল পথেই নয়, জলপথেও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের মত লুঠতরাজ করে বেড়াত।

হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীর কুমার মিত্র লিখেছেন "শ্যাম মল্লিক, রাধা ডাকাত, বিশ্বনাথ বাবু, বৈদ্যনাথ এবং পীতাম্বর প্রভৃতি খ্যাতনামা দস্যু সর্দারগণের দোর্দণ্ড প্রতাপে তৎকালে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ জনপদ সমূহের অধিবাসিগণ সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিত।"

রিষড়ার কুখ্যাত বিশে ডাকাতের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। এর নামে এতদঞ্চলের জমিদার মহলের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটত। কখন কার বাড়ীতে চিঠি আসে তার ঠিক নেই।

উপরোক্ত সামাজিক অবস্থার মধ্যেই পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটে স্বরূপ চন্দ্র লাহা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইনিও ছিলেন বারুজীবি সম্প্রদায় ভুক্ত। যৌবনে পদার্পণ করে তিনি বিশ্বম্বর সেনের অনুকরণে কাপড় ও রুমাল ছাপার কারখানা করে বিশেষ লাভবান হন। এই কারখানাটি ছিল বর্ত্তমান অনাথ আশ্রম প্রাঙ্গনের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমি খণ্ডের উপর। কালক্রমে উক্ত জমির মালিকানা সত্ব বিক্রি হয়ে যায় এবং হস্তান্তরিত হবার পর ৺প্রাণকৃষ্ণ সাধুখাঁর অধিকারে আসে। স্বরূপ চন্দ্র উক্ত কারবারে যদিও বিশ্বম্ভর সেনের মত কোটিপতি হতে পারেন নি কিন্তু তাঁর নির্মিত সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং পূজার দালান তাঁর ধনাঢ্যতার পরিচয় দেয়। এঁর আমল থেকেই উক্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি। তাঁর আমলে বিশেষ ঘটা করেই দুর্গোৎসব হত। চুদিকে দেওড়ি ঘর ও সিংহদ্বার যুক্ত পূজার দালান আজ ধ্বংসোন্মুখ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে উক্ত সময়ে ছাপা সিল্কের রুমালের এবং অন্যান্য ছাপা কাপড়ের চাহিদা ছিল প্রচুর, ইউরোপীয় মহল থেকে আরম্ভ করে কলকাতার সৌখিন বাবুদের মধ্যে। একথা বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত কারখানায় তখন স্থানীয় লোকেরাই চাকরী করবার সুযোগ পেয়েছিল।

এই ছাপা কাপড়ের কারখানা ছাড়াও সে সময়ে হাতে বোনা চট বা থলে তৈরীর ছোট খাটো কুটির শিল্পাগারের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। ৺পীতাম্বর গুপ্ত, ত্রিপুরারী গুপ্ত মহাশয়দিগের সদর বাটীতে এই রকম ছোট কারখানা ছিল।

যাইহোক, স্বরূপচন্দ্র লাহা মহাশয় ব্যবসায়ে উপার্জিত অর্থে জায়গাজমি ক্রয় করে যান এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর পুত্র ক্ষেত্রচরণ (মোহন) লাহা ঐ সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করতেন। (১২৩৪ সালে ৺জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ক্ষেত্র বরণ লাহাকে বিক্রীত সম্পত্তির কোবলা দ্রষ্টব্য)।

এই ধনাপবাদেই ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বরূপ চন্দ্র লাহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল। এ সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে (৪৮ ভাগ, ২৫৬ সংখ্যা, বুধবার ১৫ ফাল্গুন ১২৮৫ সাল) নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ— "কোনও বন্ধু বিশেষের দ্বারা অবগতি হইল গত বুধবার রাত্রিতে একদল অস্ত্রধারী দস্যু রিষড়া গ্রামের স্বরূপ চন্দ্র লাহার বাটীতে প্রবেশ পূর্বক কুড়ায় দ্বারা দ্বারচ্ছেদ করতঃ ঘরে ঢুকিয়া সিন্দুক পেটরা ভাঙ্গিয়া অনেক দ্রব্যাদি হরণ করণ পুরঃসর পলায়ণ করিয়াছে। অবগতি হইল শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর দিবস কয়েকজন দস্যু ধৃত করিয়াছেন।"

উপরোক্ত কারণে, সে সময়ে যে কয়জন ভাগ্যবানের পাকাবাটী ছিল তাঁরা দস্যু ভয়ে বড় বড় জানালা দরজা রাখতেন না। দ্বিতলে যাঁদের বাসগৃহ থাকত তাঁরা উপরের সিড়ির মুখে চাপা দরজা রাখতেন আর তার কপাটের তক্তাও হত ডুমুর কাঠ বা খয়ের কাঠের তৈরী।

এই সমস্ত তক্তায় সহজে কুঠারের দাগ বসে না। রিষড়ার কয়েকটি প্রাচীন দ্বিতল বাটীতে এখনও এই রকম চাপা দরজার অস্তিত্ব বর্ত্তমান, যদিও সেগুলো কালক্রমে অকেজো হয়ে পড়েছে। এই সময়ে বিত্তশালীরা টাকাকড়ি প্রাচীন প্রথানুযায়ী মাটির মধ্যে পুঁতে না রেখে তক্তপোষের মধ্যে চোরা বাক্স তৈরী করে তারমধ্যে টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদি গুপ্ত রেখে তার উপর শয্যা পেতে রাখতেন। এই রকম চোরা বাক্সর নাম ছিল—'ইস্‌কাতর' আর ঐ রকম বাক্সওয়ালা তক্তপোষের নাম ছিল 'মাইাপোষ'। পাকা বাড়ীতে দেওয়াল আলমারির পশ্চাৎভাগেও এক রকমের গুপ্ত কাঠের বাক্স পোতা থাকত, বাইরে থেকে সেগুলো দৃষ্টি গোচর হত না। আলমারির মধ্যে রক্ষিত জিনিষপত্রের দ্বারা সেই গুপ্ত বাক্সগুলো আবরিত হয়ে থাকত।

আনুমানিক ১২৯০ সালে স্বরূপচন্দ্র একমাত্র পুত্র ক্ষেত্রচরণকে রেখে পরলোক গমন করেন।

বিশ্বনাথ ডাকাত।

যে সময়ের কথা আলোচনা করা হচ্ছে সে সময় রিষড়ার পরিবেশ কেমন ছিল তা লেখকের ভাষাতেই বর্ণনা করা যাক :—

"গঙ্গার পশ্চিমতীরে রিষড়া গ্রাম। একশত বৎসর আগে গ্রামখানি ছিল জন-বিরল, ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। গঙ্গার পাড় ছিল পাহাড়ের মত উঁচু, সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া লোকেরা গঙ্গাস্নানে আসিত, যাইত, নৌকায করিয়া নানাদিকে যাতায়াত করিত। সেই সময়ে রিষড়া গ্রামে বাস করিত এক দুর্দ্দান্ত ডাকাত, তাহার নাম ছিল বিশ্বনাথ ডোম।"

বিশ্বনাথ ডোম ছিল দীর্ঘকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। লাঠি-তলোয়ার চালাইতে এবং বর্শা ছুঁড়িতে সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। মাথায় ছিল কাঁচা-পাকা ঝাকড়া চুল—বাহুতে ছিল সোনার বাজু, দুই হাতে কর

প্রকোষ্ঠে সোনার বালা, গলায় সোনার হার। বিশ্বনাথের সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, মদ্যপানের জন্য জবাফুলের মত রক্ত-চক্ষু, হা-রে-রে চিৎকার ও নিত্য নূতন উপদ্রবোর জন্যে লোকে তাকে সাক্ষাৎ যমের মত ভয় করত।

বিশ্বনাথ ডোমের একটা গুণ ছিল যে, সে দীন্-দরিদ্রের উপর কখনও কোন অত্যাচার উৎপীড়ন করত না। উপরন্তু অর্থাভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না, বিশ্বনাথ জোর ক'রে ডাক্তার ধরে এনে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করত। 'পনের' টাকা সংগ্রহ করতে না পারায় বরপক্ষ বিবাহে অমত করলে, বরকে টেনে এনে বিবাহের ব্যবস্থা করত। এই সমস্ত কারণে দরিদ্রলোকেরা তাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত।

সমগ্র হুগলী, বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ ও কলকাতার অধিবাসীরা তার নামে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকত। ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোকেদের বাড়ী ডাকাতি করাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং ডাকাতি করার আগে পত্র দেওয়ার রীতিও সে মেনে চলত। শোনা যায়, রিষড়ায় কৈলাস চন্দ্র লাহা মহাশয় সপরিবারে ৺কাশীধামে বা কানপুরে থাকা কালীন তাঁদের বাটীতে কয়েকবার ডাকাতির চিঠি এসে ছিল কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে ডাকাতি সংঘটিত হয় নি, সে সময় প্রায়ই তাঁদের পুরোহিত বংশ হড় মহাশয়রা তাঁদের বাড়ীতে রাত্রে পাহারা দিতেন। তাঁরা সে কালে শারীরিক ক্ষমতার জন্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, জমিদারী রক্ষার কাজে, ডাকাত দলনে তাঁদের ডাক পড়ত বারবার।

(১৮৩৮-১৮৪২) হুগলী জেলায় ডাকাত দল রেকর্ড সৃষ্টি করে-ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, বৃটিশ সরকার তাই ডাকাতি কমিশন নিয়োগ ক'রে ডাকাত দলনে সচেষ্ট হন এবং এবিষয়ে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। বহু প্রসিদ্ধ ডাকাত ধরা পড়ে এবং তাদের দুঃসাহসিক কার্যাবলীও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে।

রিষড়ার বিশ্বনাথ ডাকাতও একদিন ধরা পড়েছিল। হুগলী

জেলার এক বিখ্যাত জমিদার ছিলেন প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচারী। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে ছিল তাঁর খুবই সম্প্রীতি। তাঁর নিজেরও নীলের আবাদ ছিল এবং প্রজাদের দাদন দিয়ে জোর ক'রে চাষ করাতেন।

দলের লোকের অনুরোধে বিশ্বনাথ এই জমিদার বাড়ী ডাকাতি করতে মনস্থ ক'রে এক সপ্তাহ আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়। জমিদার বাবু এই চিঠি পেয়ে লোকমারফৎ শ্রীরামপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন।

বকল্যাণ্ড সাহেব নামে একজন নূতন সিভিলিয়ান ছিলেন তখন শ্রীরামপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি এই সংবাদ পেয়ে সিপাই শান্ত্রী দারোগা কনেষ্টবল্ নিয়ে পূর্বোক্ত জমিদার বাড়ী যাওয়ার পথঘাট-জলপথ ও স্থলপথ পাহারায় রইলেন। বিশ্বনাথ এই সংবাদ পেয়েও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার দলের প্রায় দু'শত লোক নিয়ে জমিদার বাড়ীর দিকে এগুতে থাকে।

অল্পদূরে একটা গ্রামের মধ্যে দুদলের দেখা হয়ে যায়। দুইপক্ষে তখন হাতাহাতি, মারামারি— বর্শা, মুগুর, তলোয়ার ও লাঠিতে লাঠিতে লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়, অবশেষে কোম্পানীর ফৌজের কাছে বিশ্বনাথের দলের লোকেরা হেরে যায়। বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের হাতে বিশ্বনাথ ডোম ধরা পড়ে। তার অপরাধ সপ্রমাণিত হওয়ায় হুগলী জেলে একদিন তার ফাঁসী হয়ে যায়।

বকল্যাণ্ড সাহেব বিশ্বনাথকে ধরবার পর সমাচার দর্পণে একখানা পত্র প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রটি ছিল একদিকে যেমন বকল্যাণ্ড সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; ভাষার দিক থেকেও তেমনি ছিল অনবদ্য—তার কয়েকছত্র ছিল নিম্নরূপঃ—

"শ্রীযুক্ত বকল্যাণ্ড সাহেব,

অখণ্ড প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডবৎ দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত দেশ হিতৈষী সদগুণ

রাশি বিপুল সাহসী দস্যুবেষী ... শ্রীযুক্ত জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় শ্রীরামপুর শহরে উদয় হওনান্তর আমরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া ... যদ্ধেতু বিশ্বজন নিঃস্বকারী দস্যুদলাধিকারী রিষাড়া নিবাসী বিশ্বনাথ ডোম সদা সহচরগণসহ মদ্যাদিপানে নিয়ত্তো মত্তমনে দেশবিদেশ বিজয়ী ও বিখ্যাতরূপে নিঃশঙ্কে ছিল।

.. অধুনা কথিত দস্যু শ্রীযুতের সুবিচার পারাবারে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ হওয়াতে প্রজাগণ অহরহ গমনে ভোজনে শয়নে স্বপনে শ্রীযুতের শুভাকাঙ্খী হইয়া নিশান্তে নিদ্রাভঙ্গে ... শ্রীযুত অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিশ্বনাথকে চিররুদ্ধ রাখিলে এতদ্দেশীয় প্রজাগণ সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে শক্ত হয়। কিমধিক নিবেদনাধীন। শ্রীকেদারনাথ হালদার, শ্রীরামপুর, ১১ই জুলাই ১৮৫১ সাল।"

বলা বাহুল্য, যে বিশ্বনাথ ডোম ধরা পড়ায় চারদিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃঃ ২৯৭) শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় যে 'বিশে ডাকাতের' কথা উল্লেখ করেছেন তার বাড়ী ছিল ডুমুরদহে।

যাইহোক, ডাকাত দলনে সে যুগে মহিলাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। কোনও কোন দুঃসাহসিকা রমণী আলুলায়িত কেশে প্রবেশ দ্বারের পাশে খড়্গ হাতে উলঙ্গিনী বেশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঢেঁকির আঘাতে দরজা ভেঙ্গে ডাকাত দলের প্রথম দুচারজন ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে খড়্গাঘাতে তাদের মস্তক ভূমিতে লুটিয়ে পড়ত। রক্তের স্রোত বয়ে যেত প্রবেশ পথে। অবশিষ্ট ডাকাত দল সে দৃশ্য দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হত। তাঁদের সেই সব বীরত্ব কাহিনী প্রাচীনদের স্মৃতিতে আজও কিছু কিছু জেগে আছে, একেবারে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যায় নি।

প্রাচীনা রমণীরা দু'একজন আবার শোবার আগে প্রদীপের আলোয় বাড়ীর অন্ধি-সন্ধি নিরীক্ষণ করে নিম্নলিখিত বাড়ী-বন্ধন

মন্ত্র পড়ে চোর ডাকাতের ভয় নিবারণ করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই মন্ত্রে বাড়ী বন্ধন করলে চোরের সাধ্য ছিল না বাড়ীর ত্রিসীমানায় পা বাড়ায়:—

"কপ্ পোল্ কপ্ পোল,
যদ্দুর যায় কপ্ পোলের বায়,
চোর চোট্টা না বাড়ায় পায়!
বাঁধলাম ঘর, বাঁধলাম বাড়ী,
কোন্ চোরা করবে চুরি!" ইত্যাদি

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সে যুগে আত্মরক্ষার তাগিদে লোকে বলিষ্ঠ দেহগঠনে বিশেষ যত্নবান হতেন। উচ্চ শ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই লাঠিখেলার প্রচলন ছিল বেশী, তারা ওস্তাদ ধরে লাঠিখেলা শিক্ষা করত। ভোজপুরী অবাঙালী দরয়ান তখনও আমদানি হয়নি। উপরোক্ত লাঠিওয়ালরাই মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণীর ধনপ্রাণ রক্ষা করত। রিষড়ার দুলেপাড়া, বাগদিপাড়া হাড়িপাড়ার অবস্থিতি আজও সেই যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডাক্তার-বন্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ উত্তীর্ণ হবার পর থেকে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতি একটা আকর্ষণ ফুটে উঠতে থাকে এবং নিজেদের শিক্ষিত পুত্রদের ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রবণতা দেখা দেয়।

যদিও রিষড়ার দু'জন কৃতি সন্তান ডাঃ চন্দ্রকুমার ও ডাঃ নীল-মাধব তখন যশস্বী চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কিন্তু রিষড়ার অধিবাসীরা তাঁদের চিকিৎসালাভে বঞ্চিত ছিলেন, কাজেই তখন কবিরাজী চিকিৎসাই ছিল একমাত্র সম্বল।

শ্রীমন্ত মান্না।

কবিরাজী ঔষধের সঙ্গে অনুপানের মূল্য ছিল সর্বাধিক। অনুপান ভেদে একই ঔষধ বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত হত। অনুপানের অভাবে বা তার ব্যতিক্রম ঘটলে কবিরাজি ঔষধ কার্যকরী হত না। এই সম্বন্ধে একটা বাস্তব ঘটনা ধর্মদাস হড লেন নিবাসী ৺শ্রীমন্ত মান্নার (শিবদাস মান্নার পিতামহ) আমলে ঘটেছিল বলে শোনা যায়। তিনি রিষড়া ও মাহেশ অঞ্চলে সামান্য সামান্য কবিরাজী চিকিৎসা করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ঔষধ ফলপ্রসূ হত। মাহেশে এক কঠিন রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে তিনি বিশিষ্ট অনুপান সহ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দিয়ে আসেন কিন্তু ব্যস্ততা প্রযুক্ত বা সংগ্রহের অভাবে অনুপান ব্যতিরেকে কেবল মাত্র বটিকা খাওয়ান হয় যার ফলে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠে। তখন শ্রীরামপুরের হাসপাতাল থেকে সিভিল সার্জেন ডাক্তারকে আনা হয়। তিনি ঘটনার বিবরণ শুনে কবিরাজকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর প্রদত্ত ঔষধ খেয়ে রোগী অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়েছে বলে তাঁর উপর দোষারোপ করেন।

মান্না মহাশয় কিন্তু তাঁর ঔষধ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় ছিলেন। অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে অনুপান বাদ দিয়েই ওষুধ খাওয়ান হয়েছে। তখন তিনি ব্যবস্থামত অনুপান সহ ঔষধ বটিকা স্বহস্তে রোগীকে সেবন করান, যার ফলে রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেন। এর ফলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর আত্মীয়স্বজন তাঁকে বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করেন।

শ্রীমন্ত মান্না মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল মশাটে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে তিনি রিষড়ায় এসে বাস স্থাপন করেন এবং রিষড়া-কোন্নগর অঞ্চলে প্রায় অর্দ্ধশত পুষ্করিণীর জমা বন্দোবস্ত গ্রহণ

করেন। মোট কথা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমার এতদঞ্চলে জাতীয় ব্যবসায় সূত্রে বিশেষ সুপরিচিত ও সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীতে পূজাপার্বণে, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠানে মাছ সরবরাহ করার ফলে বহু পরিবারের অন্তরঙ্গ মহলের সংবাদ ও তথ্যাদি অবগত হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৮-১১-১৯২৩ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

পীতাম্বর গুপ্ত।

কবিরাজ হিসাবে রামজীবন গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺পীতাম্বর গুপ্ত মহাশয় এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তন্ত্রোক্ত বিধানে তিনি ঔষধপত্র নিজ তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী করতেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট অভিজ্ঞ। কথিত আছে যে তিনি শেষ বয়সে তন্ত্রসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা করতে থাকেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য হওয়ার ফলে তিনি উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হন।

তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভা কর্তৃক তাঁর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি রাস্তা (বাঙ্গুর কলোনীর সংযোগস্থল পর্যন্ত) পীতাম্বর গুপ্ত লেন নামে অভিহিত হয়। এ সম্বন্ধে পৌরসভা কার্য বিবরণীতে এবং তাঁর বংশধরগণের আবেদন পত্রে কোন্নগর নিবাসী ৺রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য :—

"I have much pleasure to state that the Lt Lamented Kaviraj Pitamber Gupta of Rishra was a good sanskrit scholar vastly learned and a famous kaviraj of our quarter and I should be pleased if our Municipality will please comply with the request of his grandsons and other nearest relatives and as well as the residents of that quarter to grant

the name of that lane as "Pitamber Gupta lane".

He was a pious and erudite sanskirt scholar and a good physician of the ayurbedic school and it will be a well deserved memorial."

Sd/ Rajendra Nath Mukherjee.
Dy, Supdt (Retired)
Govt. of India, Rev. & Agri. Deptt.
Konnagar, 17th Sept. 1927.

উক্ত ব্যাপারে ৺নিবারণ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। রিষড়ার প্রকৃত বানান ব্যবহার করবার জন্যে রেলওয়ে ও পোষ্টাল বিভাগে দেশবাসীর পক্ষ থেকে আবেদন পত্র দেওয়ার মূলেও ছিল তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মচাঞ্চল্য।

ত্রিপুরারী গুপ্ত

রামজীবন গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র ৺ত্রিপুরারী গুপ্ত সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ঘনিষ্টতা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবার রিষড়ায় গুপ্তমহাশয়ের বাসভবনে পদার্পণ করেন এবং ঐখান থেকেই উভয়বন্ধুতে কালীকুমার দের বৈঠকখানায় গমন করতেন। আলাপান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাহেশে তাঁর প্রিয় ছাত্র উমাশঙ্কর তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক ১৮৭২ খৃঃ 'মেট্রোপলিটান কলেজ' স্থাপিত হাওয়ার পর গুপ্ত মহাশয় উক্ত কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা

করেন। (৺অভয়চরণ গুপ্ত মহাশয়ের বিবৃতি অনুযায়ী)

দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচলিত জীবন চরিত গুলিতে ৺ত্রিপুরারী গুপ্ত মহাশয়ের নামোল্লেখ দেখতে পাইনি। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয়ের ('বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' লেখক) পত্রটি উদ্ধার যোগ্য :—

SARASIJA.

47/4 Jadavpur Central Road

Calcutta—32.

৮।৭।৬৮

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। রিষড়ার ইতিহাস প্রণয়নে আপনি উদ্‌যোগী হয়েছেন জেনে খুবই খুসি হয়েছি। এ রকম আঞ্চলিক ইসিহাস নিয়ে ভালকরে কাজ করতে পারলে, বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সমগ্র রূপটি জানা সম্ভব হবে। আপনার উদ্দেশ্য সফল হোক, কামনা করি।

ত্রিপুরারী গুপ্তের নাম এখনও কোথাও কোন প্রসঙ্গে পাইনি, পুরনো পত্রিকাদিতেও না। নামটি মনে রাখব এবং সময় মতো খুঁজব। যদি নজরে পড়ে ও কিছু জানতে পারি, আপনাকে অবশ্যই জানাবো। ইতি—

ভবদীয়

বিনয় ঘোষ।"

বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আর কোনও পত্রাদি পাওয়া যায় নি, বা কোনও তথ্যও আবিষ্কৃত হয়নি।

ত্রিপুরারী গুপ্ত মহাশয় অতি প্রত্যুষে নৌকাযোগে কলকাতায় যাতায়াত করতেন। একদিন কাক-জ্যোৎসনায় সময় ঠিক করতে না পারায় মধ্যরাত্রের পরই বাড়ী থেকে বাহির হওয়ার ফলে পথিমধ্যে ভূতের উপদ্রবে বিশেষ বিপদাপন্ন হন। পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট দিয়ে

যেতে যেতে দেখেন হালদার মহাশয়দের বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশ রাস্তা অবরোধ ক'রে শোয়ান রয়েছে। এই অবস্থায় বাঁশটি ডিঙ্গিয়ে যেতে গেলে সেখানা সটাং ক'রে খাড়া উপরে উঠে যাওয়ার ফলে তাঁর জীবনাশঙ্কা। এই কথা চিন্তা ক'রে তিনি কিছুক্ষণ ভীতিবিহ্বল চিত্তে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরপথে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন এবং মাঝিকে ঘটনার কথা শোনান। মাঝি বলে যে বাবু! আপনি রাত ঠাওর করতে পারেন নি। ভাগ্যফলে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। এমনটি আর কখনও করবেন না।

বলা বহুল্য, এই ধরণের ঘটনা তখন অন্যান্য কয়েকজনের জীবনেও ঘটেছিল বলে জানা যায়।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ গুপ্ত ও কনিষ্ঠ বিভূতিভূষণও রিষড়ায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা করতেন। বিভূতিভূষণ গুপ্ত মহাশয় কিছুকাল রিষড়া বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি আজীবন অনাড়ম্বর বেশভূষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২১শে জুন পরিণত বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

দিনেমার কোম্পানীর বিদায় গ্রহণ।

এতদঞ্চলের পরবর্ত্তী ইতিহাস পর্য্যালোচনা করার আগে একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার সঙ্গে রিষড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

ভারতে দিনেমার কোম্পানীর ব্যবসায় ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী ডেন সম্রাট সাড়ে বার লক্ষ টাকায় ভারতের অন্যান্য ডেন ঘাঁটিসহ শ্রীরামপুর, ডিহিশ্রীরামপুর, আক্না ও পিয়ারাপুর গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় ক'রে দেন। ঐ তারিখেই ইংরাজ রাজপতাকা (ইউনিয়ন

ঞ্যাক) শ্রীরামপুর নগরীতে উড্ডীন হয এবং ঐ নগরী হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয এবং দ্বারহাট্টার পরিবর্ত্তে এই শহরেই মহকুমা অফিস স্থাপিত হয়।

Dwarhatta Subdivision corresponded to the modern Serampore and the head-quarters were removed to that town on its purchase from the Danes, later in the same year. (Toynbee)

উপরোক্ত পরিবর্ত্তনগুলো যে রিষড়ার অধিবাসীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে মহকুমা নগরী শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র ক'রে এতদঞ্চলে নব নব চিন্তাধারার উন্মেষ এবং কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। নব্বুই বৎসর ধরে দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুর নগরীর মধ্যেও বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছিল।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে 'সেন্টওলাপ' নামক গীর্জা দিনেমারগণ কর্ত্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এইটাই ছিল তখন নিকটবর্ত্তী খৃষ্টানদিগের একমাত্র ভজনালয়। রিষড়ার ভারতীয় ও ইউরোপীর খৃষ্টানগণ প্রতি রবিবার প্রাতে উপাসনার জন্যে এই গীর্জাতে যোগদান করতেন।

আণ্টুনি ফিরিঙ্গী কবিয়ালের বিপক্ষ কবিয়াল আণ্টুনিকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন :—

"যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গীর্জেতে।
তুই জাতফিরিঙ্গী জবডজঙ্গী পারবিনা ক তরিতে॥"

(সেকাল আর একাল, রাজনারায়ণ বসু)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেই হুগলী জেলায় প্রথম জরীপ কার্য সম্পন্ন হয়, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জায়গাজমির লিখিত পাট্টা, কবুলতি, চিটে প্রভৃতি। শোনা যায়, উক্ত জরিপ কার্য উপলক্ষে যে ত্রিশূলাকৃতি লৌহদণ্ড স্থানে স্থানে মাটিতে প্রোথিত

হয়েছিল তার কতকগুলি পরবর্ত্তী কালে মৃত্তিকা খনন কার্যের সময় দৃষ্টিগোচর হয়েছিল ।

কবিয়াল কৈলাস বারুই

রিষড়ার মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তানদের মধ্যে কৈলাসচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। ইনি ছিলেন বৈশ্য বারুজীবি। পিতার নাম শ্যামাচরণ আশ। যতদূর জানা যায়, এই বংশের কোন এক উর্দ্ধতন পুরুষ যশোর থেকে প্রথমে গাজীপুর (হাওড়া জেলা) এবং পরে রিষড়ায় বসবাস করেন। আনুমানিক ১৮৪০ খৃঃ কৈলাস চন্দ্রের জন্ম হয়। পানের ব্যবসাই ছিল তাঁদের স্বজাতীয় বৃত্তি। এই পানই ছিল তখন রিষড়ার একটা বিখ্যাত পণ্য সামগ্রী ও অর্থকরী সম্পদ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ।

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংগ্রহ মধ্যে কৈলাস আশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যঙ্গোক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটা তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালের রচনা ঃ—

"পান বেচে খায় কৈলেস আস,
তার দেখি বড় লম্বা আশ॥"

উক্ত কারণেই কৈলাস আশ, কৈলাস বারুই নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। শোনা যায়, বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী এবং তাঁদের স্বজাতি শীলেদের বাড়ীতে তখন যে গান বাজনার চর্চ্চা হত, সেইখানেই হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার হাতে খড়ি, পরবর্ত্তী কালে তিনি প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের অধিকারী গোপাল উড়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন— সম্ভবতঃ গোপালের জীবনের শেষের দিকে (জীবিতকাল-১৮১৯-১৮৫৯)।

গোপালের জন্ম হয় কটক জেলার অন্তর্গত জাজপুর গ্রামে।

১৮/১৯ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এই সময়ে বহুবাজারে রাধামোহন সরকারের একটা সখের দল ছিল। গোপাল ১০্ টাকা মাহিনায় ঐ যাত্রাদলে যোগদান ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই সুগায়ক হয়ে উঠেন। বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সেজে প্রথম আসরেই এমন সুন্দর অভিনয় করেছিলেন যে রাধামোহন বাবু দশ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁর পঞ্চাশ টাকা বেতন ধার্য করেন। তিনি দেখতে এত সুন্দর ছিলেন যে স্ত্রীলোক সাজলে সহজে কেউ তাঁকে পুরুষ বলে ধরতে পারত না। পরবর্ত্তী কালে তিনি নিজেই নূতন দল খুলে ফেলেন এবং সারা বাংলা দেশে সুনাম অর্জন করেন।

অনেকেই একথা বলেছেন যে গোপালের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটাও তাঁর স্বরচিত নয়। কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং হুগলী জেলার সিঙ্গুর গোপালনগর নিবাসী ভৈরব হালদার প্রভৃতির অনেক ভাল ভাল গান বিদ্যাসুন্দর টপ্পায় সন্নিবেশিত হয়েছে। ভৈরব চন্দ্র হালদার ১২৩০ সালে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান নাটকাকারে বেঁধে দেন। (হুগলী জেলার ইতিহাস-৩য় খণ্ড)

সাহিত্যাচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" মধ্যে অবশ্য লিখেছেন যে — "বিদ্যাসুন্দরাদির পালা যাত্রার দলে গীত হওয়ার জন্য, কতকগুলি ললিত শব্দবহুল, কদর্য্য ভাবপূর্ণ গান রচিত হইযাছিল ; এই সকল গানের সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ওস্তাদ কবি গোপাল উড়ে। ইনি ভারত চন্দ্রের একবিন্দু ঘনরস তরল করিয়া একশিশি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায এই দুই কবি গোপাল চন্দ্র দাস উড়ের চেলাগিরি করিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনই অতি যোগ্য শিষ্য। কৈলাস বারুই কবির আবার চুটকি রাগিনী মিশাইযা স্বভাব বর্ণনা করিবার হাত যশটুকু ছিল ; নমুনা এইরূপ :—

"গা তোলরে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।"
(গীতিশাখা—পৃঃ ৬২৯)

কৈলাসচন্দ্র বহু গানই রচনা করেছিলেন, তার কতকগুলি তাঁর প্রপৌত্র শ্রীমান মনীন্দ্র আশ তার রচিত 'কৈবিয়াল কৈলাস বারুই ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছে। অনিসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত পুস্তক পাঠে কৈলাস বারুই সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হতে পারবেন।

উক্ত পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে কৈলাস বারুই "সেই সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ যাত্রা দলের অধিকারী ছিলেন। কৈলাস কবি গাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কৈলাসের বিদ্যাসুন্দর পালা তাঁহাকে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন করিয়াছে।" (বিশ্বকোষ)

কবিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় হয় বলেই একজাতীয় গানের নাম 'কবিরগীত' এবং যে গায় তাকে 'কবিদার' বা 'কবিওয়ালা' বলে। কে কেমন গান বাঁধতে পারেন এবং অমর্গল উপস্থিত 'বোল' আওড়াইতে পারেন তার পরীক্ষার জন্যেই কবির পাল্লা বা কবির লড়াই বলা হত।

সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য থেকে প্রশ্ন তুলে একদল অপরদলকে অক্রমণ করতেন। অপরপক্ষের কবিদার বা সরকারকে সুকৌশলে তার জবাব দিতে হত। এই উত্তর ও প্রত্যুত্তর কালে (কাটান ও চাপান) অনেক সময় অশ্লীল বা মোটা ভাষায় গালাগালি চলত. শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গ সমান ভাবে ঐ সমস্ত রসাল উক্তি ও প্রত্যুক্তি উপভোগ করতেন এবং 'বাহাবা' দিতেন। মধ্যে মধ্যে অবশ্য দেহতত্ত্ব ও ধর্মভক্তি রসাত্মক গানও পরিবেশিত হত। উহার ভাব ও ভাষা এবং রচনা মাধুর্য উচ্চ সমাজে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' নামক পুস্তকে লিখেছেন — 'কবিওয়ালাদিগের এক একটি কবিতা এমন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হরু ঠাকুরের (দীর্ঘাঙ্গী) একটি কবিতা ছিল নিম্নরূপ :—

"নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
সুখে লোক বলয়ে পিরিতি সুখের সার ,
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই ॥"

গোঁজলা গুঁই নামক একজন কবিওয়ালা স্বামীর উক্তির ছলে বলেছেন :—

"তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ! তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কৈলাসচন্দ্র প্রথমে কবিগান গেয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তারপর বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন।

রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, বলরাম, রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দরের স্থান বর্দ্ধমান বলে উল্লেখ করেছেন। সেই কারণেই 'বর্দ্ধমান' তখন এতদঞ্চলের অধিবাসীদের মনে একটা স্বপ্নের বেড়াজাল বুনতে আরম্ভ করেছিল।

বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত প্রণয় কাহিনীর কেন্দ্রস্থল ছিল বর্দ্ধমান রাজ অন্তঃপুর। সুন্দর নামে এক পরম রূপবান ও গুণবান রাজপুত্র হীরা বা হীরাবতী মালিনীর সাহায্যে গোপনে বর্ধমানের রাজকন্যা

পরমাসুন্দরী বিদ্যাকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বিদ্যা গর্ভবতী হয়ে পড়ায় সে সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হয় এবং তিনি সুন্দরকে বন্দী ক'রে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। 'সুন্দর' তখন দেবী কালিকার স্তব স্তুতি করায় তিনি আবির্ভূতা হয়ে সুন্দরকে মুক্ত ক'রে দেন।

বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করেই বহু কবি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার পালা রচনা করেন এবং সে সমস্ত রচনা-গুলো অধিকাংশ স্থলেই ছিল অশ্লীলতা দৃষ্ট। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র লিখেছেন—"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথায় আমোদ ছিল না, যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যা পক্ষে এবং কালী পক্ষে, দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজাপার্ব্বন অশ্লীল দুর্গোৎসবের নবমী বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ্ অশ্লীল হইলেও লোক-রঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।"

বিদ্যাসুন্দর যাত্রাভিনয় তৎকালীন বাঙালী সমাজের জনপ্রিয়তা অর্জন করেই ক্ষান্ত হয়নি—ইংরেজরাও তার দ্বারা রীতিমত ঘায়েল হয়ে গিয়েছিলেন। 'ক্যালকাটা গেজেট' ও অন্যান্য পত্রিকায় এই সব আদিরসাত্মক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ তাঁরা প্রকাশ করতেন।

স্থানে স্থানে মালিনীর অভিনয় এত হৃদয়গ্রাহী হত যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরিকারাও আত্মহারা হয়ে চিকের আড়াল থেকে অভিনেতাদের উদ্দেশ্যে পানের দোনা ছুঁড়ে দিতেন। বিদ্যাসুন্দর পালা গানের দু'এক লাইন তখন প্রায় সকলের মুখেই শোনা যেত। রাখাল ছেলেরাও গরু চরাতে চরাতে সুর করে গাইত :—

"যাদু এমন কথা কেন বলিলি
ভোরের বেলা সুখের স্বপন
এমন সময় আমায় জাগালি।"

এহেন জনপ্রিয় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী, গান, বাজনা ও নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশনকারী কৈলাস চন্দ্র সে যুগের জমিদার শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ শ্রোতাদের মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই উপলক্ষে তিনি বহু মূল্যবান উপঢৌকন লাভ করেন। বেহালা বাজনায় তাঁর বেশ হাত-যশ ছিল বলে শোনা যায়। তাঁর ভোজন পটুতা সম্বন্ধেও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

রিষড়া নিবাসী ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখে-ছেন—"রিষিড়া গ্রামে আশেরা শীলেরা বহু পুরাকালের অধিবাসী। এই আশ (বারুই) বংশে কৈলাস চন্দ্র আশ নামীয় এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কুঞ্জবিহারী আশ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। কৈলাসের যাত্রার দল ছিল। বিদ্যাসুন্দর পালা গীত হইত। ভুলোর দল (ভোলানাথ দাস) ও ভুলোর ছেলের দলে (গগন চন্দ্র দাস) ঐ পালা গাওয়া হইত। কখন কখন প্রতিযো-গিতায় কৈলাসের দল জয়ী হইত। কৈলাস যাত্রা গাহিয়া বহু অর্থ ও শীতবস্ত্র পারিতোষিক রূপে পাইতেন। তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রমোহন আশ ঐ দল পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মালিনী ও ক্ষেত্র মোহন নিজে সুন্দর সাজিত। শেষ অভিনয় আমাদের মনে পড়ে।"

প্রাচীনদের মুখে শোনা যায় বিদ্যার ভূমিকায় মতিলাল মোদক ও পরে কৈলাসের অপর পুত্র প্রিয়নাথ আশ অভিনয় করতেন। আনু-মানিক ১৮৯৬ খৃঃ কৈলাসচন্দ্র পাঁচ পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন।

ইতিপূর্বে রিষড়ার কোন যাত্রা বা থিয়েটার-দলের কথা শোনা যায় না। উপরোক্ত দলটিই ছিল পরবর্ত্তী বিভিন্ন সখের দলের পথ-প্রদর্শক।

১৯৫৯ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের সভায় পৌর সদস্যগণ বাঙ্গুর কলোনির একটি রাস্তা কৈলাসচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর নামে অভিহিত করেন।

কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীমাণী।

রিষড়ায় বিভিন্ন বংশের আগমন প্রসঙ্গে শ্রীমাণি বংশেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা হলেন তিলি বংশ সম্ভূত এবং মৌড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার এবং শ্রীরামপুরের খ্যাতনামা দে বংশের সঙ্গে ইহারা বৈবাহিক সম্বন্ধ যুক্ত।

যতদূর জানা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমাণি মহাশয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মাকড়দহ থেকে রিষড়ায় আগমন করেন এবং তাঁর এক আত্মীয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। সে যুগে তিনি ধান চালের ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। জি, টি, রোডের পূর্বপার্শ্বে (বর্ত্তমান শ্রীমাণি ম্যানসন) তাঁর সুবৃহৎ পাকা গুদাম ঘর ছিল।

এই বংশ সম্বন্ধে ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতি চারণায়' নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ঃ—

"রিষিড়ায় শ্রীমাণি বংশ বহু পুরাকালের বংশ। আমি কুবের শ্রীমাণির পিতামহ কৃষ্ণ শ্রীমাণিকে দেখিয়াছি। ইঁহার আমলে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। পাঁচু গোঁসাইকে কথকতা কহিতে শুনিয়াছি। তাঁহার বাড়ী গঙ্গাতীরে ছিল—যে বাড়ী এখন ৺কুমুদ নাথ মুখোপাধ্যাযের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন।···

৺কৃষ্ণ শ্রীমাণি তুলট (তুলাব্রত-নিজের দেহের ওজনের দান সামগ্রী) করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই তুলটের সামগ্রী ব্রাহ্মণ দিগকে দান করেন। রিষিড়ার মুন্সি বংশ ··· ৺তারক মুন্সি, ৺নিলু মুন্সি ও পূর্ব্বতন মুন্সিগণ এই শ্রীমাণি বংশের পুরোহিত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণ শ্রীমাণির এক পুত্র ৺মহেন্দ্রনাথ শ্রীমাণি গঙ্গাবক্ষে স্নানের জন্য একটি পাকা ঘাট নিৰ্ম্মাণ করিয়া পরলোকগত হন। দেবদ্বিজে তাঁহার অচলাভক্তি ছিল। তিনি জীবদ্দশায় ব্রাহ্মণের পদরেণু না লইয়া জল খাইতেন না। তাঁহার সুস্থ দেহ ছিল।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে রিষড়ার বনেদী বাড়ীর দুর্গোৎসব

বলতে এঁদের বাড়ীর পূজা ছিল অন্যতম। দেবী প্রতিমার প্রাচীন শিল্পরীতির ছাপ এবং অঙ্গ সজ্জায় ডাকের গহনা আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইঁহারাও কিছুদিন সামাজিক বিতরণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এঁদের পুরাতন বাড়ীর আশ পাশ ছিল তখন নিঃসঙ্গ ঝোপ ঝাড়ে ঘেরা। পূজার সময় দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্যে তাঁরা দু'মুখো তেলের 'কুপি' জ্বেলে সরু গলিপথটি আলোকিত করার ব্যবস্থা করতেন।

সে যুগে এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে কি ধরণের সাজ পোষাক পরিধান করতেন তার পরিচয় 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' থেকে উদ্ধার যোগ্য :—

"১২৫০ সাল ২৫ শে আশ্বিন সোমবার। আজ ষষ্ঠী, গ্রামের চারদিকেই বাজনা বাদ্দি হচ্ছে, বাজন্দরেরা ঢোল পিঠে করে বাড়ি ২ ঘুরছে, ঢাকীরা ছেঁড়া ঢাকে তালি দিয়ে বাজাতে ২ ছুট্‌ছে। ...... পাড়ার ছোঁড়ারা সব মরিয়া হয়ে নেচে কুঁদে বেড়াচ্চে ; মা ভগবতীর আগমনে সর্ব্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ। ... দেশের ছেলেরা নূতন শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনির বাহার দিয়ে খাতায় ২ ঘুরছে, ক্ষুদে ২ ছেলেরা সাজ পরো ল্যাজওয়ালা পাগড়ি মাথায় দিয়ে, গুরিয়া পুতুলের মত ঘুর ২ করে বেড়াচ্চে। গয়লা, ছুতোর, কামার ও কুমারেরা কালাপেড়ে কোরাধুতি ও ধোয়া মলমলের চাদর গায়ে দিয়ে চুল ফিরিয়ে বাবু সেজে বাহার মারচে। আজি তাদের ভারি আনন্দ, ... ।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। পূজো বাড়ির উঠানে পাইল খাটিয়ে তাতে সব ঝাড় লণ্ঠন টাঙান হয়েছে,......ফরাসরা গ্লাস সাফ করে তেল দিয়ে বাতি জ্বেলে দিবার উদ্‌যোগ করতে লাগ্‌লো, পূজার দালান ধূনার ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল।"

তখনকার দিনে নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্বদিগকে প্রতিমা দর্শন করে

প্রণামী দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে 'সম্বাদ-ভাস্কর' পত্রিকায় ১৮৫৬ খৃঃ আগাষ্ট মাসে (৬১ সংখ্যায়) নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়ঃ—

"ঠাকুর দর্শন করিয়া কোথায় (কাহারো গৃহে) চারি আনা, কাহারো গৃহে আট আনা এবং কাহারো গৃহে একটাকা দিতে হয়, এইরূপ নিয়মে যদি ১৫/১৬ স্থানে মান রক্ষা করিয়া ভ্রমণ করেন তবেই দীন ব্যক্তির পক্ষে প্রতুল।

ঠাকুর দর্শন করিয়া যাহা প্রণামী দেওয়া যায় তাহা গৃহস্থ ব্যক্তি লাভ করেন, কাহারো বা গুরু পুরোহিতকেই সেই প্রণামী দিবার সময় কে কি দিল তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে বাটীর কর্ত্তা যখন আবার সেই সেই লোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত যাইবেন তখন সেই সেই নিয়মে দিতে হইবেক।" এই প্রথা পূর্বে রিষড়াতেও প্রচলিত ছিল।

৺কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমাণি মহাশয়ের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺যদুনাথ শ্রীমানি কিছুদিন ওয়েলিংটন জুট মিল ডিস্পেনসারীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী করেই যাতায়াত করতেন। অপর দুই পুত্র ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন। কনিষ্ঠ মহেন্দ্রনাথ আনুমানিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (প্রতিষ্ঠালিপি অপসারিত) গঙ্গাতীরে তদীয় স্বর্গীয়া পত্নী বসন্ত কুমারী দাসীর স্মরণার্থে একটি চাঁদনি-বিহীন পাকা ঘাট নির্মাণ করে দেন। (আলোক-চিত্র দ্রষ্টব্য) ঘাটে যাবার রাস্তাটি (জি, টি, রোড থেকে) বর্তমানে শ্রীমাণি ঘাট লেন নামে পরিচিত এবং 'প্রেমমন্দিরের' উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

মাহেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স এবং রিষড়ায় এ্যালকেলি কেমিক্যাল প্রভৃতি কারখানা স্থাপন কালীন ইঁহাদের বহু বিস্তৃত জায়গা জমি বিক্রয় হয়ে যায়।

ব্রজনাথ শ্রীমাণির বংশধরগণ এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ ইষ্টক ব্যবসায়ী

হিসাবে সুপরিচিত (T.N.B)।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমাণি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ শ্রীমাণি।

রামজীবন পাল

সপ্তগ্রাম থেকে আগত পাল বংশের পরিচয় পূর্বে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। যতদূর জানা যায়, রামজীবন পালের পূর্ব পুরুষের আমল থেকেই তাঁদের বাড়ীতে (পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটস্থ) দোল দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। বর্ত্তমানে এই পূজার দালান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও তার ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন স্মৃতি বহন করত। এই পূজার দালান সংলগ্ন প্রাঙ্গনেই রামজীবন পাল [ওরফে রামজী পাল] আঃ ১৮৩০ খৃঃ তুলা ব্রত করেছিলেন। কথিত আছে, মেদিনীপুর অঞ্চলে দেওয়ানজীর মত ইঁহাদেরও কিছু কিছু জমিদারী ছিল এবং সেখান থেকে নৌকা যোগে ধান চাল প্রভৃতি রিষড়ার ঘাটে এসে পৌছত।

শোনা যায়, পাল মহাশয়দের রাস্তার ধারে অবস্থিত দাঁড়ঘরের উপর তলায় একটী পাঠশালা বসত। বর্দ্ধমান নিবাসী তাঁদের সরকার ঐ পাঠশালার গুরু মহাশয় ছিলেন।

বংশবৃদ্ধির ফলে এই বংশের কয়েকটি শাখা অন্যত্র ব্যবসায় সূত্রে বাস স্থাপন করেন। খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী রামধন পাল এই বংশের সন্তান। তাঁর, ঠাকুরদাস, গুরুদাস, নবীন প্রভৃতি আটপুত্র। ইঁহাদের কয়েকজন খিদিরপুরে ও বরাহনগরে বসবাস করেন। প্রথমোক্ত তিনজন অবশ্য রিষড়াতেই থেকে যান এবং বর্ত্তমান পালবংশ ইঁহাদেরই বংশধর। ব্যবসাবাণিজ্য ও বেসরকারী চাকুরীর দ্বারা ইঁহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেন। ১৮৮৭ খৃঃ হুগলীর জুবিলী ব্রীজ নির্মাণকালে সহকারী

কণ্ট্রাক্টার হিসাবে গুরুদাসের পুত্র ৺ধর্মদাস পালের নামও জড়িত ছিল। তিনি পরে অবশ্য সদাগরী অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। তৎপুত্র ৺রাজকুমার পাল মহাশয় এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ গল্প-দাতু হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং বহু জায়গায় পারিতোষিক লাভ করেন।

রিষড়ায় তাঁদের নির্মিত কোন দেবালয় বা গঙ্গার ঘাট না থাকলেও, শোনাযায় কোন্নগরে ৺রাজরাজেশ্বরী মাতার সেবা পরিচালনার জন্যে তাঁরা কিছু জায়গাজমি দান করেন এবং তার স্মারক হিসাবে একখানি প্রস্তর ফলকও তৎকালে ঐ মন্দিরে স্থাপিত হয়েছিল।

এই বংশের শ্রীরমেশ চন্দ্র পাল এতদঞ্চলে একজন গণিতজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত।

পঞ্চানন ঠাকুর।

পঞ্চাননতলা স্ট্রীট নামকরণের সঙ্গে যে জি, টি, রোডের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত পঞ্চানন ঠাকুরের নাম জড়িত একথা বলাই বাহুল্য। ইঁহার প্রচীনত্ব সুবিদিত। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিগত সেটেলমেণ্ট পরচায় লেখা আছে:— 'পঞ্চানন ঠাকুরের স্থান'—মন্দির-১ হিন্দু সাধারণের ব্যবহার্য। ১১৭৭ সালের ছাড়পত্র, নিষ্কর ব্রহ্মত্র। ব্রহ্মত্র—হরেকৃষ্ণ হালদার। দং-বৈদ্যনাথ হালদার, পিতা ভোলানাথ হালদার। 'মানত' রক্ষার জন্যে শিশুদের মস্তক মুণ্ডনাদি উপলক্ষে এই বাবাঠাকুর তলায় (প্রচলিত নাম) পূর্বে ঢাকঢোল বাজিয়ে সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠানের কাহিনী জড়িত। উক্ত প্রথা আজও আংশিক ভাবে বর্ত্তমান আছে। মন্দির প্রকোষ্ঠ নির্মাণের সঙ্গেও একটি কিম্বদন্তী জড়িত আছে।

যদু পোদ্দারের ঘাট।

পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটের শেষপ্রান্তে (বর্ত্তমান কৈলাস চন্দ্র লাহা ঘাট লেন) কৈলাস চন্দ্র লাহা ঘাটের দক্ষিণে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে ৺যাদব চন্দ্র দে (ডাক নাম যদু পোদ্দার) জনসাধারণের হিতার্থে একটি পাকা ঘাট চাঁদনিসহ নির্ম্মাণ করে দেন। এই বংশের সঙ্গে রিষড়ার হাটের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলে জানা যায়। জি, টি, রোডের সংযোগ স্থলে তৎকালে যদু পোদ্দারের স্বর্ণকারের দোকান ছিল। শোনা যায় শ্রীরামপুরের ৺যুগল আঢ্য মহাশয়রা (যাঁর নির্ম্মিত ঘাট আজও বর্ত্তমান) ইঁহাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন।

এই ঘাটের পশ্চিমপার্শ্বে উত্তর দক্ষিণে লম্বা রিষড়ার হাটে যাবার একটি গলি পথ অবস্থিত ছিল বলে প্রাচীনদের মুখে শোনা যায়। ইহার কতকাংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তার অস্তিত্বের নিদর্শন উত্তরদিকে স্থানে স্থানে আজও দৃষ্ট হয়।

আকর গ্রন্থরাজি

১। প্রাচীন স্মৃতি—শ্রীহরেন্দ্র কুমার দত্ত।

২। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—শ্রীবিনয় ঘোষ।

৩। মাহেশ মঙ্গল—শ্রাদ্ধানন্দ শর্ম্মা।

৪। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত—শম্ভু চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

*৫। বাঙ্গলার পারিবারিক ইতিহাস—শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী।

৬। স্মৃতি চারণা (পাণ্ডুলিপি)—পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৭। প্রাচীন স্মৃতি—৺শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (বসুমতী)

৯। শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস—বসন্ত কুমার বসু।

১০। ইংরেজ আমলের বাঙালী ডাক্তার—অরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী।

(আঃ বাজার—২০/২।৭২

১১। হুগলী জেলার ইতিহাস—শ্রীসুধীর কুমার মিত্র।
১২। পুরানো কথা—শ্রীআদি কেশব লাহা।
১৩। প্রাচীন স্মৃতি—৺অনাদি নাথ লাহা।
১৪। নদীয়া কাহিনী—শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক।
১৫। বাংলার ডাকাত—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।
১৬। প্রাচীন স্মৃতি—শ্রীশিবদাস মান্না।
১৭। কবিয়াল কৈলাস বারুই—শ্রীমণীন্দ্র নাথ আশ।
১৮। কলকাতা কালচার—শ্রী বিনয় ঘোষ।
১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড)—শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০। প্রাচীন স্মৃতি—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাল।
২১। বাংলা অভিধান—সুবল চন্দ্র মিত্র।
*২২। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী—শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

—০—

কলের গাড়ীর আবির্ভাব।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখটী আমরা প্রতি বৎসর স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করে আসছি। শতাধিক বর্ষ পূর্বে আরও একটি ১৫ই আগষ্ট হুগলী জেলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসাবে দেখা দিয়েছিল। সেদিনটি ছিল সুদূর প্রসারী সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার সম্ভাবনায় সমুজ্বল।

বহু জল্পনা, কল্পনা এবং বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট সকাল ৮॥. টার সময় হাওড়া ষ্টেসন থেকে প্রথম বাষ্পীয় শকট যাত্রা ক'রে নিরাপদে হুগলী ষ্টেসনে পৌছেছিল। ২৩ মাইল পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট। প্রথম যে ইঞ্জিনটী এই পথে ধাবিত হয়েছিল তার নাম 'ফেয়ারী কুইন'। এই ইঞ্জিনটি বহুকাল যাবৎ হাওড়া ষ্টেসনে একটি বেদীর উপর রেলিং ঘেরা অবস্থায় স্মারক চিহ্ন হিসাবে স্থাপিত ছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনার আতঙ্ককে উপেক্ষা করে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা সেদিন শুধুমাত্র এক ব্যাপক পরিবহন ব্যবস্থার সূত্রপাত করেননি, জাতীয় ঐক্যের এক সুদৃঢ় বনিয়াদও রচনা করেছিলেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে উক্ত ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব না পেলেও 'বেঙ্গল হরকরা' এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' রেলওয়ে প্রবর্ত্তনকে স্মরণীয় বলে উল্লেখ করেছিলেন।

গবর্ণর জেনারেল স্বয়ং হাওড়া ষ্টেসনে উপস্থিত থেকে এই শুভ সুচনাকে অভিনন্দন জানান।

১৮৫৫ খৃঃ শ্রীকালিদাস মৈত্র মহাশয় শ্রীরামপুর তমোহর প্রেসে মুদ্রিত "বাষ্পীয় শকট ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক পুস্তকে রেলওয়ে স্থাপনের আদিপর্বের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন এবং রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও শহরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন।

কবিবর হেমচন্দ্র এই ঘটনাকে ইংরেজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে লিখেছিলেন :—

"শীঘ্র করি পরি লহ ছড়ি ঘড়ি তাজ।
কলিতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ॥"

প্রকৃত পক্ষে এই পুষ্পক রথ দেখার জন্যে রেলপথের দুধারে সেদিন অগণিত আবালবৃদ্ধ-বণিতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিল এবং অশ্রুতপূর্ব হুইসিল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যখন বাষ্পীয় ইঞ্জিন যাত্রীবাহী কামরাগুলো ঘণ্টায় প্রায় ১৫ মাইল বেগে চোখের সামনে দিয়ে সশব্দে চলে যায় তখন হরিধ্বনির সঙ্গে অনেকেই প্রণাম জানিয়েছিল—সেই অত্যাশ্চর্য লৌহদানব ও তার স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, রিষড়ার অধিবাসীরাও বাদ যান নি। লৌহবর্ত্মের উপর দিয়ে যে অতবড় রেলগাড়ী একটি মাত্র বাষ্পচালিত ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যেতে পারে এ অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তাদের পক্ষে বিস্ময়ে হতবাক এবং শ্রদ্ধায় অবনত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। পায়ে হেঁটে চলা, গোযানে চলা, পাল্কিতে চলা, নৌকায় চলা আর রেলপথে শতশত মানুষের একসঙ্গে প্রবলবেগে চলার মধ্যে যুগান্তকারী পার্থক্য বর্তমান।

এই অভূতপূর্ব ঘটনা দর্শনে কবিমনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার মধ্যে। তিনি লিখেছেন :—

"কি আশ্চর্য রেল রোড দেখ দেখ সবে।
ভারতে ভারতী তার কে শুনেছে কবে?
কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ,
ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'দিনের পথ॥
চমৎকার দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর পড়ে গিয়া দেখিতে দেখিতে॥
বসিয়া দাঁড়ায়ে চল পদ থাকে স্থির।
এত দ্রুত চলে তবু টলে না শরীর॥" ইত্যাদি

দীর্ঘ কবিতার মধ্যে তিনি এই রেলপথের সুযোগে ব্যবসায়ী. ছাত্র সমাজ, তীর্থযাত্রী প্রভৃতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

"ছত্রিশ জাতের লোককে পাশাপাশি বসতে হলে, জাতিধর্ম, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদির বিধানগুলো যে একেবারে গোল্লায় যায়। সুতরাং রেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব গেল, রেলে চারিটি শ্রেণী তৈরী হোক—মুসলমান, ব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য যাত্রীর জন্য। কিন্তু এই অদ্ভুত আবেদন শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে গেল। তাই বলে জাতিচ্যুত হবার ভয়ে রেল ভ্রমণ যে বন্ধ হলো তা নয়, বরং যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। জাতি-ভেদ প্রথার ওপর এই বোধহয় সবচেয়ে বড় আঘাত এল যদিও অতি নিঃশব্দে।" (জীবন যাত্রার নিত্য সঙ্গী রেল। আঃ বাঃ ১০/৪/৬৫)।

যাইহোক, রেলপথ খোলার সঙ্গে সঙ্গে গোযানে ও জলযানে ভ্রমণের অভ্যাস ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসে গেল গতির বেগ। সামাজিক জীবনে প্রগতির জোয়ার এসে আঘাত করল। কিন্তু এই রেলপথের সুযোগ সুবিধা পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে রিষড়াবাসীদের দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তার কারণ প্রথমে হাওড়া ও হুগলীর মধ্যে বালী, শ্রীরামপুর ও চন্দননগর ছাড়া অপর কোন ষ্টেসন ছিল না। ৺শিব চন্দ্র দেবের অখণ্ড যুক্তি এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কোন্নগর ষ্টেসন চালু হয়। সে এক স্মরণীয় দিন। এরপর থেকে রিষড়ার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা কোন্নগর ষ্টেসন দিয়ে এবং উত্তরাঞ্চল ও মাহেশের অধিবাসীরা শ্রীরামপুর ষ্টেশন দিয়ে যাতায়াত করতে থাকেন।

পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট দিয়েই তখন কোন্নগর ষ্টেসনে যাতায়াত চলত। মধ্যে পড়ত বাগখালের উপর একটা কাঠের পোল। এই রাস্তার অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। রাস্তার দুধারে ছিল বন জঙ্গল

আর আম কাঁঠাল ও বাঁশ বাগান। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে চলতে হত। কোন রকম আলোর ব্যবস্থা'ত ছিলই না তার উপর ছিল আবার অপদেবতার ভয়, কাজেই অন্ধকার রাতে এই পথ দিয়ে গমনাগমন যে কি রকম কষ্টসাধ্য এবং দুঃসাহসিক কাজ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এই পথেই পড়ত ৺কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ী, তারপর আর কোন লোক বসতি ছিল না। তাঁদের বাড়ী পর্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারলে লোকে তখন কিছুটা আশ্বস্ত ও নিরাপদ জ্ঞান করত। সে যুগে এই বাড়ীটার নাম হয়ে গিয়েছিল তাই 'হোপ হাউস'। তামাক খাওয়া চলত এই বাড়ীটা পর্যন্ত, হুকো কল্কে নিয়ে রেলে ভ্রমণ ছিল তখন নিষিদ্ধ। রেলের কামরার মধ্যে তামাক খাওয়ার উপায় ছিল না। কবে কোথায় একবার গাড়ীর ক্যাম্বিসের ছাদ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল তারই ফলে এই নিষেধাজ্ঞা। ইংরেজরা কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে পারতেন এবং গাড়ীর মধ্যেই কখন কখন ডুয়েল লড়তেন। এই বৈষম্যমূলক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে তাই ২০ শে জুন ১৮৫৭ "সংবাদ ভাস্কর" (৩০ সংখ্যা) পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল:—

"রেল রোড কোম্পানীরা আরোহীগণকে হুঁকা সহিত গাড়ী আরোহণ করিতে দেন না কিন্তু সাহেবরা গুলীপোরা পিস্তল সহিত বাষ্পীয় শকটে উঠিতে পারেন ইহা কি আশ্চর্য্য নয়।"

যাই হোক, গতিবেগ এবং সময়ানুবর্ত্তিতা এই দুটা ছিল সে যুগে রেলপথের আকর্ষণীয় বস্তু। গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটার জন্যে সরকারী বা সদাগরী অফিসে পৌঁছুতে প্রায়ই বিলম্ব হয়ে যেত। রাজা দীগম্বর মিত্রের জীবনীতে এই কথারই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়:—

"It is now twenty minutes journey from Konnagar to Calcutta by rail. But for years people had to come from there and return to it daily in swift sailing 'Pansways', that took away much of their time, interfered

with their punctual attendance at office, exposed them to 'Nor-westers' and obliged them on mornings of adverse tide to be content with cold rice cooked overnights".

বলা বাহুল্য, ট্রেনের সময় তালিকা অনুযায়ী গাড়ী ধরার জন্যেই তখন থেকে লোকে ঘড়ির ব্যবহারের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হতে থাকেন। পোষ্ট কার্ড সাইজের প্রথম টাইম টেবিল এক পয়সা মূল্যে বিক্রী হত। ইহার আলোক চিত্র হুগলী জেলার ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, প্লেট নং ৯১ দ্রষ্টব্য।

সে যুগে শ্রেণী অনুসারে গাড়ীর রং সাদা, লাল প্রভৃতি আলাদা আলাদা হত এবং তৃতীয় শ্রেণীতে কোনও ছাদ ছিলনা বা বসবার স্থানও নির্দ্ধারিত ছিল না, খোলা ও বেঞ্চহীন গাড়ীতে যাত্রীদের রৌদ্র বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে হত। এই ব্যবস্থা অবশ্য বেশীদিন ছিল না, এক বৎসর পরেই ছাদ ও বেঞ্চওয়ালা গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর যখন সন্ত্রাসবাদের আবির্ভাব হয় সেই সময় কলকাতার কাছাকাছি স্থানে চলন্ত ট্রেনে ইষ্টকাদি নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। শ্বেতাঙ্গ আরোহীরা সাধারণতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতেন কাজেই রেল কর্তৃপক্ষ ভাবলেন যে যদি সমস্ত কামরাই এক রংএর করা যায় তা হলে দূর থেকে শ্রেণী পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে না, এবং বিপ্লববাদীদের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এই কারণেই গাড়ীর বর্ণ বৈষম্য রহিত করা হয়। ১৮৭৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে হাওড়া থেকে মাস্থলী টিকিট বিক্রয় ব্যবস্থা চালু করা হয়। (রেলওয়ে সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ লেখকের রচিত প্রবন্ধ—'রিষড়া অঞ্চলে রেলওয়ে স্থাপনের গোড়ার কথা' দ্রষ্টব্য। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার স্মরণী পুস্তিকা-১৩৭৮)।

রেল লাইন স্থাপিত হওয়ার ফলেই রিষড়ার ভৌগোলিক সীমানা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ মোড়পুকুর অঞ্চল পূর্বাঞ্চল

থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল পৌর এলাকার পশ্চিম সীমানা রেলপথের পশ্চিম সীমানা বলেই নির্দ্ধারিত ছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য তার বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে।

সে যুগে এই রেলগাড়ী নিয়ে কত ছড়া ও দেশলাইএর বাক্সের গাড়ী তৈরী করে ছেলেদের খেলা ঘরের রেল গাড়ী তৈরী করা হত। রেলগাড়ীর শব্দের অনুকরণে 'দাদা কোথা, দিদি কোথা, দিদি গেছে কলকাতা' ইত্যাদি ছড়াটি ক্রমশঃ দ্রুত তালে উচ্চারণ করে গাড়ীর ক্রম বর্দ্ধমান গতিবেগের অনুকরণ করা হত।

"কু-ঝিক্-ঝিক্-রেললাইনে
ছুট্‌ছে রেলের গাড়ি।
ছোট্ট সোনা, মিষ্টি সোনা,
দিচ্ছ কোথায় পাড়ি?"

বিদ্যাসাগরী যুগ বা রেণেশাঁস

প্রকৃতপক্ষে রেলওয়ে স্থাপিত হবার পর থেকেই এতদঞ্চলে একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থার সূচনা হয়। একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের আন্দোলন—'বহু বিবাহ নিবারণ' বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভৃতি অপরদিকে ১৮৫৪।৫৫ খৃঃ তাঁর বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পুস্তক প্রণয়ন। সব মিলিয়ে তখন একটা ঘুম ভাঙার বা জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। "আর রাত্রি নাই, ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না।" এই কথাগুলো শিশু-পাঠ্য প্রথম ভাগে লেখা হলেও এযেন সে যুগের সকল স্তরের মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য। এই দু'খানা বই পড়ে অনেকেই তখন মোটামুটি বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

১৮৫৬ খৃঃ বিধবা বিবাহ আইন প্রচলিত হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে লাঞ্ছনা, গঞ্জনার সম্মুখীন হন তার ইয়ত্তা নেই। কত ছড়া ও গান রচিত হয়ে লোক মুখে মুখে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রিষড়ার অধিবাসীরাও সে আন্দোলন থেকে বাদ পড়েন নি। কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত লেখা হয়েছিল :—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥"

এই বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গেই কোন্নগরের দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, বিরোধী পক্ষ ভুক্ত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে একটা অপকলঙ্ক প্রচারিত হয়েছিল। সম্বাদ ভাস্কর, সংবাদ ২০ জানুয়ারী ১৮৫৭ (১১৯) সংখ্যা।

—"শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য। আমরা শুনিলাম উক্ত ভট্টাচার্য ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি শ্রীশচন্দ্র মহারাজের আদ্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণে গমন করিযাছিলেন। ইহাতেই প্রতিবাসীরা সকলে রব তুলিযা দিলেন. কলিকাতা নগরে বিধবা বিবাহ সভায সভা -শোভা করিয়াছেন, ফলে দীনবন্ধু বিধবা বিবাহ বন্ধু দিগের বন্ধু হন নাই, তথাচ না খাইযা 'কলা চোর' যাহা বলে ভট্টাচার্যের কপালে তাহাই ঘটিয়াছে, এহ বিপদে পড়িয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুরের সভায আসিযা আত্ম-নির্দ্দোষিতা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।" (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৩য় খণ্ড বিনয় ঘোষ)

শোনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময় রিষড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন কিন্তু গ্রামবাসীগণের অধিকাংশের প্রতিকূলতার ফলে রিষড়ায বালিকা বিদ্যালয স্থাপিত না হযে মাহেশে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল-১৮৫৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল তারিখে। প্রতিশ্রুত সরকারী সাহায্য না পাওয়ায বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্য এই সমস্ত বালিকা বিদ্যালয় এক বৎসর পরে তুলে দিতে বাধ্য হন।

দিকে ডিরোজিও শিষ্য শিবচন্দ্র দেব ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রিষড়ার বহু ছাত্র যাঁরা ইতিপূর্বে উত্তরপাড়ায় নৌকা যোগে যেতে বাধ্য হতেন, তাঁরা সকলে এই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন। পরবর্তী যুগের ছাত্রবৃন্দের ত' কথাই নেই। এই বিদ্যালয়টি যে রিষড়ার ছাত্র সমাজের পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক ও কল্যাণপ্রদ হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। উভয় গ্রামের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ ছাত্র সমাজের মাধ্যমেই গড়ে উঠে ছিল। এই নৈকট্য ও একাত্মতা পরবর্তী কালে বহু বাধা বিপত্তি সত্বেও সংযুক্ত রিষড়া—কোন্নগর পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়।

রিষড়ার বহু কৃতি সন্তান যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সে কথা তাঁদের জীবনী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে।

শিবচন্দ্র কেবলমাত্র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে ১৮৫৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারও স্থাপন করেন। তৎকালে এতদঞ্চলে অপর কোন পাঠাগার না থাকায় রিষড়ার জ্ঞানান্বেষী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই এই গ্রন্থাগারের সভ্য তালিকা-ভুক্ত হয়েছিলেন একথা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের প্রথম জুট মিল।

রেলরোড স্থাপিত হবার একটা বছর উত্তীর্ণ না হতে হতেই রিষড়ার উত্তর সীমানায় একটা বিরাট শিল্প পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। জর্জ অকল্যাণ্ড সাহেব গঙ্গাতীরবর্তী বহু গোয়ালাদের সম্পত্তি উচ্চমূল্যে কিনে নেন এই কারখানা স্থাপন উদ্দেশ্যে। গোয়ালারা জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে বর্তমান গোয়ালাপাড়া লেনে জমি কিনে বাস স্থাপন করতে বাধ্য হন। রাস্তার নাম হয়ে

যায় গোয়ালাপাড়া লেন বলে, তার সঙ্গে সঙ্গে বহু গাছপালা ও বাগানও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

অকল্যাণ্ড সাহেব ছিলেন সিংহলের কফি ব্যবসায়ী এবং লেজিস লেটিভ কাউন্সিলের সভ্য। নানা কারণে তাঁর কফী ব্যবসায় মন্দীভূত হওয়ার ফলে তিনি ভাগ্যান্বেষণে চলে আসেন কলকাতায় এবং সেখানে বেনিয়ান বিশ্বম্ভর সেনের সাহচর্য লাভ করেন। এতদঞ্চলে তখনকার হাতে বোনা চট তৈয়ারীর কুটির শিল্প দর্শন ক'রে তিনি যন্ত্রচালিত চটকল স্থাপনে উদ্যোগী হন এবং ডাণ্ডী থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করান।

বিশ্বম্ভর যোগালেন অর্থ আর অকল্যাণ্ড সাহেব দিলেন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর ব্যবসায়িক কর্ম কুশলতা। নামকরণ হল—Ichera Yarn Mills.

১৮৫৫ খৃঃ রিষড়ায় ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়ে গেল। খুলে গেল বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের পথ। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালী সন্তান খুঁজে পেলেন তাঁদের জীবিকা অর্জনের পথ। দেখতে দেখতে-বাংলার বাইরে থেকে ছুটে এল অবাঙালী শ্রমিকের দল। সামাজিক পরিবেশ এবং অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। ভেঙ্গে পড়ল কুটির শিল্প।

সুদূর প্রসারী এক বিবাট কর্ম-যজ্ঞের সূত্রপাত করে দিলেন বাঙালী বেনিয়ান এবং জর্জ অকল্যাণ্ড। যার অনুকরণে ভাগীরথীর উভয় কূলে গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক নূতন নূতন চটকল, বিদেশী পুঁজিপতিদের মূলধনে।

৺মুকুল গুপ্ত মহাশয় ১৮।১।১৯৪৮ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় এই জুট মিল সম্বন্ধে "First Jute Mill of India" শীর্ষক প্রবন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলন করেন তার কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত হল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ রিষড়া পৌরসভার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা পুস্তকে মূল প্রবন্ধটি পাঠ করে দেখতে পারেন।

"Aokland and Bysumber Sen formed a happy and fruitful combine. Ackland had the genius and Bysumber possessed the finanee. For whatever Ackland did Bysumber kept his purse-strings ungrudgingly open ··· The machinery began arriving from December, 1854 and the middle of 1855 the first Indian Jute Spinning Mill was erected at Rishra under the anxious but joyful eyes of those pioneers—Finlay, Johan, Andrew, Ackland, Charles, Fred and of course, Bysumber Sen. It was a proud day for Aokland and Sen, for their dream of starting machine jute spinning in India had come true."

মিল স্থাপনের পর দুটো বছর কাটতে না কাটতেই ১৮৫৭ সালে গঙ্গার অপর পারে ব্যারাকপুরে জ্বলে উঠেছিল মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন। সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। সীপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে যার বিবরণ ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে।

সৌভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়া ইয়ার্ন মিল যে বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল সে কথা মুকুন্দ গুপ্তের পূর্বোক্ত প্রবন্ধেও উল্লিখিত আছে :—

In 1857 the Mutiny broke out, it was just across the river at Barrackpore where troubles were brewing up. The Mutineers did not do any damage to the Mill."

কিন্তু অকল্যাণ্ড সাহেব নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেননি, তিনি কাঁটা তার দিয়ে কারখানাটি ঘিরে ফেলেছিলেন। বিশ্বম্ভর সেন কর্তৃক নিয়োজিত গাদা বন্দুকধারী দেশী সেপাইদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে কলকাতা সেলার্স হোম থেকে কিছু সিম্যান-

দের আনিয়ে মাজল লোডিং শটগান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন মিল পাহারায়। দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পাছে কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয় বিদ্রোহীরা।

ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে জুট মিল রক্ষা পেলেও রিষড়ার অধিবাসীদের অবস্থা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শাসনের যে কঠোর রুদ্ররূপ প্রকাশ পেয়েছিল সে কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাছাড়া সে সময়ে কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবকে নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে রিষড়ার সাধারণ লোকেরা পথে ঘাটে বড় একটা বাহির হতেন না বা কারও সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করতেন না।

ঘটনাটার সারমর্ম হল নিম্নরূপ :—

"১৮৫৭ খৃঃ মে মাসে শিবচন্দ্র একদিন রেলপথে কোন্নগর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে কয়েকজন ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আলাপ হয়। কথায় কথায় মিউটিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় দেশীয়দিগের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শান্ত স্বভাব শিবচন্দ্রের মুহূর্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং তিনি তর্কের মুখে অনবধানতা বশতঃ বলিলেন— "কেবল একপক্ষের দোষ দেখিলে চলিবে না, সিপাহীরা যখন ধর্ম্মমূলক কুসংস্কার বশতঃ দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে আপত্তি করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে ঐ কাজ করিতে বাধ্য করা গবর্ণমেন্টের অন্যায় ও অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল।"

উক্ত সাহেবগণ এই কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া লর্ড ক্যানিংএর হোম সেক্রেটারী বিডন সাহেবের নিকট শিবচন্দ্রের নামে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং হুগলীর জজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই অভিযোগের একজন প্রবল সমর্থক খাড়া করেন।

শিবচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব হইল। বহু লোকের প্রশংসাপত্রসহ তিনি আবেদন করেন এবং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলা হয়

যেন বারান্তরে এইরূপ অবিবেচনার কার্য্য না করেন, পদচ্যুতি, বা পদাবনতির আশঙ্কা দূরীভূত হইল।"

বলা বাহুল্য শিবচন্দ্রদেবের ন্যায় উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর পক্ষে যদি উক্ত প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে, তাহলে রিষড়ার তৎকালীন অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অধিবাসীদের মানসিক অবস্থার কথা এবং মৌনাবলম্বনের কারণ সহজেই অনুমেয়।

যাই হোক, জুট মিলটি (পুরাতন কল) যদিও সে যাত্রা বিদ্রোহী-দের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরবৎসর ইং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইচেরা ইয়ার্ণ মিলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে যন্ত্রপাতিসহ কাঁচামালপত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। জর্জ অকল্যাণ্ড তখন ছুটিতে লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন।

এই সংবাদে তিনি নিরুৎসাহ বা অবদমিত না হয়ে নূতন উদ্যমে সোৎসাহে বৃহত্তর মিল প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হন। অবশ্য বেনিয়ান বিশ্বম্ভর সেন এতদুপলক্ষে অর্থের যোগান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

(মুকুল গুপ্ত)

এইভাবে পাটকলের সম্প্রসারণের ফলে বহু অবাঙালী শ্রমিকের দল এসে জুটে গেল এবং তাদের বাসোপযোগী কুঠারী ঘর নির্মানের তাগিদে বাড়ীওয়ালা শ্রেণীরও সৃষ্টি হতে লাগল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের জন্যে বাজার ও নূতন নূতন বিপনীর আবশ্যকতাও দেখা দিল।

চটকল স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন গ্রামের প্রাচীন আদব কায়দা, শান্তশ্রী নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, তেমনিই আবার অর্দ্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অর্থ উপার্জ্জনেরও একটা প্রশস্ত পথ খুলে গেল। সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে প্রাচীন কৃষি সভ্যতার মধ্যে পরিবর্ত্তনের দোলা লাগল, গ্রামীন অখণ্ড সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগল, দেখা দিল ব্যক্তি প্রধান নাগরীক জীবন ও মনন। আরম্ভ হয়ে গেল নূতন শিক্ষা সংস্কৃতির গোড়াপত্তন।

যাইহোক, কালক্রমে উক্ত পাট কলের বহু পরিবর্তন, Ishera Co. Ltd. এবং Rishra Jute Mills Co. Ltd. প্রভৃতি নাম পরিবর্তনের পর এর মালিকানা স্বত্ব ১৮৮১ খৃঃ চাঁপদানী জুট কোং এর হাতে চলে যায় এবং তখন থেকেই এই মিলের নামাকরণ হয় 'ওয়েলিংটন জুট মিল।' এর পূর্বে অবশ্য Calcutta Twist Mill এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল।

জেমস ফিনলে এণ্ড কোং লিমিটেডের ১৭৫০-১৯৫০ এই দ্বিশত-বার্ষিকী স্মরণিকা পুস্তকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

In 1881 Wellington Jute Mill was acquired by the Champdany Jute Co, and this development was to add greatly to the importance of the branch in the jute trade, and also to the branche's agency remuneration.

Part of the land occupied by Wellington Mill was in the grounds of Warren Hasting's country seat and for a time the mill assistants lived tn the bunglow on the banks of the Hooghly. Gradually Wellington Mill was extended, many more looms being added In 1921, the registration of the Champdany Company was transfered to India."

(শ্রীগীতা নাথ দাসের সৌজন্যে)

এই মিলের পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল তখন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি। বর্তমানে ইউরোপীয় ওভারসিয়ার ও ম্যানেজার মহল যে সমস্ত সুখ সুবিধা এবং বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ও স্যানিটারী সুব্যবস্থা সংযুক্ত সুরম্য অট্টালিকায় বাস করছেন, এসব ছিল তখন অচিন্তানীয়। তৎকালীন এই সমস্ত অসুবিধার কথাও এই স্মরণিকা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীজের ১৯৫০ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রারম্ভিক যুগে এই মিলের স্পিনডেল (মাকু)

এর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮; ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে তার সংখ্যা ১৯০৭। ০৮ সালে দাঁড়ায় ৫৫৪৪ এ।

Name	Place	Year of Opening	Number of (1908) Looms	Number of (1908) Spindles	Average daily No of operatives	Outturn 1907-08
Welington	Rishra	1855	277	5,544	2,911	10,425 Tons.

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ওয়েলিংটন জুটমিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল মল্লিক মহাশয়দের বাগান বাড়ী, নাচঘর এবং তারই সম্মুখে জোড়া বাঘ মূর্ত্তি শোভিত স্নানের ঘাট। মিলের সম্প্রসারণ কালে ঐ সমস্ত সম্পত্তি জুটমিল কোম্পানী কিনে নেন এবং কালক্রমে উক্ত স্নানের ঘাটও বন্ধ করে দেন। বস্তির অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে ঐ স্নানের ঘাট ব্যবহার করার পর ১৯৩৫ খৃঃ সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মহকুমা অফিসে আবেদন নিবেদন করেন। ১৯৩৬ খৃঃ তদানীন্তন পৌর সভাপতি ৺নরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় একটা আপোষ মীমাংসা হয়।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে উক্ত ঘাটের চাঁদনী আজ ইষ্টক প্রাচীরে অবরুদ্ধ। বাঘের মূর্ত্তিগুলো বাকি চাঁদনীর ইষ্টক বেষ্টনীর মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ। মোট কথা ঐ ঘাটের স্মৃতি আছে কিন্তু অস্তিত্ব আজ অবলুপ্ত। পার্শ্ববর্ত্তী কাঁচা ঘাটেই এখন অনেকে স্নান করে থাকেন।

হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র মহাশয় লিখেছেন (৩য় খণ্ড) "পূর্বে ফিনলে কোম্পানীর ওয়েলিংটন জুটমিলের মধ্যে একটি গির্জা ছিল, কি কারণে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তাহা জানা যায় না। এখন উহার কোন অস্তিত্ব নাই। উক্ত গির্জার একটি চিত্র শ্রীরামপুরের শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে ছিল, পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার আলোক চিত্র এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় উল্লেখ যোগ্য যে এই মিল

স্থাপনের পূর্বে রিষড়ার যে আবগারী দোকান ছিল সেখানে কোন্নগরের অধিবাসীরাও কেনা কাটা করতেন, কিন্তু রিষড়ার লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোন্নগরে একটী স্বতন্ত্র আবগারী দোকান স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৫৩ খৃঃ ২৫ শে জুন শিবচন্দ্র দেব এই নূতন দোকান খোলার বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে লেখেন "পূর্বে কোন্নগর গ্রামে এক-খানিও মদের বা অন্য কোনও মাদক দ্রব্যের দোকান ছিল না। যে অল্প সংখ্যক লোক মাদক দ্রব্য সেবন করিত, তাহাদিগকে একমাইল দূরে রিষড়া গ্রামেব একখানি দোকানে যাইতে হইত। ...... মত্তাদির দোকানের প্রলোভনে পড়িয়া নেশাখোরের সংখ্যা বাড়িয়াছে। নেশাখোরেরা উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণামদর্শী হয়; তজ্জন্য তাহারা অযথা খরচপত্র করিয়া অনেক সময় অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা করে।"

তাঁর এই প্রতিবাদে অবশ্য সরকারী মহলে বিশেষ কিছু ফলোদয় হয়নি।

ওয়েলিংটন জুট মিল যেমন ভারতের প্রথম জুটমিল হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল, তেমনি আবার ১৯২২ খৃঃ এই মিলের মহিলা শ্রমিকরা ধর্মঘট করে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। ৬ই জুন ১৯২২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

১৮৭৯ খৃঃ শ্রীরামপুর পৌরসভার তদানীন্তন সভাপতি মি. আর, কারষ্টে-য়ার্সে'র আমলে রচিত রিষড়ার ম্যাপে উক্ত জুটমিল ও হেষ্টিংস মিলের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি তারিণীচরণ বোসের বাগান বলে লেখা আছে। ১৮৮৬ খৃঃ অঙ্কিত Hooghly River Survey Map (Rishra) এর মধ্যে উক্ত ভূভাগটি কয়েকটা পুকুর ডোবা ও জলা জঙ্গল ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কালক্রমে ঐ সমস্ত জমি চাঁপদানি জুট কোং কিনে নেন এবং ভরাট করে সুন্দর খেলার মাঠে রূপান্তরিত করেন।

ওয়েলিংটন পাটের কল। স্ত্রীলোকের ধর্মঘট।

"রিশড়ার ওয়েলিংটন পাটের কলের ৩০০ স্ত্রীলোক কুলি ধর্মঘট করিয়াছে। ভারতে স্ত্রীলোকে সমবেত হইয়া কর্মত্যাগ ও ধর্মঘট করা এই প্রথম।" (সংবাদ।)

উক্ত জুট মিলের স্থাপয়িতা জর্জ অকল্যাণ্ড সাহেব বাঙলা দেশেই মারা যান, রিষড়াতে তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। (ট্রেডইউনিয়ন, জ্যৈষ্ঠ-১৩৩৬। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন-গোপাল ঘোষ)।

শ্রীমণীন্দ্র আশের সংকলন—রিষড়া পৌর সভার সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা।

শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক উক্ত মিলের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাটি 'অক্‌ল্যাণ্ড রোড' নামে অভিহিত হয়।

দেশলাইএর প্রচলন।

রেলগাড়ী আর জুট মিল এতদঞ্চলে দুটোই হল নূতন, তার উপর আরও একটা নূতন জিনিষ সংযুক্ত হয়েছিল, সেটা হল দেশলাই।

আমদানি কৃত বিলাতিদ্রব্যের তালিকায় দেশলাই সংযুক্ত হওয়ার ফলে দৈনন্দিন ব্যক্তিজীবনে লোকে স্বস্তির আস্বাদ অনুভব করেছিল। বাস্তবিক, গন্ধকের শলাকা বা চক্‌মকি ঠুকে আগুন জ্বালান খুব সহজ সাধ্য ব্যপার ছিল না, তার স্থানে এক পয়সায় দুটো ছোট দিয়াশলাই পেয়ে লোকে হাতে স্বর্গ পেয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছামত যখন খুসী প্রদীপ জ্বালাতে, রান্নার কাজে আগুন ধরাতে দেশলাইয়ের আমদানিকে লোকে স্বাগত জানিয়েছিল। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দেশলাইএর গুণকীর্ত্তন ক'রে এক দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন, তার কয়েকছত্র হল :—

"নমামি বিলাতি অগ্নি দেশলাইরূপী,
দেহখানি চাঁচা ছোলা, শিরে বাঁধা টুপি।
যেমন ডেপুটীবাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড়—রাগে দেহ ভরা।
নমামি গন্ধকগন্ধ মুণ্ডটী গোলালো,
সর্ব জাতি প্রিয়দেব গৃহ কর আলো।
* * * * *
নমামি ফফর শব্দ নাসিকা-পীড়ন,
ধনীর নিকটে তুচ্ছ কাঙালের ধন। ইত্যাদি

সব জিনিষেরই যেমন দোষ-গুণ আছে তেমনি প্রথম দিকে এই দেশলাই জ্বালার ব্যাপারে অনভ্যাসের ফলে বিশেষ করে শিশুমহলে কিছু কিছু বিপত্তি দেখা দিয়েছিল। তাই ১৮৫৬ খৃঃ 'সম্বাদ ভাস্কর' নামক পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে দেশলাই বর্জনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান হয়েছিল (১৩৪ সংখ্যা, ২৬।২।১৮৫৬)

বিলাতীয় দেশলাই। "এই দিয়াশলাই হইতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ উপকার দেখা যায় বটে কিন্তু অনিষ্টই অধিক হয়, ... বিশেষতঃ চোরেরা দিয়াশলাই জ্বালিয়া ধনাপহরণের উপায় প্রাপ্ত হয় আর বালক বালিকারা দগ্ধ হইয়া মরে—বহুস্থলে এইরূপ হইয়াছে। অতএব চকমকি দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য এ প্রকার মারাত্মক ও সর্বনাশক বস্তু রাখাই উচিত নয়।"

বলা বাহুল্য, সম্পাদক মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্যের ফলে দেশলাইয়ের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছিল।

একে একে, বিলেত থেকে বহু জিনিষই আমদানি হতে থাকে, যেগুলো তখন এদেশে তৈরী করার কোন চেষ্টা বা যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হয় নি। তাই হিন্দুমেলায় মনোমোহন বসু আক্ষেপ করে গান বেঁধেছিলেন :—

"ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাটি—তাও আসে পোতে ;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ।

'কোন্নগর প্রকাশিকা' নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে বাঙালীদের মধ্যে প্রথম দেশলাই প্রস্তুত করেন কোন্নগর নিবাসী পূর্ণ চন্দ্র চন্দ্র ।

রায় বাহাদুর গোপাল চন্দ্র দাঁ

এই সময় অর্থাৎ রেনেশাঁসের যুগে যে কয়জন কৃতি সন্তান জন্ম গ্রহণ ক'রে এখানকার শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নে তাঁদের অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক ।

প্রথমেই গোপাল চন্দ্র দাঁর নাম উল্লেখযোগ্য । অনুমানিক ১৮৪০খৃঃ রিষড়ায় তাঁর জন্ম হয় । পিতার নাম বিশ্বম্ভর দাঁ । এঁরা তখন প্রায় সকলেই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকতেন, চাকরীর দিকে কেউ একটা বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন না । (বাণিজ্য রূপা বনিজাম্) গোপাল চন্দ্রই প্রথম সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন ।

১৮৫৪ খৃঃ পর্যন্ত রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মানের ভার ছিল মিলি-টারী বোর্ডের উপর, এরপর পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকেই উপরোক্ত কাজের ভার পড়ে পি, ডব্লিউ, ডি-র ওপর ।

যতদূর জানা যায়, তিনি এই বিভাগে প্রথম কার্য আরম্ভ করেন এবং এই সরকারী কার্যসূত্রে প্রায়ই বাইরে থাকতে বাধ্য হতেন । সুযোগ সুবিধা মত রিষড়ায় এসে পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু মহলে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন এবং রাধু নামে তাঁর বিশ্বস্ত ও কর্মঠ পরিচারক এবং দেহরক্ষীর সাহায্যে তিনি কেমন করে বহু

বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন সেই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী গল্প করে বলতেন। রিষড়ার তদানীন্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাঁর সুপরামর্শ এবং অর্থ সাহায্যের কথা বিদ্যালয়ের কার্য বিবরণীতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লিখিত আছে।

সরকারী কর্মজীবনে তিনি যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁর উত্তরোত্তর পদোন্নতির মধ্যেই পরিস্ফুট। তিনি কিছুদিন সেচ বিভাগেও কাজ করেছিলেন বলে জানা যায় এবং এই বিভাগের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'রায়সাহেব' উপাধি ভূষিত হন এবং পরে মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে লর্ড কার্জনের স্বাক্ষরিত 'রায়বাহাদুর' সনদ প্রাপ্ত হন।

বাংলা দেশের স্থানে স্থানে তাঁর তত্বাবধানে নির্মিত বহু রাস্তা ও ব্রীজ আজও বিদ্যমান। কথিত আছে ডায়মণ্ডহারবার রোডের নির্মাণ কার্যে তিনিই ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার। বর্দ্ধমান সহরে বাঁকা নদীর উপর নির্মিত সেতুর নির্মাতা হিসাবে তাঁর নাম একটি প্রস্তর ফলকে উল্লিখিত আছে বলে জানা যায়।

শ্রীরামপুর পৌরসভার আমলে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রিষড়ার জল নিকাশের সুব্যবস্থার জন্যে একটি পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী নক্সা তৈরী করে দেন।

ইং ১৯০০ খৃঃ (১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ) তিনি পান্নালাল, হীরালাল প্রভৃতি ছয় পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে রিষড়া পৌরসভা দাঁ-পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্ব রাস্তাটি 'গোপাল চন্দ্র দাঁ লেন' নামে অভিহিত করেন। (তাঁর প্রতিকৃতি গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য)

রায়সাহেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ৺গোপাল চন্দ্র দাঁর সমসামরিক। তাঁর পিতার নাম ছিল গঙ্গানারায়ণ এবং পূর্বোক্ত ১নং বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ সম্ভূত (পৃঃ ২৪৬)। তিনিও সরকারী কার্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা ও বারাকপুর গবর্ণমেন্ট হাউসের ওভারসিয়ার-ইন-চার্জ্জ বা গবর্নরের ষ্টুয়ার্ড। গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ গবর্ণর সাহেব যে কয়মাস বারাকপুরে থাকতেন সেই সময় তিনি প্রত্যহ রিষড়া থেকে নৌকাযোগে যাতায়াত করতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কাঠের আসবাব পত্র কিছু কিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি ও তৎকালীন সম্পাদক বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (৺পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) নূতন টেবিল, বেঞ্চ, চেয়ার প্রভৃতি দান করেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য।

তাঁর নির্লোভিতা এবং সততাও ছিল প্রশংসনীয়। একবার কোন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বিনা চালানে কয়েকটি মূল্যবান ধনরত্ন পূর্ণ বাক্স গবর্ণমেন্ট হাউসে এসেছিল। সেগুলি তিনি যথাযথ গবর্ণর সাহেবের নিকট সমর্পণ করেন। তাঁর এই সততায় সন্তুষ্ট হয়ে লাটসাহেব তাঁকে একটি মূল্যবান ঘড়ি উপহার দেন। সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খৃঃ তিনি 'রায়সাহেব' উপাধি ভূষিত হন। এই বৎসরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয় এবং এতদুপলক্ষে সর্বত্র এমনকি রিষড়াতেও সভা সমিতির মাধ্যমে ভারতেশ্বরী 'কুইন ভিক্টোরিয়ার' দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয়। বলা বাহুল্য তখন প্রায় প্রত্যেক গৃহেই তাঁর প্রতিকৃতি শোভা পেত।

রিষড়া ও মোড়পুকুর অঞ্চলে ভূসম্পত্তি ক্রয় করা ছাড়াও তিনি ৺কাশীধামে একটি বাড়ী ক্রয় করেন এবং ঐ স্থানে থাকা কালীন

ভারত বিখ্যাত সাধক ভাস্করানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৮১৭ শকাব্দে (১৩০২ বঙ্গাব্দে) তদীয় গুরুদেব কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'অনুভূতি বিবরণাদর্শের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এই কার্যের মাধ্যমে তাঁর ধর্মভাব, গুরুভক্তি এবং বঙ্গভাষায় বিশেষ অধিকার প্রমাণিত হয়। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী এবং কোন্নগর পাঠাগারে এই পুস্তক আজও বর্ত্তমান আছে। উহার আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ :—

অনুভূতি বিবরণাদর্শ

আনন্দ বনস্থ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

বিরচিত।

—O:O—

ঋষিড়া গ্রামনিবাসী

শ্রীঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত

ও চাঁপাতলা রাজচন্দ্র সেনের গলি

১৯/১ বাটী হইতে

প্রকাশিত।

১৮১৭ শক।

—...—

রায় সাহেব কুমুদ নাথ মুখোপাধ্যায়।

রায় সাহেব কুমুদ নাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে যান। সেই তথ্যের উপর নির্ভর ক'রেই তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

তৎকালীন প্রথানুযায়ী তাঁর জন্ম হয়েছিল মাকড়দহ গ্রামে মাতুলালয়ে,— ইং ১৫/১২/১৮৫০ (বাং ১২৫৭— ১৭৭২ শক)। পিতার নাম দিগম্বর এবং পিতামহের নাম কৃষ্ণ মোহন মুখোপাধ্যায়।

পাঁচ বৎসর বয়সে ১৮৫৫ খৃঃ তিনি পশ্চিমে (এলাহাবাদে) চলে যান। ঐ স্থানে তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই চাকরী করতেন।

মিউটিনীর সময় (১৮৫৭ খৃঃ) যখন তিনি তাঁর মাতা ও পরিচারিকার সঙ্গে গ্রামান্তরে গোযানে পলায়ন করছিলেন সেই সময় জেনারেল হ্যাবলক গিয়ে তাঁদের এবং অন্যান্য বাঙালীদের নানা-সাহেবের দলের হাত থেকে রক্ষা করেন। ঐ সময় তাঁর মণি বন্ধে যে সোনার বালা ছিল বিদ্রোহী সীপাহীরা তা কেটে নেবার জন্যে তরবারির আঘাত করে। পরিচারিকা ক্ষিপ্রহস্তে বালা দু'গাছা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান কিন্তু মণিবন্ধে তরবারির ক্ষতচিহ্ন আজীবন বিদ্যমান ছিল।

১৮৬৩ খৃঃ তদীয় পিতৃদেব তাঁকে মাতাঠাকুরাণীসহ পৈতৃক বাড়ীতে (পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীটে) রেখে পুনরায় পশ্চিমে চাকুরী স্থলে চলে যান।

ঐ সময় তিমি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ইতিপূর্বে তিমি ফার্সি ভাষা পড়েছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। (বিদ্যালয় শতবার্ষিকী পুস্তিকা।)

১৮৭১ খৃঃ রুড়কি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। অন্যান্য স্থানে পড়া শোনার পর ১৮৭৪ খৃঃ পাটনা থেকে সাবডেপুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে ভদ্রক মহাকুমায় সাবডেপুটি পদে প্রথম নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ খৃঃ পুরী জেলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর পদে উন্নীত হন এবং ঐ পদে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বহু স্থানে কার্য করেন। মধ্যে মধ্যে রংপুর ও হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পদেও

কার্য করেছিলেন, চাকুরী জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং সুবিবেচক।

১৯১০ সালে তিনি মিঃ বি, দের নিকট থেকে হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের চার্জ্জ গ্রহণ করেন এবং ঐ সালের ২৪ শে নভেম্বর তারিখে মিঃ জে, ল্যাং সাহেবকে চার্জ্জ দিয়ে ঐ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১২ খৃঃ ২৪ শে ডিসেম্বর তিনি মিঃ প্রেন্টিস্‌কে চার্জ্জ দিয়ে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১১ খৃঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আগমন সময়ে তিনি চুঁচুড়ায় স্বপদে অবস্থিত ছিলেন এবং সম্রাটের অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে জুনমাসে তিনি গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক রায়সাহেব উপাধি ভূষিত হন। (সনদের আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১৮৮১ খৃঃ তার প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন এবং ১৮৮৩ খৃঃ (বাং ১২৯০/২০ শে জ্যৈষ্ঠ) তাঁর একমাত্র পুত্র ললিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ।

রিষড়ায় তাঁর সদর বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের উপরে তাঁর চাকুরী জীবনে উপহার প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত একটি সুদৃশ্য পাল্কী ও ঢাল তরোয়াল টাঙ্গান থাকত। বাড়ীতে কিছুদিন দুর্গোৎসব হবার পর কোন এক পারিবারিক দুর্ঘটনার ফলে সে পূজা বন্ধ হয়ে যায়। তার পরিবর্ত্তে অন্নপূর্ণা পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত হয়। দোল যাত্রাও অনুষ্ঠিত হত গোলাপবাগের সামনের জমিতে। মোট কথা বহুধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি উপলক্ষে গণ্যমান্য অতিথি এবং আত্মীয় স্বজনের আগমনে বাড়ীটি তখন প্রায়ই কর্মচঞ্চল ও মুখরিত হয়ে থাকত।

শ্যামনগর লেনে (বর্ত্তমান শরৎচন্দ্র বসু লেন) গঙ্গাতীরবর্ত্তী

একটি দ্বিতলবাটী, (পাঁচু গোঁসাইএর ঠাকুর বাড়ী) তিনি ক্রয় করেন। ঐ বাটীর সম্মুখে গঙ্গাতীরে ১৩২৫ সালে আষাঢ় মাসে একটি পাকা ঘাট নির্মাণ করান। এই ঘাটের অব্যবহিত উত্তর দিকেই ছিল প্রাচীন পারঘাট ও তৎপার্শ্বে রিষড়ার প্রসিদ্ধ হাট।

১৯২৮ খৃঃ সামান্য অসুস্থতার পর পুনর্যাত্রার পরদিন ইং ৬।৭।২৮ তারিখে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৯২৩/২৪ সালেও তাঁকে কর্মঠ অবস্থায় রিষড়া এম, ই, স্কুলের কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে যোগদান করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে কার্য নির্বাহক সমিতি ৮/৭/২৮ তারিখের সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রিষড়া রেটপেয়ার্স এ্যাসোসিয়েসনের তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক।

শোনা যায়, তিনি অশ্বারোহণেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর নিরোগ স্বাস্থ্যের মূল কথা ছিল প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণ ও পরিমিত আহার। অবসর জীবনে তিনি অনাড়ম্বর বেশভূষার অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অপর দুই ভ্রাতার নাম ছিল হরিভূষণ ও চন্দ্রভূষণ।

যতদূর জানা যায়, এই প্রাচীন মুখোপাধ্যায় বংশ বহুস্থান ত্যাগ ক'রে রিষড়ায় আসার অব্যবহিত পূর্বে সুতানুটি বাগবাজারে বাস করতেন। রিষড়ায় আসার পর সেওড়াফুলির রাজাদের কাছ থেকে ব্রহ্মোত্তর হিসাবে বহু জায়গাজমি প্রপ্ত হন। ডানকুনি ষ্টেসনের পূর্বপার্শ্বে মনোহর পুর ছিল তার মধ্যে অন্যতম।

তাঁর মধ্যম ভ্রাতা হরিভূষণ সরকারী Irrigation Deptt-এ ওভারসিয়ার ছিলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে রিষড়া এম, ই, স্কুলে কিছুদিন হেডমাষ্টার ছিলেন (সম্ভবতঃ ১৯১০/১১ খৃঃ।) তাঁর একখানি ট্রাইসাইকেল ছিল, তিনি সেই তিনচাকার সাইকেল ক'রে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভূষণ ছিলেন এককথায় পুরুষ-সিংহ, তাঁর মত তেজস্বী এবং দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহধারী বাঙালীর সংখ্যা অতীব বিরল।

তিনি ছিলেন পাবলিক্ ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কেসিয়ার, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমনোজ মোহন পিতার গুণাবলীর কতকাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়াও রিষড়া বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ীগণের মধ্যে অপর দুই একজনের নাম উল্লেখ যোগ্য, যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী তাঁদের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বরাবর উল্লেখ করে গিয়েছেন:— (১৯২৬-২৭)

"The Rishra Boys' School was founded in the year 1857 by the late Babu Kali Kumar Dey, a distinguished and public-spirited resident of the village and is now in the seventy-first year of its existence. The girls' school was founded in the year 1870 by the Late Dr. Nil Madhab Mukherjee, a zealous advocate of female education. Since their establishment the two schools were successfully financed and managed by self-less and public spirited villagers prominent amongst whom were Late Babus Sridhar Gargari, Beharilal Mukherjee, Sivadas Banerjee, Kshetra Mohon Mukherjee, Late Rai Gopal Chandra Daw Bahadur, Babu Purna Chandra Daw, Late Dr. Kissori Lal Banerjee, and Rai Sahib Kumud Nath Mukherjee and Others."

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি-এল।

উপরোক্ত তালিকায় উল্লিখিত পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক

তিনি যে ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র এবং দেওয়ানজীদের জ্ঞাতি সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ২৭৭)। তাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৪৭/৪৮ খৃষ্টাব্দে।

ক্ষেত্রমোহন, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৮৬৫ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্র জীবনে তাঁর একটি কৃতিত্বের কথা 'কোন্নগর প্রকাশিকা' নামক পত্রিকায় উল্লিখিত আছে:— "উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় কোন্নগর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের যে ছাত্র প্রথম হইবে তাহাকে ৫্ মূল্যের পারিতোষিক দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন— ঐ প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রথম হইয়াছিলেন"। ১৮৬০ খৃঃ ৪র্থ শ্রেণীর পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দের তালিকায় ক্ষেত্রমোহনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। (কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মরণিকা)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, পাশ করার পর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় পাশ করেন এবং আলিপুর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। প্রতিভা ও যোগ্যতার ফলে তিনি অত্যল্প কালের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর উকিলরূপে পরিগণিত হন। আইন ব্যবসায়ের অজুহাতে তিনি তখন কালীঘাটে একটি বাসাবাড়ীতে বাস করতে বাধ্য হন। সপ্তাহান্তে প্রতি শনিবার তিনি রিষড়ার বাটীতে এসে উপস্থিত হতেন। কথিত আছে, এই সময় শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাবুরা জুড়ী গাড়ী ক'রে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন এবং বৈষয়িক ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বলা বাহুল্য যে এই উপলক্ষে মদ্য মাংসেরও সদ্ব্যবহার হত। তখন গ্রেমারা (তাসের বাজির খেলা) খেলাও চলত।

রবিবার তিনি রিষড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে গ্রামের উন্নতি মূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্য করতেন।

সোমবার সকালে তিনি আবার কর্মস্থলে ফিরে যেতেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ব্যক্তি রিষড়ার আজও বর্ত্তমান। দেওয়ানজী বাটীর সংলগ্ন ভূসম্পত্তি ক্ষেত্রমোহন ১৯০৩/৪ সালে ৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বিক্রয় করে দেন।

রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ফলে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য অস্থায়ী ভাবে কিছুদিন ক্ষেত্রমোহনের বহির্বাটীতে সম্পন্ন হত। ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐখান থেকেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ক্ষেত্র মোহনের বিবাহ হয়েছিল রিষড়ার পরপারে খড়দহ গ্রামে। তাঁর পুত্র হরিদাস মুখোপাধ্যায় খড়দহ অঞ্চলে মিলের কণ্ট্রাকটার ছিলেন এবং রিষড়ার ৺পরেশ চন্দ্র আশ (ওভারসিয়ার) তাঁর ইমারতি কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কালক্রমে তিনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় ১৯২০ খৃঃ রিষড়ার পৈতৃক বাটী ৺হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে (শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) বিক্রয় করতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে তাঁর বংশধরগণ খড়দহে বাস করছেন। পৌত্র মনোজ মোহন মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল খড়দহ পৌরসভার প্রধান করণিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক নাম ছিল রমাই বাবু, তিনি ঐ নামেই বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। যতদূর জানা যায়, এঁদের পূর্ব নিবাস ছিল বেহালায়। ইনি হলেন দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হলধরের দৌহিত্র। এঁর পিতার নাম ছিল শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রমাই বাবু ছিলেন সে যুগে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ দক্ষ। জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোথাও কোন আবেদন পত্র দাখিল করতে হলে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তার মুসাবিদা করে দিতেন। মোট কথা তাঁকে না দেখিয়ে বা তাঁর দ্বারা সংশোধন করিয়ে না নিলে সকলের মনঃপুত হত না। তিনি একাউটেন্ট জেনারেল, বেঙ্গল অফিসের সুপারিন্টেণ্ডের পদে চাকরী করতেন এবং শ্রীরামপুর পৌরসভার একজন সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন বলে কথিত হয়। তিনি বরাবর শ্রীরামপুর ষ্টেসন দিয়েই যাতায়াত করতেন; তাঁর জীবদ্দশায় বোধহয় রিষড়া ষ্টেসন স্থাপিত হয়ে উঠেনি।

দেশের প্রত্যেকটি উন্নতিমূলক কাজেই ছিল তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহযোগিতা, রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর দুই বিবাহ, প্রথম বিবাহ হয় ৺নবীনচন্দ্র পাকড়াশীর কন্যার সঙ্গে। এই পত্নীর সন্তান হলেন ৺বামন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র হলেন ৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা)

আঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীরামপুর পৌরসভা কর্তৃক তাঁর বাড়ীর পূর্বদিকে জি, টি, রোড থেকে বিশ্বম্ভর সেনের ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্ট্রীট নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে এই রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ভূভাগ হেষ্টিংস মিলের সম্পত্তিরূপে পরিবর্তিত হলেও পূর্বে এই রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে লাইনঘর ও কিছু কিছু অধিবাসীদের বসবাস ছিল।

এই রাস্তার মোড়েই ছিল ৺নবীন মল্লিকের জলপান ও মুদি-খানার দোকান, ৺পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে তিনি এই দোকান থেকে এগার আনা/বারো আনা সের দরে ভাল মটকির ঘি কিনেছেন।

ডাঃ কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের কার্য বিবরণীতে ডাঃ কিশোরীলালের নামও

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লিখিত আছে। ইনিও ছিলেন দেওয়ানজী বংশের দৌহিত্র সন্তান অর্থাৎ তু'নম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ সম্ভূত (পৃঃ ২৪৬)।

ছাত্রজীবনে তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং ১৮৬৬ সালে ১০, বৃত্তি লাভ করেন। (কোন্নগর প্রকাশিকা, ৪র্থ সংখ্যা)।

চিকিৎসা পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। কালক্রমে তিনি ই, বি,. রেলওয়ের চিফ্ মেডিক্যাল অফিসার পদে উন্নীত হন। কার্যোপলক্ষে রাজবাড়ী গ্রামে (বাংলাদেশ) থাকা কালীন তিনি ৺কালিকা দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে কথিত আছে। রিষড়ার শিক্ষাবিস্তার করে তাঁর অবদান পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে তিনি মাত্র ৫৫/৫৬ বৎসর বয়সে সুশীলকুমার, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছয় পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন।

এই বংশের ৺পিয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ, এ, ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি ১৮৬১ খৃঃ দশটাকা বৃত্তি লাভ করেন বলে জানা যায়।

উত্তর জীবনে তিনি আর, এম, এস ডাক বিভাগে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। রিষড়ায় রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপন উপলক্ষে তিনিও ছিলেন উদ্‌যোগীদের মধ্যে অন্যতম।

৺কিশোরীলালের দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে তিনি মিলিটারী বিভাগে কার্য করতেন তারপর স্বেচ্ছায় সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এর পরে ১৯৩১ সালে তিনি জে, এস, ল, নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (কলকাতা) ক্রয় করে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ খৃঃ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি স্বকৃত নূতন বাটীতে (ডাঃ পি, টি, লাহা ষ্ট্রীট) ৺শারদীয়া পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তাঁর পুত্রদের মধ্যে অনেকেই উক্ত ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীতারকদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় গ্রামাধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী মাতার বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নূতন পোষাক দিয়ে আসছেন।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলী।

রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষক ও পণ্ডিত মণ্ডলী বিদ্যায়তনের ছাত্রবৃন্দের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নবান ছিলেন এবং তাদের চরিত্র গঠনে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন সর্বজন-পূজ্য ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আনুমানিক ১৮৪০ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩/২৪ বৎসর বয়সে রিষড়ায় চলে আসেন, প্রথমে তিনি গড়গড়ী মহাশয়দিগের বাড়ীতে অবস্থিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আনুমানিক ১৮৬৯/৭০ খৃঃ তিনি বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত পদে যোগদান করেন।

দীর্ঘ ৫৪ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বংশানুক্রমে বহু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের নর্মাল পাশ সুপণ্ডিত এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বাংলা স্কুলের পণ্ডিতগণ শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার সমাধানে তাঁর পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতেন।

১৯২৩ সালে ১লা জুলাই থেকে তিনি শিক্ষকতা কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা কার্যের প্রশংসনীয় স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৲ দুইশত-টাকা গ্র্যাচুইটী প্রদান করেন।

অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাঁর ভূতপূর্ব ও তদানীন্তন ছাত্রবৃন্দ ১৩৩০ সালের ১৩ই শ্রাবন (ইং ২৯।৭।২৩) মুদ্রিত আকারে যে বিদায় অভিভাষণ প্রদান করেন তার মধ্যে তাঁর বহু গুণ কীর্ত্তন এবং আদর্শ

শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করা হয়। বিচ্ছেদ ব্যথায় অশীতিপর সৌম্য কান্তি ঋষিকল্প পণ্ডিত মহাশয়ের চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। ১৯২৫ খৃঃ ২৪ শে সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ১৯২৭ খৃঃ পল্লীবাসীগণের পক্ষ থেকে দেওয়ানজী ষ্ট্রীট ও নেতাজী সুভাষ রোডের সংযোগকারী নূতন রাস্তাটি তাঁর নামে অভিহিত করার প্রস্তাব পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত না হলেও, ২৬।৯।৫৯ তারিখে পৌর সদস্যবৃন্দ বাঙ্গুর পার্কের উত্তর দিকের প্রশস্ত রাস্তাটি তাঁর নামাঙ্কিত করায় পূর্ব-আক্ষেপ দূরীভূত হয়। (তাঁর প্রতিকৃতি গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য)।

তাঁর পূর্বে বঙ্গ বিদ্যালয়ের যিনি হেড পণ্ডিত ছিলেন তাঁর নাম ছিল শ্রীকান্তি চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি ১৮৬৪/৬৫ খৃষ্টাব্দে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। (কোন্নগর প্রকাশিকা)।

এই প্রসঙ্গে সেকেণ্ড পণ্ডিত ৺ভূতনাথ পাল মহাশয়ের নামও উল্লেখ যোগ্য। তিনিও দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিনের জন্যে ছুটী নেবার আবশ্যকতা বোধ করেন নি, সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও ওষুধের শিশি নিয়ে নিয়মিত কার্যে যোগদান করতেন। এইটি ছিল তাঁর কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল নিত্য ডালের মিছরী মুখে রাখা। সম্ভবতঃ এর জন্যেই তাঁর বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা রক্ষা হত।

বাংলা ব্যাকরণ ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। আদর্শ শিক্ষক হিসাবে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ কালে তদানীন্তন ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ ইঁহাকেও যথোপযুক্ত বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৯৩২ সালের মার্চ্চ মাসে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২০০ দুইশত টাকা গ্র্যাচুইটী হিসাবে প্রদান ক'রে তাঁকে সম্মানিত করেন।

২৬/৯/৫৯ তারিখের সভায় পৌরসদস্যবৃন্দ তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে বাঙ্গুর পার্কের পশ্চিম দিকস্থ রাস্তাটি ভূতনাথ পাল রোড হিসাবে নামাঙ্কিত করেন।

উপরোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের আমলেই বঙ্গবিদ্যালয় এম, ই, স্কুলরূপে (ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত) পরিণত হয়, এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অধিক সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন দেখা দেয়। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে ভুবন মোহন দাঁ (পরে নৃত্য লাল দাঁ) এবং গিরীশ চন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। ৺পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতি চারণায় লিখেছেন — "রিষড়ার ঘোষেদের কন্যা বিমলা বুড়ির যেখানে চালা ঘর ছিল সেই জমির খানিকটা বাগান ও জঙ্গল ছিল। ৺গিরীশ চন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী (রামচন্দ্রের পিতা) মহাশয় হুড়পাড়া থেকে এসে এইস্থানে বাস করেন। আমরা তাঁহার কাছে অ, আ, ক, খ, লিখিতে শিখিয়াছি। তিনি রিসিড়া ছাত্রবৃত্তি স্কুলের Last Pandit ছিলেন। দাগা বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার বজ্রমুষ্টির অনেক গাঁট্টার আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি।" ১৮৯১ খৃঃ নভেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিচরণ দীর্ঘাঙ্গী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টার ছিলেন পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ধর্মদাস দত্ত মহাশয়। তিনি ছাত্রদের ইংরাজী পড়াতেন। প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক' তখন প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত ছিল। দত্ত মহাশয়ের অন্যান্য অবদানের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৭০ খৃঃ ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন সেই বিদ্যালয়টি বঙ্গবিদ্যালয় ভবনের (আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য) দক্ষিণাংশে একটি লম্বা গ্যারেজ ঘরের মত হল ঘরে অনুষ্ঠিত হত। প্রারম্ভিক যুগে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় কারণ যদিও তখন স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সমালোচনা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু সর্বজন-সম্মত হয়ে উঠেনি। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষিত

স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিক্ষায়ও যথেষ্ট অন্তরায় ছিল।*

ইতিপূর্বে, মোড়পুকুরে গঙ্গানারায়ণ ঘোষ মহাশয় একটি বাংলা স্কুল বসিয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ১২৭০ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৬৪) ৪ঠা ফাল্গুন 'সোম প্রকাশের' ষষ্ঠ ভাগ ১ম সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:— "রিষড়ার পশ্চিমে মোড়-পুকুর গ্রামে শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ঘোষ বহুদিন হইতে একটি বাঙ্গলা স্কুল বসাইয়াছেন। দুটি বালিকা তথায় অধ্যয়ন করিতেছে। আমরা দুঃখিত হইলাম ঐ বিদ্যালয়ের ১ মাইল মধ্যে বিদ্যালয় আছে বলিয়া উড্রো সাহেব সাহায্য দিতে চাহেন না"

— হুগলী জেলার ইতিহাস — উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিষড়ার নিজস্ব ডাক্তার।

পূর্বে যে দুজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ২৭৪-২৭৭) তাঁদের কার্যক্ষেত্র ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই রিষড়ার অধিবাসীরা তখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত ছিলেন না। এই অভাব পূরণ হয়েছিল দু'জন পাশ করা চিকিৎসকের আবির্ভাবে। প্রথম হলেন ধর্মদাস হড় লেন নিবাসী (প্রাক্তন কালীকুমার দে লেন) ডাঃ দ্বারিকানাথ দাস। ইনি ১৮৬৩ খৃঃ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে (মেডিকেল কলেজ অফ্ বেঙ্গল) পাশ ক'রে কিছুদিন বাইরে সরকারী পদে নিযুক্ত

* ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পূর্বোক্ত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্বেও দেওয়ানজীদের পূজার দালানে, ৺অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের চণ্ডীমণ্ডপে এবং অন্যত্র অল্পসংখ্যক বালিকাদের সামান্য সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। (স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায় সম্বন্ধে লেখকের রচিত:— 'রিষড়া অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষার ক্রমবিকাশ' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার স্মরণিকা, শ্রাবণ—১৩৭৭)

হন। (সার্টিফিকেটের আলোক চিত্র দ্রষ্টব্য)

তাঁর আমলে দেশের নানা জায়গায় সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টায় কতকগুলো হাসপাতাল-ডিস্পেনসারী তৈরী হয়েছিল। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পরই ডাক্তারদের এইসব জায়গায় সাব এ্যাসিটান্ট সার্জেন হিসাবে নিয়োগ করা হত।

দ্বারিকানাথ ঐ রূপ কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় তিনি সরকারী কার্য ত্যাগ করে স্বগ্রামে এসে চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ঈশ্বর চন্দ্র দাস। ইঁহারা বংশানুক্রমে রিষড়ায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। পূর্বে অবশ্য আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা কার্য সম্পন্ন হত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ ক'রে শল্য চিকিৎসায় এঁদের বিশেষ হাতযশ ছিল। তাঁর পুত্র ডা: নিবারণ চন্দ্র দাসের শল্য চিকিৎসায় কৃতিত্বের কথা আজও অনেকেরই স্মরণে আছে। তাঁর অন্যান্য অবদানের কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। সে যুগে বিভিন্ন ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব জনিত ডাক্তারদের অসুবিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ: ২৮১)।

দ্বিতীয় চিকিৎসক হলেন পূর্বোক্ত শীল বংশের ডা: অমৃতলাল শীল। তিনিও ডাক্তারি পাশ ক'রে এসে রিষড়ায় চিকিৎসা কার্য আরম্ভ করেন। জি, টি,. রোডের উপর ঘোষেদের বাড়ীতে তাঁর ডিস্পেনসারী ছিল। তিনিও চিকিৎসা কার্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন বলে শোনা যায়। প্রসঙ্গত: উল্লেখ যোগ্য যে ওয়েলিংটন জুটমিল স্থাপিত হওয়ায় অবাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় চিকিৎসকের প্রয়োজন তখন বিশেষ ভাবেই অনুভূত হয়েছিল।

ডা: অমৃতলাল শীলের স্ত্রী ছিলেন আবার তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী একটু অধিক মাত্রায় শুচিবায়ু গ্রস্তা। ডা: শীলের সম্পত্তি ৺ব্রজমোহন আশ ক্রয় করেন বলে শোনা যায়।

১৮৭৩ খৃ: ৺স্বরূপ চন্দ্র লাহার পৌত্র আশুতোষ লাহা

মেডিকেল কলেজ থেকে এল, এম, এস পাশ করার পর বিলাত চলে যান। সেখানে তিনি খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করেন এবং একজন ইউ-রোপিয় মহিলার পানিগ্রহণ করেন বলে শোনা যায়। তিনি আই, এম; এস, পাশ ক বে স্বগ্রামে ফিবে এলে তৎকালীন সামাজিক প্রথানুযায়ী বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হন। এই সমস্ত কারণে তিনি পাটনায সরকারী হাসপাতালে চাকরী নিয়ে চলে যান এবং ক্রমে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন বলে কথিত হয়। ঐ স্থানেই তাঁর দুইপুত্র ও দুইকন্যা জন্মগ্রহণ করে।

শোনা যায়, আত্মীয়বর্গ গোপনে পুত্রদুটিকে রিষড়ায় নিয়ে চলে আসেন, কন্যাদুটি মাতার সান্নিধ্য হেতু পাটনাতেই থেকে যায়। রিষড়ায় আসা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। পরবর্ত্তী কালে এঁদের একজন নাকি চন্দননগরে কোনও এক হাসপাতালে চাকুরী গ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন সতীশ এবং কনিষ্ঠ হলেন ডাঃ জ্যোতিশ, ইনি এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরূপে বিশেষ পবিচিত ছিলেন। তিনি নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ী ক'রে রোগী দেখে বেড়াতেন। স্বগ্রামে নবীন চন্দ্র পাকড়াশী লেনস্থ দত্তবাড়ীতে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯২৪ খৃঃ ৪৮/৪৯ বৎসর বযসে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পুত্রদ্বয় ৺অনাদি নাথ লাহা ও ৺অমর নাথ লাহাও কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। উভয়েই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অমর নাথ অবশ্য শ্রীরাম-পুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের শিষ্যরূপে এ্যালো-প্যাথি চিকিৎসা করতেন।

প্রসঙ্গতঃ ডাঃ আশুতোষ লাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র লাহা মহাশয়ের নামও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি বি, এ, পাশ করার পর কলকাতা এ্যালবার্ট কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কার্যে ব্রতী থাকা কালীন পাটিগণিত ও বীজগণিতের

দুখানা স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৯০১ খৃ: "Arithmetic for Beginners এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহার আখ্যাপত্র ছিল নিম্নরূপ। শেষজীবনে তিনি ১৯১৫ খৃ: কয়েক মাসের জন্যে (১১-১১-১৫ থেকে ২৪-৩-১৫) রিষড়া এম, ই, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন।

ARITHMETIC FOR BEGINNERS.

With Numerous Examples.

By

SRIS CHANDRA LAHA, B. A.

Professor of Mathematics, Albert College,

Calcutta.

Second Edition.

1901.

— ... —

বিহারী লাল মুখোপাধ্যায়।

তিনি ছিলেন দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায়ের অনুজ রাম-মোহনের প্রপৌত্র এবং শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। আনুমানিক ১৮৩৯/৪০ খৃ: তাঁর জন্ম হয়।

উত্তরপাড়া স্কুলেই তাঁর শিক্ষার আরম্ভ। নৌকাযোগেই এই স্কুলে যেতে হত। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনের ভ্রাতা রাজমোহন ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বালী উত্তরপাড়ার বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজে ভর্তি হন কিন্তু সেই সময় তাঁর পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরীর অন্বেষণ করতে বাধ্য হন।

প্রথমে তিনি কালীকুমার দের (বক্সীর) সুপারিশ ক্রমে খড়দহ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হন কিন্তু প্রত্যহ গঙ্গা পারাপারের অসুবিধা হেতু সে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পুনরায় কালীবাবুর চেষ্টায় কলকাতায় তৎকালীন Comptroller of Post Office এ (বর্তমান জি, পিও) ক্লার্কের চাকুরী পেযে যান। কালক্রমে তিনি বাজেট ক্লার্কের পদে উন্নীত হন। কোন্নগরের তরফদার বংশের তিতু চন্দ্র তরফদারের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তিনি বরাবরই সচেষ্ট ছিলেন এবং কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে কার্য করেন। তাঁর পাঠানুরাগ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তর-পাড়া লাইব্রেরীর সভ্য ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৮৩ খৃঃ শ্রীরামপুর কলেজ সংলগ্ন কলিজিয়েট স্কুলটি অ-খৃষ্টান ছাত্রদের জন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাহেশ, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও বল্লভপুরের অধিবাসীগণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তায় মাহেশে ব্রজনাথ দের উদ্যান বাটীতে 'মাহেশ হাই ইংলিশ স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কালক্রমে এই বিদ্যালয়টি শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়ে 'শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউসন' নামে অভিহিত হয়।

উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনে অন্যান্য দেশবাসী সহ বিহারীবাবু সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেন এবং বিদ্যালয় কমিটির সভ্য তালিকা ভুক্ত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৮৪ খৃঃ শ্রীরামপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচনে তিনি ৩নং ওয়ার্ড থেকে (মাহেশ+রিষড়া) নির্বাচিত হন এবং ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত পরপর কয়েকটি নির্বাচনে জয়ী হয়ে পৌরসদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বরাবরই ছিলেন একজন প্রভাবশালী সদস্য এবং জল, ড্রেন ও রাস্তার-আলো সংক্রান্ত উপসমিতিগুলির সদস্য। ১৮৮৯ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ৫ নং সিদ্ধান্তটী ছিল নিম্নরূপ:—

"Resolved that a Sub-Committee, consisting of the Chairman, Vice-chairman, Dr. Barkar, Babu Biharilal Mukherjee, Babu Nandalal Gossain and Mr. Struth, be appointed to report upon the drainage scheme."

পৌর সদস্য হিসাবে তিনি রিষড়ার অধিবাসীদের সুখ সুবিধা বিধানে বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের ট্যাক্স মুকুব করার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। বর্ষাকালে পল্লীর বদ্ধ জল নিকাশের জন্যে তিনি নিজেই ছুটতেন পৌর শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে। এই সমস্ত কারণে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন।

যুগের প্রভাবে ভদ্র সমাজে তখন অল্প বিস্তর পান দোষ ছিল একটা অপরিহার্য অঙ্গ। তিনিও উক্ত দোষ দুষ্ট ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য।

১৯০৪ খৃঃ জ্যেষ্ঠপুত্র নিবারণ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হন এবং পর বৎসর (১৯০৫) তিনি ৬৪/৬৫ বৎসর বয়সে পাঁচ পুত্র রেখে পরলোক গমন করেন। ১৯২৭ খৃঃ ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের, সভায় রিষড়া-কোন্নগর পৌর সদস্যগণ দেওয়ানজী বাড়ীর পশ্চিমদিকের রাস্তাটি 'বিহারীলাল মুখার্জী লেন' নামে অভিহিত করেন।

জ্যেষ্ঠ নিবারণ চন্দ্র ছিলেন জি, পি, ওর ক্লার্ক : তাঁর পদোন্নতির মুখেই তিনি মৃত্যু কবলিত হন। কনিষ্ঠ প্রবোধ চন্দ্র ছিলেন শ্রীরামপুর পৌর সভার ক্লার্ক।

তৃতীয় পুত্র চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের ওভারসিয়ার ছিলেন। ইনি কিছুদিন রিষড়া এম, ই, স্কুলের পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন। ইঁহার প্রথম বিবাহ হয় রিষড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশের সন্তান (মাহেশে বসবাস কারী) ৺রসিকলাল চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত। দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছিল কলকাতা চোর বাগানে।

১৯২৪ খৃঃ তাঁর মৃত্যুতে এম, ই, স্কুলের পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ ৬ই জুলাই তারিখের সভায় শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ ৺চারু বাবুর শূন্য পদ পূরণের জন্যে ২৯-৩-২৫ তারিখে যে উপ-নির্বাচন হয় তাহাতে দেওয়ানজী বংশের সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায় কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপদে নির্বাচিত হন।

বিহারী বাবুর চতুর্থ পুত্র ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। শেষ জীবনে (১৯৩০ খৃঃ) তিনি কিছুদিন এম, ই, স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীট নিবাসী দেওয়ানজী বংশের দৌহিত্র-সন্তান বামা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে। নিত্য প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান ছিল তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য। ১৯৪৮ খৃঃ তাঁর রচিত স্মৃতিচারণা (পাণ্ডুলিপি) থেকে এই গ্রন্থ মধ্যে বহু উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

ইং ১০।৩।১৯৪৭ খৃঃ (বাং ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে) আনুমানিক ৭৫/৭৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুন্সেফ নিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাবে নিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ যোগ্য। তিনি ছিলেন রিষড়ায় আগমনকারী ষষ্ঠীতলা ষ্ট্রীটের ১ নং বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রাম দুলালের পুত্র রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং শিবচন্দ্রের পুত্র। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন রায় সাহেব কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী এবং উভয়েই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রগাঢ়।

১৮৯২ খৃঃ রিপন কলেজ থেকে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করার পর ১৮৯৪ খৃঃ ফার্ষ্ট গ্রেড মুন্সেফের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে চাকরী করা কালীন তিনি যে সময় 'দুমকায়' বদলী হয়েছিলেন

সেই সময় হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করায় ছুটি নিয়ে রিষড়ায় চলে আসেন। শোনা যায়, পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে কোন বিষাক্ত দ্রব্য পান ক'রে ফেলায় তাঁর মস্তিষ্ক বিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। উক্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় একমাত্র পুত্র মণিলালকে রেখে আনুমানিক ১৮৯৬/৯৭ খৃঃ তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁরও দুটি বিবাহ। শেষেরটি হয়েছিল মাহেশে। শোনা যায়, রিষড়ার কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর পুত্র মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন এম, ই, স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

হরিদাস গড়গড়ী, এম-এ।

রিষড়ায় জন্ম গ্রহণ করেও যাঁরা কর্মসূত্রে প্রবাসে থাকা কালীন মৃত্যুমুখে পতিত হন তাঁদের মধ্যে হরিদাস গড়গড়ী অন্যতম।

ইঁহার প্রপিতামহ নিমাইচরণ গড়গড়ী মহাশয় রিষড়ায় এসে-ছিলেন সম্ভবতঃ বর্গীর হাঙ্গামার শেষের দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে; সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তিনি ১৭১৬ শকাব্দে (ইং ১৭৯৪ খৃঃ) ২ রা আষাঢ় দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের বাড়ীর উত্তরপূর্ব কোণে পূর্বমুখী জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। স্থপতির নাম ছিল বোধহয় 'কন্দর্প দাস'। প্রতিষ্ঠা লিপির পাঠঃ— শকাব্দা ১৭১৬, সৌরাষাঢ়স্য দ্বিতীয় দিবসে ভৃগুবারে প্রতিষ্ঠিতঃ শ্রীনিমাইচরণ দেবশর্ম্মণা, স্থাপতিস্তু স্বা-কন্দর্প দাস।

শিবলিঙ্গ দুইটির বৈশিষ্ট্য হল—উত্তর দিকেরটি শ্বেত প্রস্তরের এবং দক্ষিণ দিকেরটা কৃষ্ণবর্ণ কষ্ঠি পাথরে নির্মিত। তিনি বৃহৎ আট-চালায় প্রথম দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন এবং তাঁর পুত্র গুরু প্রসাদের আমলে উক্ত পূজা বন্ধ হয়ে যায়। পৌত্র, রামদাস গড়গড়ী মহাশয়

(হরিদাসের কনিষ্ঠ সহোদর) ১৯১২ খৃঃ দুর্গাৎসব পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই পূজাটি ছিল সে যুগে বিশেষ আকর্ষনীয় এবং ঐতিহ্য-পূর্ণ। তাঁদের বহু ভূসম্পত্তি ছিল, জি, টি, রোডের পূর্বপার্শ্বের কিছু জমি হেষ্টিংস মিল স্থাপনের সময় বিক্রী হয়ে যায়। ঐ সমস্ত জমি জায়গার আয় উপস্বত্ব থেকে সাড়ম্বর পূজার ব্যয় নির্বাহ হতো বলে শোনা যায়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে আয় উপস্বত্ব লোপ পাওয়ায় প্রাচীন প্রথা হিসাবে এই দুর্গোৎসব কোনক্রমে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

হরিদাস গড়গড়ীর পিতা ৺শ্রীধর গড়গড়ী (ছিরুবাবু) ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী। তিনি নিজের বাড়ীতে পাঠশালা স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, পুত্র দু'টিকে উচ্চ শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেছিলেন। বঙ্গ বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে তাঁর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

জ্যেষ্ঠ হরিদাসের জন্ম হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। উচ্চ শিক্ষালাভের জন্যে তিনি কলকাতায় প্রেরিত হন এবং বহু বাজার ষ্ট্রীটে ভীমনাগের মিষ্টান্নের দোকানের পশ্চাতে প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাসের বাড়ীতে (বর্ত্তমান শ্রীনাথ লেন) থেকে তিনি লেখাপড়া করতেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ১৮৭৯ খৃঃ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সসম্মানে এম এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। (এডভোকেট এন, এল, দের কথা বাদ দিলে রিষড়ার অধিবাসীদের মধ্যে ইনিই প্রথম বি. এ, এবং এম, এ পাশ করেন)।

এরপর তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে [তখনকার জেনারেল এ্যাসেমব্লী] প্রায় তিন বৎসর অধ্যাপনা করার পর আগ্রা কলেজে অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্যে যোগদান করেন।

কলকাতায় থাকা কালীন তিনি সে যুগের ইয়ং বেঙ্গলের ভাব ধারায় কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে শোনা যায় এবং প্রত্যক্ষভাবে

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত না হলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। শোনা যায় কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের ভাগিনেয়ী শ্রীমতি সরলা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল কিন্তু উভয় পরিবারের ধর্মমতের পার্থক্য সে বিবাহে অন্তরায় সৃষ্টি করে। [মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের পত্রাবলী, পৃঃ ১৫৬]

পি, এম, সুর কোম্পানীর যত্নে এবং হরিদাস গড়গড়ীর সম্পাদনায় ১৮৮৫ খৃঃ 'ভারত-বাসী নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তৎকালীন 'সময়' ও 'সাঞ্জবনী' পত্রিকার সঙ্গেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন এবং ঐ পত্রিকাগুলিতে তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত বলে জানা যায়।

১৮৯৭ খৃঃ বিধবা পত্নী, দুই কন্যা ও এক মাত্র পুত্র নিশিকান্তকে রেখে তিনি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে আপ্রাতে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর বহুবিধ গুণাবলী এবং শিক্ষকতা কার্যে অপরিসীম পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করে এক দীর্ঘ শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তার অনুলিপি শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রেরণ করেন।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় তাঁর 'স্মৃতি রেখা' নামক পুস্তকে হরিদাস গড়গড়ী সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :—

"বহুবাজারের বাটীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ সম্পাদিত 'সময়' ও শ্রীযুক্ত হরিদাস গড়গড়ি সম্পাদিত 'ভারতবাসী' প্রকাশিত হইত।

রঙ্গমঞ্চের দুর্নীতি নিবারণ কল্পে (তখন) বিশেষ চেষ্টা হইত। জ্যেষ্ঠ সহোদর ও গড়গড়ি মহাশয় এ সম্বন্ধে 'সময় ও ভারতবাসী' পত্রে তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করিতেন। এসকল আন্দোলনের ফলে বেঙ্গল থিয়েটারে ভক্তিমূলক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও ষ্টার থিয়েটারে 'চৈতন্য লীলা', বুদ্ধদেব চরিত' প্রভৃতি নাটকের অবতারণা হয়।

লোকের মতিগতি ও প্রসক্তি ফিরিয়া যায়।

একটি নিভৃত বান্ধব সভার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র এটর্নী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার বাড়ীতে এক ক্ষুদ্র আলোচনা-গোষ্ঠী স্থাপন করেন……...।

এই বান্ধব সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন-গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস গড়গড়ি। তিনি পরে আগ্রা কলেজের অধ্যাপক হন; শুষ্ক অঙ্ক শাস্ত্র ও অর্থনীতি, সমাজনীতি আলোচনা করিয়াই তাঁহার পেট ভরিত না। তাঁহার মস্তিষ্ক যত বড়, হৃদয়ও তত বড় এবং 'পেটও' তত বড় ছিল। এই বান্ধব সভার শাখা রূপে তিনি এক 'ঔদারিক' সভা (Gastronomical society) স্থাপন করেন। সে সভায় উদর পরায়ণতার যথেষ্ট সমালোচনা ও সংসেবা হইত।'

গড়গড়ি মহাশয়ের ভোজন পটুতা সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। সে সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন রিষড়ার স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ উকিল (কোন্নগর) স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ঘোষাল।

দুঃখের বিষয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের রচিত বিখ্যাত পুস্তক 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' তে ৺হরিদাস গড়গড়ি মহাশয় সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি অবশ্য "আগ্রা বিভাগ" (প্রথম ভাগ পৃঃ ২১১) প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে—'আগ্রার গভর্নমেণ্ট এবং মিশনারী কলেজের অধ্যাপকতা সূত্রে এখনে এপর্য্যন্ত অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালীই প্রবাস করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন।'

রামদাস গড়গড়ী, বি-এ।

হরিদাস গড়গড়ীর অনুজ রামদাস গড়গড়ীর জন্ম হয় ১৮৫৭ খৃঃ। তিনি ১৮৮১ খৃঃ বি, এ পাশ করার পর সরকারী কার্যে যোগদান করেন।

এবং কার্যদক্ষতার ফলে উচ্চপদে উন্নীত হন। এই কার্য উপলক্ষে গ্রীষ্মকালে সিমলা, দার্জ্জিলিং অঞ্চলে লাটসাহেবের দপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উক্ত স্থানে বাস করতে বাধ্য হতেন। তিনি তদীয় বংশের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসব পুনঃ প্রবর্ত্তন কালে তিনদিনই বহু আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হতেন এবং মায়ের অন্ন ও পরমান্নভোগ এবং মহাপ্রসাদ প্রভৃতি ভোজনে তৃপ্তি লাভ করতেন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী গরীব দুঃখীদের মুড়ি মুড়কি বিতরণের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। এই দুর্গোৎসব উপলক্ষে যাত্রা, কথকতাও অনুষ্ঠিত হত। তখন যাত্রা চলত প্রায় সারারাত্রি ব্যাপী। যাত্রার দলের দু'একখানা গান এত প্রাণস্পর্শী হত যে অনেকেই মুখস্থ ক'রে ফেলত এবং সময় বিশেষে নিজের মনেই গেয়ে উঠত। একটা প্রসিদ্ধ গান ছিল নিম্নরূপ :—

"তাই ভাবি গো মনে   বিনে নিমন্ত্রনে
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলনা।
তোমরা সবাই যাবে   সমান আদর পাবে
আমি গেলে পিতে কথা কবে না। ইত্যাদি।

ভাষার লালিত্য যত থাক বা না থাক, সময়োপযোগী রাগ রাগিনী এবং গায়কের কণ্ঠস্বরের গুণে এক একখানা গান শ্রোতাদের অন্তর এমন ভাবেই স্পর্শ করত যে সে গুলো প্রায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত।

রাসদাস গড়গড়ী মহাশয় কিছুদিন (১৯১৮-২০ খৃঃ) রিষড়া-কোন্নগর পৌরসভার সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি রাস্তাগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ততর করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেন এবং খাসমহল বস্তির নোংরা জল যাতে চুনরী পুষ্পরিণীর ভিতর দিয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন।

দীর্ঘকাল পেনসন্ ভোগ করার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি গোপাল, নৃত্য গোপাল, ব্রজগোপাল, বসন্তকুমার প্রভৃতি ছয় পুত্র রেখে দার্জ্জিলিংএ পরলোক গমন করেন।

২৬।৯।৫৯ তারিখের সভায় রিষড়া পৌরসদস্যগণ তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বাঙ্গুর কলোনীর একটি রাস্তা রামদাস গড়গড়ী রোড বলে নামাঙ্কিত করেন।

এই প্রসঙ্গে রিষড়ার ভট্টাচার্য বংশের কন্যা এক বিদুষী মহিলার নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বদন চন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা এবং মোক্তার গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা ভগিনী—কুসুম কুমারী দেবী। তাঁর জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।

অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর নিবাসী মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়রা ছিলেন পাঁচ সহোদর। কনিষ্ঠ পীতাম্বরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল উক্ত কুশুম কুমারীর। সেই সম্পর্কে তিনি হলেন শরৎচন্দ্রের ছোট দিদিমা। তাঁরও মনীন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি পাঁচ সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

সাহিত্যিক সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, কিন্তু দুজনের মধ্যে ছিল অত্যন্ত ভালবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক। নিজের মামার চেয়েও সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন অধিক স্নেহ প্রবণ।

সুরেন্দ্র নাথ যখনই রিষড়ার মাতুলালয়ে (ভট্টাচার্য বাড়ী) আসতেন তখনই তাঁর মাতাঠাকুরাণীর কথা বলতে অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন, এমনকি বালীগঞ্জ নিবাসী তাঁর বন্ধুস্থানীয় শ্রীযুক্ত ললিত কুমার পাকড়াশীকেও কথাচ্ছলে তাঁর নিজের এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূলে তাঁর মাতাঠাকুরাণীর কথা বলতে ভোলেন নি। তিনি বলতেন তাঁর মার শিক্ষাদীক্ষা বলতে বোঝাত 'রিষড়া কালচার'।

এ সম্বন্ধে শ্রী যামিনী কান্ত সোম তাঁর "ছোট্ট শরৎ" নামক পুস্তকে যে কথা লিখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ঃ—

"শরতের ছোট দিদিমা ছিলেন অন্য সকলের চেয়ে শিক্ষিতা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে পড়ার (বই) প্রাইজ দিয়েছিলেন, এইটে ছিল তার গর্বের কথা। তাঁর ঘরখানি ছিল খুব আকর্ষণের বস্তু। তাঁর ঘরের ভেতর দুপুর বেলাতে ছেলেমেয়েদের মস্ত ভিড় লেগে যেতো। দিদিমা এদের 'বর্ণ পরিচয়' আর 'বোধোদয়' থেকে আরম্ভ করতেন আর শেষ করতেন রৈবতক, কুরুক্ষেত্রে গিয়ে। খুব চমৎকার পাঠ করতেন দিদিমা, আর ছেলেদের পড়ে শোনাতেন 'মেঘনাথ বধ', 'বীরাঙ্গনা', 'নীলদর্পণ'—এইসব। শরৎ হাজির থাকতেন সেখানে সব সময়, আর খুব আগ্রহ করে শুনতেন দিদিমার পড়া, মনে হয়, এই দিদিমার সাহিত্য সভা থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যৎ মনের অনেক কিছু খোরাক পেয়েছিলেন।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মোক্তার গোপালচন্দ্রের পুত্র শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ভট্টাচার্যের বাল্য জীবনের কয়েকটা বছর অতিবাহিত হয়েছিল ভাগলপুরে তার পিসীমা কুসুম কুমারী দেবীর সান্নিধ্যে।

রায়বাহাদুর কালীচরণ পাকড়াশী, বি, এস, সি, এফ, সি, এস (লণ্ডন)।

কালীচরণ পাকড়াশী যদিও রিষড়ার সন্তান কিন্তু তাঁর জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে চোখের আড়ালে-প্রবাসে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। পিতার নাম রামলাল পাকড়াশী আর পিতামহ ছিলেন ৺নবীনচন্দ্র পাকড়াশী, যাঁর নামাঙ্কিত রাস্তার ধারেই ছিল তাঁদের প্রাচীন আবসভূমি। তিনি ছিলেন এই বংশের রত্নস্বরূপ।

প্রথমে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করার পর তিনি চলে যান দক্ষিণেশ্বরে মাতুলালয়ে এবং কামারহাটি সাগর দত্ত স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ১৯১৫ সালে বি, এস, সি, পাশ করার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

সময় ইছাপুর 'মেটাল এণ্ড ষ্টীল' ফ্যাক্টরীতে যোগদান করেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত কলকাতায় গবর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে চাকরী করার পর তিনি ভারতীয় ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের 'এ্যাসিট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার অব্ পারচেজ' পদে উন্নীত হন এবং ঐ পদে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দিল্লী, সিমলা, কলকাতা, বোম্বে, করাচি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বদলি হন। কলকাতায় থাকা কালীন রিষড়ার সঙ্গে তাঁর সংযোগ এবং সহপাঠী ও বাল্য বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল অক্ষুণ্ণ। তারপর থেকেই তিনি চলে যান চোখের অড়ালে, প্রবাসী বাঙালী হিসাবে।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্রথমে হলেন ভারত সরকারের 'কণ্ট্রোলার অব্ পারচেজ' আর তার পরেই 'কণ্ট্রোলার অব্ সাপ্লাইজ'। এই পদ থেকেই তিনি ১৯৪৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। প্রশংসনীয় কর্মপ্রতিভা এবং বহুবিধ গুণাবলীর স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'জুবিলী করনেশন' পদক প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধি ভূষিত হন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বোম্বে পার্শি কলোনীতে (দাদার) স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন এবং সেখানকার বাঙলা স্কুল ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি মূলক কার্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোম্বেতেই গত ১০ই মার্চ্চ ১৯৭৪ তারিখে ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অপর দুইভ্রাতা—শ্রীকানাইলাল ও যতীন্দ্র নাথ পাকড়াশী দক্ষিণেশ্বরেই বসবাস করছেন।

পূর্বোক্ত ৺নবীনচন্দ্র পাকড়াশীর চন্দ্রনাথ, বিনোদ বিহারী, রামলাল প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৺চন্দ্রনাথ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ ভাগবত পাঠক। কলকাতাও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি তৎকালে ভাগবত পাঠ করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তদীয় পুত্র ৺সাধনচন্দ্র পাকড়াশী কর্তৃক প্রদত্ত জমির উপর বর্ত্তমান চন্দ্রনাথ শিশু ভারতী (প্রাক্তন

শিশুভারতী) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

রিষড়া খাসমহল।

রিষড়ার প্রাচীন অধিবাসীদের অনেকের মুখেই শোনা যায় যে রিষড়ায় সেনা নিবাস স্থাপন উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃত জমি ক্রয় করার নোটীশ দেওয়া হয়। গোরারা ঘরের পাশে বাস করলে স্থানীয় অধিবাসীরা যে স্ত্রী কন্যা নিয়ে নির্ভয়ে এখানে বসবাস করতে পারবেন না এই অজুহাতে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয় এবং বিভাগীয় অফিসার যখন সারেজমিনে তদন্তে আসেন সেই সময় ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকলেই হাত নেড়ে তাঁদের আপত্তি জ্ঞাপন করেন। এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে ১৭৭২ খৃঃ চানকে 'ব্যারাক' বা সেনা নিবাস স্থাপিত হওয়ার ফলে ঐ স্থানের বহু অধিবাসী বাস্তুচ্যুত হন। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেবের জীবনীতে তাঁদের বংশের কোন্নগরে বসবাস স্থাপনের কারণ স্বরূপ উক্ত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত দুটি তথ্য প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করবে বলে মনে হয়:—

Sashti Ch. Daw & ors–vs–Birkmyre Bros. সেটেলমেণ্ট মোকদ্দমায় বিচারকের মতামতের কিয়দংশ হল নিম্নরূপ

"It appears that Govt. under proceedings of Land Acquisition Act, acquired a considerable area in 1868 within which the disputed lands are situated. These lands were originally acquired for the purpose of the East India Railway. The land was subsequenly made over to Government as it was not reguired for the purpose for which it had

been acquired. Then it was made a khasmahal with T. N. 4021."

Sd/Illegible.

Asstt. Settlement officer, 1934'

লেখকের পিতা ৺নিবারণ চন্দ্র পাকড়াশীর নামীয় ১৮৬৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখের ৩২ নং নোটীশে জমি অধিগ্রহণের প্রকৃত কারণ জানতে পারা যায়। নোটীশের মর্ম ছিল নিম্নরূপ :—

"এত্তলানমা কাছারি ইস্টীমিসন কমিসনার মোত্তালেক রেলওয়ে কোমিশনারি বৈঠক শ্রীযুত মেঃ ইঃ ভিঃ নকট সাহেব কমিসনার বনাম শ্রী নিবারণ চন্দ্র পাকড়াশী—

যে হেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মোকাম ও রিসড়া ও শ্যামনগর ও মাহেশ ডক কলের গাড়ী থাকিবার ঘর নির্ম্মানার্থে গভর্নমেণ্টকর্ত্তৃক যে সমস্ত ভূমি গ্রহণ হইবেক তাহার মধ্যে কিয়দাংশ মৌজা রিষড়া-স্থিত বামপার্শের লিখীত জমি ও আওলাত জরিপ আমলে আসিয়াছে একারণ এই বিজ্ঞাপন দেওা জাইতেছে যে স্বয়ং বা মোক্তারের দ্বারা আগামী ৩ জানোয়ারি দিবস শ্রীরামপুর মোকামে অস্মদের সমিপে উপস্থিত হইয়া উক্ত জমি ও সম্পত্তিতে যে প্রকারের যে সত্ব থাকে তাহার ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তোমার জত টাকা ও জে প্রকারের দাওা থাকে তদ্বিস্তারিত জ্ঞাত করাইবা ইতি ১৮৬৭ সাল ১৯ ডিসেম্বর।"

পূর্বেই উল্লখ করা হয়েছে যে উক্ত বিস্তৃত ভূভাগ (৫৭৫ বিঘা) যে কারণে ক্রয় করা হয় তার প্রয়োজন না হওয়ায় গভর্নমেণ্ট খাস মহল রূপে পরিগণিত হয় এবং পরে ইজারা বিলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

"The Joint Secy of the Rly. Branch, P. W. D. in a letter dated the 24th April 1868 to the Secretary of the Board of Revenue directed that the lands should be leased

out from year to year to the best advantage." A lease for one year was accordingly granted to Basir Ali & Khan Mia of Calcutta at an annual rental of Rs, 500/for 575 Bighas of land on condition among others that they should give up the land if. required by Govt."

একটি সংবাদ।

এই প্রসঙ্গে একটি সংবাদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"গত বুধবার প্রাতে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল কয়েকটি সঙ্গী সমভি-ব্যাহারে একখানি (এস্পেস্যাল) অতিরিক্ত ট্রেনে মাহেশ গিয়াছিলেন, রিসড়া ও শ্রীরামপুরও দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শুনা গেল রিসড়া ও মাহেশের মধ্যস্থলে একটি উত্তম গবর্নমেণ্ট উদ্যান করা উদ্দেশ্য, তদর্থ ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে।" (ভারত সংস্কারক—৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)

রিষড়ার লোক সংখ্যা।

স্যার জর্জ ক্যাম্বেল ছিলেন বাংলার লেপ্টেনান্ট গবর্ণর (১৮৭১-৭৪)। তাঁর আমলেই ১৮৭২ খৃঃ হুগলী জেলার প্রথম লোক গণনা করা হয়েছিল। এই সময় রিষড়ায় লোক সংখ্যা কত ছিল তা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না, তার কারণ রিষড়া ছিল তখন মাহেশের সংগে সংযুক্তভাবে শ্রীরামপুর পৌর সভার ৩নং ওয়ার্ড-ভুক্ত। শ্রীরামপুর পৌর সভার মোট জনসংখ্যা ছিল ২৭,৫২০ (৪টি ওয়ার্ডের সমষ্টি)। এর মধ্যে মূল শ্রীরামপুর ওয়ার্ডে তখন জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল সর্বাধিক। (১৮৮৪/৮৫ খৃঃ বার্ষিক কার্য বিবরণী) কাজেই রিষড়ার জনসংখ্যা আনুমানিক ৫/৬ হাজারের অধিক ছিল না। ১৮৭৫ খৃঃ হেষ্টিংস জুট মিল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রাকৃতিক তাণ্ডব ও দুর্ভিক্ষ

ঝড়ে রিষড়ার ক্ষয়ক্ষতির কথা ইতিপূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ১৮৬৪ খৃ: ৫ই অক্টোবর (২০শে আশ্বিন ১২৭১, শুক্লা পঞ্চমী) যে সর্ব-বিধ্বংসী ঝড় হয়েছিল তার তুলনা হয় না। এই ঝড়ই এতদঞ্চলে কুখ্যাত 'বড় আশ্বিনের ঝড়' বলে পরিচিত। এর ফলে যে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবন ও সম্পত্তির হানি হয়েছিল তার হিসাব করা অসম্ভব। কত বড় বড় বট ও অশ্বথ গাছ সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল তার ইয়ত্বা নেই। হুগলী, শ্রীরামপুর, কালনা, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে এই ঝড়ের গতিবেগ অত্যধিক অনুভূত হয়েছিল। শোনা যায়, গঙ্গায় ভাসমান বহু নৌকা নঙ্গর ছিঁড়ে বহু দূরে নিক্ষেপিত হয়েছিল এবং নৌকা ডুবিতে বহু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী এবং জীবনহানি সংঘটিত হয়েছিল।

বাহাত্তুরে মন্বন্তর

ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার পরে একটা- বছর কাটতে না কাটতেই এতদঞ্চলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে নিদারুণ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই দুর্ভিক্ষ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বা বাহাত্তুরে মন্বন্তর বলে পরিচিত। গত ১৩৫০ সালের 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' সময় প্রাচীনদের মুখে উক্ত মন্বন্তরের কথা আলোচনা করতে শোনা গিয়েছিল। ঘটি বাটি বিক্রয় করেও লোকে অন্ন সংস্থান করতে পারেননি। উত্তরপাড়া এবং শ্রীরামপুরে স্থানীয় অধিবাসীরা চাঁদা তুলে অন্নসত্র খুলেছিলেন বটে কিন্তু তার দ্বারা অনাহারে মৃত্যু সম্পূর্ণ রোধ করা যায় নি। "চাল ডাল ক্রমেই হতেছে অগ্নিমূল। ছোটবড় সব ঘরে হল অপ্রতুল ॥··· ··· জননী মমতাহীন সন্তানে বেচিছে। জঠর জ্বালায় কত অনর্থ করিছে ॥'

হুগলী জেলার ইতিহাস-পৃঃ ১৩৪৪ ।

"At Uttarpara and Serampore also measures were organised by several Indian gentlemen for supplying food, clothing and medical assistance to the indigent, without assistance from the Govt. A relief hospital was opened in Hooghly and a temporary pauper hospital at Uttarpara."

Dist. Gazetteer-L. S. S. O'mally.

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ।

উপরোক্ত কুখ্যাত আশ্বিনে ঝড় ও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে দেখা দিয়েছিল—'বর্দ্ধমানজ্বর' বা ম্যালেরিয়া।

হুগলী জেলার এই রোগের প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। তারপর থেকে বছরের পর বছর এই রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এমন কোন বাড়ী ছিল কিনা সন্দেহ যেখানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঘটেনি বা এই রোগে কোন জীবন হানি হয়নি।

১৮৬৪ খৃঃ এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য কোন্নগরের রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় এই ব্যাধির কারণ আবিষ্কার করে বলেন যে, সরকার যত্রতত্র রাস্তা, বাঁধ ও রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করায় জল-নিকাশের বিঘ্ন উৎপন্ন হয় এবং তার ফলে যে সমস্ত ভূভাগ অধিকতর আর্দ্র সেই সকল স্থানেই এই মহামারী আরম্ভ হয়।

কারণ যাই হোক, ১৮৭২ খৃঃ থেকে ১৮৮১ খৃঃ মধ্যে উক্ত জ্বর মহামারীরূপে দেখা দেয়, যার ফলে হুগলী জেলার লোক সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১৩ জন কমে যায়।

উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী-লেখক শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় এতদঞ্চলের তৎকালীন যে চিত্র

অঙ্কিত করেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য :— "মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিলে দুঃখ হয়, উদর স্থূল, কণ্ঠ সূক্ষ্ম, হস্তপদাদি কঙ্কাল বিশিষ্ট, চক্ষু কোটরগত, মুখ মণ্ডল প্রতিভা শূণ্য। অকালে যুবার যৌবন বিলুপ্ত হইল, সকলেই যেন জরা মরণের আশ্রিত।"

পথ্যৌষধের কথা দূরে থাক, ক্ষুধায় খাদ্য ও তৃষ্ণায় জল না পেয়ে কত লোক প্রাণত্যাগ করল, যখন তখন কম্প দিয়ে জ্বর আসা ছিল এই রোগের লক্ষণ। কাঁথা চাপা দিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে রিষড়ার গড়গড়ী মহাশয়রা একটা পাঁচন প্রস্তুত করেন। সে যুগে এই পাঁচনের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করেছিলেন। চাতরা নিবাসী কিশোরীলাল সোমের 'শুরুচিরস' নামক ঔষধও এই রোগে বিশেষ উপকার প্রদর্শন করে। ডি, গুপ্তের পাঁচনের বোতল (জ্বরের যম) তখন প্রায় প্রতিঘরেই বিরাজ করত। সুখের বিষয় ১৮৮৪ খৃ: থেকে মহামারীর প্রকোপ অনেকাংশ হ্রাস পায়। ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্ট 'কুইনাইন' আবিষ্কার করেন এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ হেতু রিষড়ায় একটি অস্থায়ী "Epidemic Dispensary" খোলা হয়েছিল। (Report of Civil Surgeon, Hooghly for 1869. By R. F. Thompson Esqr. M. D.)-Imperial Gazetteer of India-By W. W. Hunter.

১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে 'রিষড়া ডিস্পেন্সারী' স্থাপিত হয়েছিল। মাহেশে অবস্থিত বর্ত্তমান 'মাহেশ-রিষড়া ডিস্পেন্সারী' বোধহয় তার পরবর্ত্তী রূপ। এই ডিস্পেন্সারীর অবস্থান সম্বন্ধে ডাঃ ক্রফোর্ডের মেডিকেল গেজেটিয়ারে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় :—

Page 335. Vol VII. Rishra Dispensary :—

"This dispensary is situated on the Grand Trunk Road; opposite the Mohesh-Jagannath khal, about a mile and a half from Serampore Railway station."

উক্ত ডিস্পেন্সারী সম্বন্ধে ক্রফোর্ড সাহেব একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন :—

"This Dispensary was opened in july 1873. In the dispensary report for 1880 is related a somewhat singular episode—the dispensary had to be closed during that year for about a month, as the Hospital Assistant had been sent to jail and the Compounder had absconded. The dispensary was vested in the Municipal Commissioners of Serampore by Govt. Notification of 23rd April 1880. An epidemic dispensary of which the present institution is practically a continuation, was in existence here from December 1872 to 15th February 1873."

মিঃ ওম্যালী সাহেবও তাঁর হুগলী জেলা বিবরণীতে (পৃঃ ১৩২) রিষড়া ডিস্পেন্সারীর প্রতিষ্ঠার কাল ১৮৭৩ খৃঃ বলে উল্লেখ করেছেন। রিষড়ার উক্ত 'এপিডেমিক ডিস্পেন্সারী' খোলার প্রয়োজনীয়তা থেকেই রিষড়া অঞ্চলে তৎকালীন ম্যালেরিয়ার প্রকোপের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

শ্রীরামপুর পৌর সভা প্রসঙ্গে

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে (Act III of 1864)। তৎকালে উত্তরে চাতরা থেকে দক্ষিণে কোন্নগর পর্যন্ত এই বিস্তৃত এলাকা পৌর সভার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং মোট চারটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। রিষড়া ও মাহেশকে নিয়ে সংযুক্তভাবে ৩নং ওয়ার্ড গঠিত হয়েছিল। এই সময় থেকেই চৌকিদারি ট্যাক্সের পরিবর্তে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ধার্য হয়।

প্রথমে অবশ্য গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই পৌর সভার অন্তর্ভুক্ত হবার বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু শিক্ষিত কয়েকজন ব্যক্তি দেশের তৎকালীন অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বসবাস করা অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী ট্যাক্স দিয়ে পৌর শাসনাধীনে অধিকতর সুখ সুবিধা ভোগ করা শ্রেয়স্কর বলে মনে করেছিলেন এবং তদনুযায়ী লোকমত সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রথম কয়েকটা বছর গবর্ণমেণ্ট মনোনীত সদস্যরাই এই পৌর সভার কার্য পরিচালনা করতেন এবং স্থানীয় মহকুমা শাসকগণই হতেন চেয়ারম্যান। ভাইস চেয়ারম্যানের পদ তখনও সৃষ্টি হয় নি। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব ১৮৭২ খৃঃ কিছুদিন এই পৌর সভার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দেশের মধ্যে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীকেই প্রথম কমিশনার নির্বাচনের অধিকার প্রদত্ত হয়েছিল বটে কিন্তু সেই অধিকার কার্যকরী হয়েছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে।

হুগলী জেলার বিবরণীতে উল্লিখিত আছে যে ঃ—

"...in 1873 was granted the right of electing Commissioners, being the first mofusil municipality to receive that privilage." (Bengal Dist, Gagtt-Hooghly-Page-226).

"The period of office of the Commissioners was fixed for three years—one third retiring each year in rotation." —Centenary Publication of the Mupty. 1965

ইতিমধ্যে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক হোল্ডিংএর বাৎসরিক মূল্যের শতকরা ৭৷৷. টাকা হারে কর ধার্য হয়। এই সময় পাইখানার ট্যাক্স বলে কিছু ছিল না এবং বর্ত্তমান আকারের পাইখানাও তখন নির্মিত হত না।

১৮৮৩ খৃঃ ১লা মার্চ্চ থেকে বাধ্যতা মূলক Vaccination প্রথা (Act. V of 1880) প্রবর্ত্তিত হয় এবং এর জন্যে যে চারটি কেন্দ্র

স্থাপিত হয়েছিল তার মধ্যে রিষড়া ডিস্পেন্সারী ছিল অন্যতম। জন্ম মৃত্যু রেজিষ্ট্রি করার প্রথাও প্রচলিত হয়েছিল (Ben. Act. IV of 1873) কিন্তু শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা চালু থাকায় রিষড়ার অধিবাসীদের যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তার নিবারণ কল্পে বহু লেখা লিখির পর ১৮৯০ খৃ: 'রিষড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে রেজিষ্ট্রি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। (Recently the Civil Hospital Assistant of the Rishra Dispensary was directed to register the births & deaths in part of Mahesh & Rishra ward.") পরবর্ত্তী কালে রিষড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের উপর রিষড়ার করদাতাগণের প্রদত্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ভারার্পণ করা হয় বলে শোনা যায়।

ইতিমধ্যে ১৮৭৪/৭৫ সালে হেষ্টিংস মিল স্থাপিত হওয়ার ফলে বস্তির আকার ও আয়তন বিশেষ ভাবেই বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং লোক সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা আবশ্যক।

হেষ্টিংস মিল বা নূতন কল

১৮৫৫ খৃঃ রিষড়ায় ভারতের প্রথম জুট মিল স্থাপিত হবার পর ১৫টা বছর উত্তীর্ণ হতে না হতে অপর একটি জুটমিল স্থাপিত হয়েছিল উক্ত নামে।

এতদ্দুদ্দেশ্যে বহুলোকের বিশেষ ক'রে দেওয়ানজী, গড়গড়ী ও ভট্টাচার্য মহাশয়দের বেশ কিছু জায়গাজমি বিক্রী হয়ে যায়। শোনা যায় সুরথ মল্লিকের বাগানও এই উপলক্ষে ক্রয় করা হয়।

আমেরিকান এয়ারবেশ কমাণ্ডার রচিত পুস্তিকায় প্রদত্ত রিষড়া হেষ্টিংস মিলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে ১৮৭০ খৃঃ বার্কমায়ার ব্রাদার্স ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভূসম্পত্তির অধিকাংশের

মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হন।

"During the late 18th Century, Warren Hastings acquired the land, which now bears his name, for use as a summer home. The deed, signed by Hastings himself was written in Persian. In 1870 the property came into the possession of the Birkmyre family, Glasgow, Scotland jute merchants. Four years later it became the first jute mill in all of India, and to-day is the largest jute mill in the world under one roof." (শ্রীমণীন্দ্র আশের সৌজন্যে)।

১৮৭০ খৃঃ থেকে চারটা বছর কেটে যায় মিলের নির্মাণ কার্য শেষ হতে এবং কলকব্জা বসাতে। ১৮৭৫ খৃঃ সরকারী বিবরণে উৎপাদন বৎসর বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন্নগর নিবাসী উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাসে' রিষড়া প্রসঙ্গে লিখেছেন :— "হেষ্টিংস জুটমিল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আডাম বার্কমায়ার ও তাঁহার ভ্রাতার দ্বারা স্থাপিত। এই কল প্রস্তুতের জন্য তাঁহারা প্রায় ৪ লক্ষ টাকা আনিয়াছিলেন, কিন্তু জমি খরিদ ও কল স্থাপন করিয়াও বহু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে ঐ উদ্বৃত্ত টাকায় একটি স্কুল স্থাপন করা হয়। ...... ঐ টাকা হইতে প্রাপ্ত ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে (বর্তমান K. C Dey Lane এর দক্ষিণে ও উত্তরে) দুইখণ্ড জমি খরিদ করেন"

হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও ১৮৭৫ খৃঃ উক্ত মিলের কার্যারম্ভ হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং হেষ্টিংস মিলের শ্রমিক সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ জ্ঞাপক একটি সারণীও প্রকাশিত হয় :—

Name.	Place	Year of opening	No of (in 1908)		Average daily No of operatives, 1908.	Out-turn in 1907-08
			Looms.	Spindle		
Hastings	Rishra	1875	750	15,580	5,822	609.249 Mds

উপরোক্ত সারণী দেখলেই বোঝা যায় যে কি পরিমাণ বাঙালী ও অবাঙালী শ্রমিক নিয়ে হেষ্টিংস মিলের কার্য আরম্ভ হয়েছিল। এই সমস্ত শ্রমিকদের অধিকাংশের জন্যে বহু ছোট বড় শ্রমিক-নিবাস গড়ে উঠেছিল জি, টি, রোডের পশ্চিম পার্শ্বে-খাস মহল জমিতে। পাড়ার মধ্যেও দেখা দিয়েছিল কিছু কিছু বাঙালী শ্রমিক ও কর্মচারীদের বাসোপযোগী গোলপাতার ছাউমি কুঠারী ঘর।

মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পরপর দু'দুটী বড় বড় জুটমিল স্থাপিত হওয়ার ফলে, যে অস্বাভাবিক জনস্ফীতি দেখা দিয়েছিল তার ফলে সমাজ জীবনে বহু দূষিত, অদূষিত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। গ্রাম্য পরিবেশ আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে শিল্প উপনগরী হিসাবে রিষড়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো একটা নূতন আকার ধারণ করে। নিঃশব্দ আকাশ বাতাস, মিলের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে প্রায় সর্বদাই মুখরিত এবং সুউচ্চ চিমনীর ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছোট খাট মেঘের আকারে উড়ে বেড়াত শূণ্য মার্গে। অসংখ্য ছোট ছোট কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ত গাছের পাতায়, ঘরের চালে ও পাকা ছাদের উপরে। ভোর থেকে ঘড়ির কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠত তীব্র বংশীধ্বনি, তার প্রথমটা ছিল ঘুম ভাঙানিয়া। তারপরে ডাক বাঁশী, আর তার পরের বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো কলকব্জা এক সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করত একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে। সবশেষে ছুটির বাঁশী। গায়ে-লাগা পাটের ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে লোকে বেরিয়ে আসত বদ্ধ আবহাওয়া থেকে রাস্তার উন্মুক্ত আলো বাতাসে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খাসমহল জমি লিজ বা ইজারা-বিলি আরম্ভ হয়েছিল ১৮৬৮ খৃঃ থেকে। তার পরবর্তী ইতিহাস হল :—

"......In 1880 on the expiry of the lease of Sreenath Sen, Govt. took khas possession of the Estate and under

order of the Collector a cadastral survey was made in 1880. A farming lease of the Estate was granted to M/s. Birkmyre Bros. for eighteen years commencing from 1st, April 1882."

বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিজ নেওয়ার পর অবাঙালী বাড়ীওয়ালা-দের উক্ত জমি, খণ্ড খণ্ড আকারে খাজনা বিলি করতে থাকেন এই সর্তে যে কেউ পাকা ছাদ আঁটতে পারবে না। কাজেই বাড়ীওয়ালারা চোঙ্‌খোলায় ছিটে বেড়ার সারিসারি লম্বা কামরা নির্মাণ ক'রে মিলের শ্রমিকদের ভাড়া বিলি আরম্ভ করেন। এর ফলে যে ঘন বসতির সৃষ্টি হয় তার অনিবার্য কারণ স্বরূপ একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হতে থাকে।

এদিকে ১৮৮৪/৮৫ খৃঃ কলেরা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়ে বস্তি অঞ্চলে বহু লোকের জীবনাবসান ঘটায়। এ সম্বন্ধে শ্রীরামপুর পৌর সভার ১৮৮৪/৮৫ খৃঃ বার্ষিক কার্য বিবরণীতে নিম্নরূপ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় :—

কলেরা মহামারী।

"There was an instance of a serious outbreak of Cholera in the Rishra & Mohesh Bustees in November 1884 causing many deaths. It was somewhat of an epidemic type. The S. D. O. Mr Colleor, the Civil Surgeon, Dr. Barkar and the municipal officers checked the progress of the disease."

উক্ত রোগের আক্রমণে পল্লীর মধ্যেও বহু ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন কৃতি যুবকের মধ্যে ৺শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। (মাহেশ বঙ্গ বিদ্যালয়ের ৪র্থ শিক্ষক ৺নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুত্র এবং ৺বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ সম্ভূত-পৃঃ ২৪৬)। তিনি শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটুইসনের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই শিক্ষকতা কার্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সম্বন্ধে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য-বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখ যোগ্য :—

In 1885 Babu Saroda Chandra Bose joined as Head Master for sometime and then Babu Sarat Chandra Banerjee of Rishra, a teacher of this school was promoted to the post of Head Master. ......Sarat Babu's untiring zeal and wholehearted devotion to duty, soon raised the school high in public estimation. He served the Institution with conspicuous ability till he was snatched away from his favourite field of activity in Oct. 1886, along with some other members of his family by an attack of Cholera, which was then raging in an epidemic form in the locality where he lived.

Short but rich was his tenure of office and his name is written in golden letters in the annals of this school. The man of action died in harness."

Annual publication of the School. 1964-65.

কালীকুমার দের একমাত্র পুত্র হীরালালের এই রোগে মৃত্যুর কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে (পৃঃ ২৬৫)। আরও একজন উল্লেখ যোগ্য যুবক হলেন বর্তমান ডাঃ পি, টি, সাহা ষ্ট্রীটের (বেলতলাবাড়ী) ৺বামাচরণ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র দক্ষিণা চরণ চক্রবর্তী, এফ, এ। তাঁর মৃত্যু হয় ১২।৭।৮৮ খৃঃ (শ্রীরামপুর পৌর সভার মৃত্যু রেজেষ্ট্রি বহি)।

উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ সঠিক নির্দ্ধারিত না হলেও শ্রীরামপুর পৌর সভার বার্ষিক কার্য বিবরণীতে তৎকালীন বস্তির

অধিবাসী শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাত্রা প্রণালীর উপর কটাক্ষপাত করা হয়।

"The unclean habits of these people, the insanitary condition they live and particularly of their dwellings may have a predisposing effect and may add to the verulence after the outbreak ; though it is impossible to say that these conditions caused the outbreak ......

These operatives, coming generally from the lower strata of society and unaccostomed to such large earning, are not prepared by education or social influence to usefully spend their surplus earnings which are generally spent in the liquor shop, or in other infamous places-."

ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করে একথা অবশ্যই উল্লেখ যোগ্য যে সামাজিক ও নৈতিক বাধাবন্ধন হীন অশিক্ষিত শ্রমিক ও সর্দারগণের জৈবিক প্রয়োজনে এবং গঙ্গার উভয় কূলবর্ত্তী মিল কারখানার এককভাবে জীবনযাত্রাকারী ইউরোপীয়ানগণের শয্যাসঙ্গিনী হবার বিনিময়ে অস্বাভাবিক অর্থ উপার্জনের আকর্ষণে রিষড়ায় দিন দিন বারবণিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের প্রলোভনে কিছু সংখ্যক বাঙালী বাবুও নৈতিক চরিত্র নষ্ট ক'রে ফেলেন।

বস্তি অঞ্চলে কলের জল।

১৮৫৫ খৃঃ থেকে ১৮৮৫/৮৬ সাল পর্যন্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। গঙ্গার জল ও পুষ্করিণীর জলই ছিল তাদের পানীয় ও নিত্য ব্যবহার্য। বড় পুষ্করিণী বলতে তখন যমুনা তলাও ও ধবিয়া তলাও বোঝাত। এই দুটী পুকুরের জলেই বহু লোক স্নান করত এবং ব্যস্ততার মধ্যে

অন্য জল সংগ্রহ করতে না পারলে ঐ পুকুরের জলই পান করত। পৌর সভার কার্য বিবরণীতে (১৮৮৬/৮৭) উল্লেখ পাওয়া যায় যে :—

"The municipal Commissioners have sometine ago applied to Govt. for grant of a tank in the khasmahal at Rishra. As it is situated within the densely populous bustees at Rishra, the municipal Commissioners expect to relieve the people of the bustee very considerably by reserving the tank for drinking purposes."

সুখের বিষয় ১৮৮৮ খৃ: ওয়েলিংটন ও হেষ্টিংস মিলের কর্তৃপক্ষ বস্তি অঞ্চলে কলের জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করায় উক্ত পুষ্করিণী সংস্কার বা সংরক্ষণের প্রয়োজন দূরীভূত হয়। পৌর সভা সে কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের ১৮৮৮/৮৯ খৃষ্টাব্দের কার্য বিবরণীতে :—

"The Managers of the Hastings and Welleington Mills supply the coolies residing in the neighbourhood with good drinking water which is a great boon to them." etc.

এর পর থেকেই যমুনা পুষ্করিণী সরকার কর্তৃক বাৎসরিক নীলাম ডাকে জমা দেওয়া প্রথার প্রচলন করেন। কেউ কেউ বলেন যে উক্ত পুষ্করিণী নাকি মাহেশের যদুনাথ অধিকারী মহাশয়ের সম্পত্তি ছিল তারপর বোধহয় যমুনা দেবীর নামে ইজারা নেওয়া হয় এবং তখন থেকেই যমুনা পুষ্করিণী বা যমুনা তলাও নামে অভিহিত হয়।

যাই হোক, বস্তি অঞ্চলে কলেরা মহামারীর প্রকোপ নিবারণ কল্পে উক্ত পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে (বর্তমান যোধন সিং রোড) সেই সময় ১টী বেদী ও ৭টী পিণ্ড স্থাপিত হয় এবং জগদম্বার পীঠ বলে পূজিত হতে থাকে। শোনা যায় পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই জগদম্বার পীঠ স্থাপিত আছে।

বড় মসজিদ।

ওয়েলিংটন জুট মিল কর্তৃপক্ষ বস্তি অঞ্চলে কলের জল সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে বড় মসজিদের ইমামের আবেদন ক্রমে উক্ত মসজিদের মধ্যে নমাজের পূর্বে হস্তপদাদি ধৌত করার সুবিধার্থে কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন বলে জানা যায়। এই বড় মসজিদটি স্থাপিত হয়েছিল আনুমানিক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮৪/৮৫ খৃঃ রচিত সরকারী রিভার সার্ভে ম্যাপে এই মসজিদটির অস্তিত্ব দেখান আছে।

"Of the Muslim places of worship the Morepukur Masjid, constructed in the middle of the 18th Century, and the Bara Masjid on the Grand Trunk Road built in 1870, deserve mention.

Hooghly Dist. Gaztr. A. K. Banerjee—1972.

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতিবাদ হিসাবে মূল শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে মাহেশ, রিষড়া ও কোন্নগর এই তিনটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি পৃথক পৌর সভা গঠনের প্রস্তাব এই সময় বেশ জোরদার হয়ে উঠে কিন্তু সে প্রস্তাব পৌর সদস্যগণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি এবং তার কারণ স্বরূপ ১৮৮৫/৮৬ খৃষ্টাব্দের কার্য বিবরণীতে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয় :—

"Another circumstances worthy of note was a petition from the Rate.payers' Association and some of the inhabitants of Mahes, Rishra & Connagar, praying for separation from the Serampore Municipality with the view of moving the Bengal Govt. to form a separate Municipality comprising the abovementioned villages. The

subject was carefully discussed by the Commissioners at a special meeting and the petition was rejected as the separation was undesirable and would be retrogade movement, advantagious to none. The incident caused some agitation at a time in the southern part of the municipality but the excitement was confined chiefly to Connogore, the inhabitants of which ward are much opposed to the introduction of the latrine sections of the Municipal Act."

বলা বাহুল্য, এই সময় থেকে আবার পাইখানার ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছিল যার ফলে কোন্নগর এলাকার অধিবাসীরা তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

পৌর সভার প্রথম নির্বাচন।

১৮৮৪ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর পৌরসভার প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন অবশ্য নির্বাচন প্রথা বা তার নিয়ম কানুন এখনকার মত জটিল ছিল না। শোনা যায়, ভোটদাতারা মনোমত প্রার্থীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পাত্রে (বড় বড় চিনেমাটির বয়ান) একটা করে কড়ি ফেলে দিতেন এবং সেই কড়ির সংখ্যাধিক্য অনুযায়ী ফলাফল ঘোষিত হত। রিষড়ায় নির্বাচন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল গড়গড়ী মহাশয়দের সদর বাড়ীতে। পৌর সভার মোট নির্বাচন যোগ্য ১২টি আসনের মধ্যে তিনটি নির্দ্দিষ্ট ছিল ৩নং ওয়ার্ডের জন্যে এবং এই তিনটি আসনের মধ্যে কখনও বা রিষড়া থেকে, কখনও বা মাহেশ থেকে ২জন সদস্য নির্বাচিত হতেন।

প্রথম নির্বাচনে রিষড়া থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৺বিহারী লাল মুখোপাধ্যায় (Govt. Pensioner)। সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ৩৫৩)। মনোনীত সদস্য হিসাবে ছিলেন হেষ্টিংস মিলের তদানীন্তন ম্যানেজার মি: জে, ফিনলে। যাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল বস্তির ছাই রাস্তাটি [বর্তমান গান্ধী সড়ক]।

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কোন্নগরের ডঃ ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র, এম, এ, এল, এল, ডি। এই সালেই নূতন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রচলিত হয়েছিল [Bengal Act. III of 1884], এবং এই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত। ১৮৮৮ খৃঃ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ডাঃ কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে, প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সৃষ্টিকর্তা দ্বারকানাথ ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন এবং "ভারত শ্রমজীবি' নামে একখানা মাসিক পত্রও প্রকাশ করেন।

শশীপদ বাবুর প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে আনন্দ মোহন, সুরেন্দ্র নাথ ও দ্বারকানাথ ছাত্র সমাজের সভ্যদের নিয়ে ১৮৭৯ খৃ: সিটি কলেজে একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮০ খৃঃ ভবানীপুর ও রিষড়াতে ঐ স্কুলের শাখা স্থাপন করেন।"

Collet's year Book-1880, p. p. 24.

উক্ত নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য উৎসাহিত করার কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

তখনও পর্যন্ত বস্তির মধ্যে পাকা রাস্তা বা পাকা ড্রেন তৈরী হয় নি। সেগুলো গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৬০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে। তার আগের বছর বার্কমায়ার ব্রাদার্সের লীজ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৯ সালে পুনরায় তাঁদের ত্রিশ

বৃহরের জন্যে লীজ দেওয়া হয়। (৺শিব নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)।
ইতিমধ্যে পৌরসভা কর্ত্তৃক জি, টি, রোডের ধারে ১৮৯০ খৃ: হেষ্টিংস মিলের কাছ থেকে চম্পা খাল পর্যন্ত ১৪১০´ ফুট লম্বা পাকা ড্রেন নির্মিত হয় :—

"Thus effecting one of the plague spots notorious for outbreaks of cholera, and also for the offensive elluria arising from the deposit of greenish silt. and the decompo- sing clay in the drain." R. A. Barkar-Chairman.

এই সময় এখানকার আমিন (পৌর শ্রমিকগণের কার্য তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন রিষড়া দেওয়ানজী বংশের ৺চুনীলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর উপর ছিল তখন বিরাট দায়িত্ব, কারণ বস্তির ভিতরের অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। কলেরা মহামারী রূপে দেখা দেওয়ার পর থেকে স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যসূচী বিশেষ ভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। কি জানি কি ত্রুটী ঘটেছিল তাঁর কাজে, তাই তিনি ১৯০২ সালে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন।

পৌর সভার বিভিন্ন কার্যাবলী।

১) ওয়েলিংটন জুট মিলের কাছে যে সমস্ত ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী যত্র তত্র জমায়েত হত সে গুলিকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত করার জন্যে পৌরসভা কর্তৃক ১৮৮৯ খৃ: 'ঠিকা গাড়ীর আড্ডা' শীর্ষক ছুটি সাইন বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল।

২) ১৮৯৩ খৃ: পচা ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করার জন্যে বিশেষ স্যানিটারী কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল এবং

৩) উক্ত সালেই বাগের খাল অঞ্চলে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে মুসলমান অধিবাসীদের জন্যে কবর স্থানরূপে নির্দ্ধারিত হয়েছিল।

৪) ১৯০৩ খৃঃ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে রেল লাইনের ধারে রাইলাণ্ড চ্যানেলের উন্নতি বিধান সম্পন্ন করা হয়।

৫) ১৯০৮ সালে আরোগ্য শালায় [ওয়ালস্ হাসপাতালে] খোলা হয়েছিল স্ত্রীলোকদের জন্যে একটি পৃথক বিভাগ।

প্লেগের আবির্ভাব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে ১৮৬৫ থেকে ১৯১৫ এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রিষড়ার অধিবাসীরা ছিলেন শ্রীরামপুর পৌর সভায় অন্তর্ভুক্ত। কাজেই রিষড়ার অনেক ঘটনাই তখন শ্রীরামপুরের নিজস্ব বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায় সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্টে।

১৮৯৮/৯৯ খৃঃ কলকাতায় যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে মহামারী রূপে তখন অনেকেই কলকাতা ছেড়ে স্থানান্তরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রীরামপুর ও রিষড়াতেও কিছু সংখ্যক লোক চলে এসেছিলেন, যার ফলে শ্রীরামপুর পৌর এলাকার মধ্যেও প্লেগ দেখা দিয়েছিল। রিষড়ায় নবীন পাকড়াশী লেনের গুরুপ্রসাদ কুণ্ডু মারা যান ঐ রোগে। শ্রীরামপুরেও দু'একটা মৃত্যু ঘটেছিল। প্রতিষেধক ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিল অবশ্য গবর্ণমেণ্ট থেকে। সুখের বিষয় এতদঞ্চলে মৃত্যু সংখ্যা ছিল নগণ্য। ঐ নিদারুণ ব্যাধি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

"The actual number of deaths from Plague recorded in the district has been 34 in 1899, 67 in 1900 & 58 in the first five months of 1901. There were however a number of local cases in Serampore town, originating from cases imported from Calcutta. (Crawford's Medl. Gaztr.—Page-491)"

অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার পূর্বে ১৮৭০/৭১ খৃঃ জিনিষ-পত্রের দর কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা নির্ভর যোগ্য

তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ—

দ্রব্যের নাম।	মণ প্রতি দর।	দ্রব্যের নাম।	মণ প্রতি দর।
বালাম চাল	··· দুই টাকা	খেঁজুরে গুড	··· চার টাকা বারো আনা
মুগি ,,	··· এক টাকা বার আনা	লবণ	··· চার টাকা চার আনা
আতপ ,,	··· দুই টাকা এগার আনা	গম	··· এক টাকা বারো আনা
অড়হর ডাল	··· এক টাকা তের আনা	ময়দা	··· দুই টাকা আট আনা
মুগ ,,	··· দুই টাকা বার আনা	সরিষা	··· তিন টাকা চৌদ্দ আনা
মুসুর ,,	··· এক টাকা চার আনা	যব	··· দুই টাকা দুই আনা
মটর ,,	··· এক টাকা ছয় আনা	তিশী	··· চার টাকা চার আনা
সরিষার তৈল	··· বার টাকা ছয় আনা	পাট	··· চার টাকা আট আনা
নারিকেল ,,	··· তের টাকা চৌদ্দ আনা	ঘৃত	··· চব্বিশ টাকা
রেড়ির ,,	··· দশ টাকা চার আনা		
কাশীর চিনি	··· দশ টাকা		
গরপাটা ,,	··· ছয় টাকা		

"সুলভ সমাচার" থেকে গৃহীত।

(১৮৭১)

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৯ শে চৈত্র ১৩৭৪। ইং ২/৪/৬৮।

সাধন কানন।

রিষড়া ষ্টেসন তখনও হয়নি। দক্ষিণে কোন্নগর ও উত্তরে শ্রীরামপুর ষ্টেসন দিয়েই তখন রেলপথে যাতায়াত চলত।

জগবন্ধু মৈত্র রচিত "প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী" নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে ১৭৯৩ শকাব্দে (১৮৭১/৭২ খৃষ্টাব্দে) কোন্নগর ষ্টেসনের নিকট মোড়পুকুর গ্রামে সাধন ভজনের সুবিধার জন্যে একটি উদ্যান ক্রয় ক'রে 'সাধন কানন' নাম করণ করা হয়।

১৩ই ফাল্গুন গোস্বামী মহাশয় ভক্তি সাধন ব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহার বাল্য বন্ধু সাধু অঘোর নাথ গুহ যোগ সাধন ব্রত, ৺গৌর গোবিন্দ রায় জ্ঞান সাধন ব্রত এবং গোস্বামী মহাশয়ের শাশুড়ী ঠাকুরাণী পূজণীয়া মুক্ত কেশী দেবী সেবা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ১৫০)

কাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত 'পরিত্রাতা বিজয় কৃষ্ণ' নামক গ্রন্থের ১৩২ খৃঃ উল্লেখ আছে :—

"রিষড়ার কাছে কেশবের 'সাধন কাননে' সাধনার আলোক-চিত্র আছে—অক্ষম চিত্র নেই, নেই কোন শক্তিমান শিল্পীর হাতের অঙ্কিত আলেখ্য। ওর জীবনী আছে, জীবন রসায়ন রচিত হয় নি। ...... কেশব একদিন বিজয়কে বলল 'তুমি ভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছ'।"

আচার্য কেশব চন্দ্রের জীবনীতে এই 'সাধান কানন' সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সারাংশ উল্লেখ যোগ্য।

"১৮৭৫ সালের ২৫ শে এপ্রিল তারিখের 'মিরারে' প্রকাশিত ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেখতে পাওয়া যায় যে · ব্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য যোগ সাধনার নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈদৃশ স্থানের অভাব বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতেছে।

মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু প্রসন্ন কুমার ঘোষের নিবাস স্থান। যাই হোক এই বন্ধুর যত্নে শ্রীরামপুরের গোস্বামীগণের নিকট হইতে সহস্র মুদ্রায় একটি উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্দ্র এই উদ্যানের 'সাধন কানন' নাম কারণ করিবেন স্থির করিলেন।" (পৃঃ ৮১৮)

এই উদ্যান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচন্দ্র মোড়পুকুর থেকে তাঁর ভাই কান্তিকে যে সমস্ত পত্র লেখেন তার মধ্যে মাত্র দু'খানা থেকে অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

(১) মোড়পুকুর ১০ মে, ১৮৭৬

প্রিয় কান্তি,

এখানকার জন্য একখানা ১০ ফুট টানা পাখা অদ্য চাই।

Second Hand হইলে ভাল হয়। খবরদার অধিক দামের না হয়, অথচ দেখিতে মন্দ না হয়। ইত্যাদি।

॥কেশবচন্দ্র সেন।”

(২)

১৯ শে মে (১৮৭৬) শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্রকে সাধন কানন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই নিমন্ত্রণ পত্র লেখেন :—

শুভাশীর্ব্বাদ,

আগামী কল্য সাধন কানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্বক মোড়পুকুরে আসিয়া উপাসনাদি করিবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।”

প্রতিষ্ঠা পর্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল নিম্নরূপ :—

“বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের নির্ঘোষ ব্যতীত অন্য কোন কোলাহল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার ৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে বৃক্ষ ছায়া তলে কুশাসনোপরি শান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন। অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনা কার্য সমাধা হইল। তদন্তর ‘ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্’ এই নামটি কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন সাধন স্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ করা হয়। উপাসনান্তে সাধন কানন সম্বন্ধে কেশব চন্দ্র বলেন :—

‘স্বর্গ কেমন? উদ্যানের ন্যায়। শাস্ত্রকারেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্গ উদ্যানের ন্যায়। যেখানে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হয়, পাখী সকল গান করে, বৃক্ষ সকল নবীন পল্লবে পরিশোভিত হয়।” ইত্যাদি

বাস্তবিক তখন সাধন কানন ছিল বহু দুর্লভ বৃক্ষরাজি শোভিত। হরিতকী, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। এছাড়া ছিল একটি সাধন বেদী, পুষ্করিণী এবং বাসোপযোগী এক-খানি পাকা ঘর।

“কেশবচন্দ্র সাধন কাননে থাকা কালীন প্রসন্ন কুমার ঘোষের

মাতা পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশব চন্দ্র ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ পদ্ধতি নিবদ্ধ করেন।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম মতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলেও প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুটুম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করতে বা আহারাদি করতে কুণ্ঠিত হন নি।'

সাধন কাননে অবস্থানকালে কেশবচন্দ্র নিজেদের উপাসনা ছাড়াও হরিনাম সংকীর্তনের মত ব্রহ্মসংকীর্তন করে বেড়াতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী শোভা সিংহ এম, এ তাঁর রচিত 'ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র' নামক পুস্তকে লিখেছেন :—"কেশব চন্দ্র মোড়পুকুর গ্রামে 'সাধনকানন' স্থাপন করেন। গ্রীষ্মকালে তিনি এই কাননে সপরিবারে বন্ধুগণসহ বাস করিতেন। এখানে তাঁহারা গাছ তলায় উপাসনা, কুটীরে বসিয়া রন্ধন এবং গ্রামের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ব্রহ্ম-সংকীর্তন করিয়া দিন কাটাইতেন।" ইত্যাদি

বলা বাহুল্য যে, সে যুগে বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে ব্রাহ্ম সমাজ ও তার অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি ছিলেন বহু সমালোচনার কেন্দ্রস্থল। সাধনকানন স্থাপন ও সাধন পদ্ধতি ছিল সুদূর প্রসারী। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র লাল নাথ মহাশয় তাঁর 'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য' নামক পুস্তকে লিখেছেন :—

"সাধন কানন (কোন্নগর শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান) যে প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও কর্ম জীবনের পীঠ ভূমি। এ সাধন কাননের অন্যতম কর্মসূচী গ্রামোদ্যোগ যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন ও গান্ধীজীর সেবাশ্রমকে। গ্রামকে আত্ম সম্পূর্ণ ও শ্রীসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে নবীন ভারত জন্মলাভ করবে, এই সুদূর প্রসারী দৃষ্টির দিক দিয়ে কেশবচন্দ্র আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন তাঁর উত্তর সূরী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সঙ্গে।"

(পৃঃ ২৬৪)

কোন্নগর ষ্টেশন থেকে মোড়পুকুর পর্যন্ত যাতায়াতের পথ ছিল তখন সম্পূর্ণ কাঁচা এবং বর্ষাকালে সেই পথ হয়ে উঠত কর্দ্দমাক্ত ও দুর্গম। এই অসুবিধার জন্যেই কেশবচন্দ্র কিছুদিন পরে উক্ত উদ্যান বিক্রী করে দিতে বাধ্য হন—শ্রীরামপুরের শ্রীজীবন চন্দ্র গোস্বামীকে। তিনি তখন সাধন কাননের নাম দেন 'জীবনারাম' বলে। তারপর আবার শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই উদ্যানটি কিনে নেন। এইভাবে বহু হস্তান্তরের ফলে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সাধন-কাননের মূল্যবান বৃক্ষাদি বিনষ্ট হতে থাকে এবং উদ্যানটি শ্রীহীন হয়ে পড়ে এবং আগাছাপূর্ণ হয়ে উঠে। কেশবচন্দ্রের উক্ত সাধনাপীঠের এবং তাঁর কর্মোদ্যোগের স্মৃতি রক্ষার্থে রিষড়ার পৌর সদস্যগণ ২৬/৭/৫৮ তারিখে সাধনকাননের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাটি 'মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন রোড' নামে অভিহিত করেন।

প্রকৃত পক্ষে উক্ত সাধন ভূমির ঐতিহ্যপূর্ণ স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে 'সাধন কাননের' বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কর্ম কুশলতার মাধ্যমে। তিনি ঐস্থানে গড়ে তুলেছেন এক সুদৃশ্য মন্দির যার মধ্যে বিরাজ করছেন . শ্রীশ্রীভগবানের পার্থ সারথি মূর্ত্তি যে বিগ্রহের সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হয়েছিল শাস্ত্রোক্ত বিধানে গত ১৯৬২ সালের ১৪ই জানুয়ারী রবিবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পুণ্য দিবসে—কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে।

প্রসঙ্গতঃ প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি ছিলেন মোড়পুকুরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের সন্তান। তাঁর পিতার নাম ছিল ধরণীধর ঘোষ। শোনা যায়, তিনি হাওড়া ষ্টেশনের হেড ক্লার্ক ছিলেন। রিষড়া থেকে কোন্নগর ষ্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন ধরে হেঁটে যাবার সময় পথিমধ্যে হাওড়া-

গামী কোন ট্রেন এসে পড়লে তাঁর রুমাল নাড়ার সংকেতে থেমে যেত এবং তিনি সেই ট্রেনে উঠে পড়তেন।

তাঁর মাতাঠাকুরাণী ছিলেন অত্যন্ত ভক্তিমতী ও দানশীলা। তৎকালীন প্রথানুযায়ী তিনি ব্রত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৩টি ভোজ্য নানাবিধ উপকরণে সাজিয়ে পুত্রকে ডেকে পাঠান দেখবার জন্যে। প্রসন্নকুমার সেই ভোজ্যগুলি দেখে বলেন যে অনিন্দ্যসুন্দর হয়েছে তবে এর উপর যদি একটি ক'রে হাফ্-গিনি দেওয়া যায় তা হলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। বলা বাহুল্য, তিনি মাতার নির্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণা স্বরূপ একটি ক'রে হাফ্-গিনি দিয়ে ভোজ্যগুলি এতদঞ্চলের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। (স্বর্গীয় রামলাল পাকড়াশী মহাশয়ের বিবৃতি ক্রমে)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেশবচন্দ্রের সান্নিধ্য ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলে মোড়পুকুর ও রিষড়া অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। রিষড়ার দাঁ বংশীয় মহেন্দ্র নাথ দাঁ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬৯ খৃঃ কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি বৃত্তি সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে ওকালতি পাশ ক'রে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। কলকাতা থেকে তিনি পরে আসাম তেজপুরে গিয়ে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বর্তমানে রিষড়ার সঙ্গে তাঁর বংশধরদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

মোড়পুকুরের সেন বংশ।

সেন বংশের, প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। শোনা যায় এই বংশের কৈলাস চন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন

তিনি ছিলেন ওয়েলিংটন জুটমিলের হেডক্লার্ক; শতাধিক বর্ষ পূর্বে। সেই কারণে তৎকালে মোড়পুকুরের বেশ কিছু সংখ্যক অধিবাসী ওয়েলিংটন জুটমিলে চাকরী পেয়ে যান।

কৈলাস চন্দ্রের সমাধিবেদী আজও বর্ত্তমান। তা থেকে জানা যায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১২৪১ সালের ৩১ শে ভাদ্র সোমবার (ইং ১৮৩৪) আর মৃত্যুর তারিখ হল ১০ই পৌষ সোমবার ১৩২৯ (১৯২৩ খৃঃ)।

তৎপুত্র অবিনাশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্ম তারিখ ঃ— ১২৭৮ বুধবার, ৭ই মাঘ। তিনি প্রথমে মিলিটারী একাউণ্টসে কাজ করতেন (৺শরৎচন্দ্র বন্দ্রোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহকর্মী) অল্পকাল মধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি সে চাকরী ত্যাগ ক'রে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং L. M. F. উপাধি পান। কিন্তু এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা তাঁর মনোমত না হওয়ায় তিনি স্বনামধন্য ডাঃ পালিতের সঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং কলকাতা ইটিলী রোডে ডিস্পেন্সারী খোলেন। শেষ বয়সে মোড়পুকুরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। ইহাদেরও বহু জায়গাজমি ছিল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরে তাঁর বিবাহ হয়। প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে ১৩৬৪ সালের ১২ই কার্ত্তিক (ইং ২৯/১০/৫৭) তিনি মোড়পুকুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর সহধর্মিনীর মৃত্যু হয় ২৫ শে চৈত্র ১৩৬৩ (ইং ৮/৪/৫৭) [উভয়ের সমাধি বেদীর শিলালিপির পাঠ।]

ডাক ঘরের কথা।

রিষড়ার অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ডাকঘরের ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ডাকঘর স্থাপিত

হবার পর থেকে রিষড়া ছিল ঐ পোষ্ট অফিসের অধীন। শ্রীরাম-পুরের পোষ্ট অফিসই ছিল এতদঞ্চলে বড় ডাকঘর।

বিখ্যাত বাংলা নাটক 'নীলদর্পণ' রচয়িতা ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ছিলেন তখন ঐ ডাক ঘরের পোষ্ট-মাষ্টার।

১৮৫৪ সালের ১লা অক্টোবর থেকেই প্রথম ডাক টিকিট চালু হয়েছিল আর তখন থেকেই লোকে আধআনা বা দু'পয়সা খরচায় চিঠি পাঠাতে পারত। কাজেই লোক মারফৎ চিঠি পাঠাবার প্রাচীন প্রথা আস্তে আস্তে উঠে গেল।

রিষড়া গ্রামের স্থানে স্থানে তখন লাল রংয়ের লোহার তৈরী গোলাল চিঠির বাক্সগুলো গাছের গুঁড়িতে বা বাড়ীর দেয়ালে হুক্ মেরে টাঙ্গানো থাকত; আর ডাক পিওন যথাসময়ে এসে তার ভেতর থেকে জমা পড়া চিঠিগুলো বের করে নিয়ে যেত।

এক পয়সার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাপ মারা পোষ্টকার্ড চালু হয়েছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আর তার পরের বছর থেকেই দু'পয়সার রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড বের হয়। পোষ্ট কার্ডের আয়তন ছিল এখনকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। সেকালের পোষ্টকার্ডে দু'পিঠে চিঠি লেখা চলত না। তার ফলে প্রথম প্রথম অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সে সম্বন্ধে ১৮/৭/৭৯ তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখেছিলেন যে কোন্ দিকে ঠিকানা লিখতে হবে সেটা সঠিকভাবে শিখে নিতে দু'এক বছর লেগে যাবে কাজেই যদি ভুল দিকেই ঠিকানা লেখা হয়ে যায় তাতে এমন কি এসে যায়? এছাড়া আরও কিছু কিছু ভুল ত্রুটি ও অসুবিধা প্রথম প্রথম দেখা দিয়েছিল কিন্তু কালক্রমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে যায়।

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আর তখন থেকেই রিষড়ার মিল কারখানার শ্রমিক এবং প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠাতে আরম্ভ করে। এর পূর্বে অবাঙালীরা দেশওয়ালী পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের মারফৎ কদাচিৎ টাকা দেশে

পাঠাতেন কিন্তু সবক্ষেত্রে সে টাকা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছত কিনা সন্দেহ তখন অবশ্য মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার খরচা (কমিশন) এখনকার মত নগদ দেবার ব্যবস্থা ছিল না মনি অর্ডার ফরমে সেই মূল্যের ডাক টিকিট লাগিয়ে দিতে হত। চিঠি যাতে মারা না যায় সেইজন্যে অনেকে ইচ্ছা করে বেয়ারিং চিঠি পাঠাত যাতে করে প্রাপকের কাছ থেকে ডবল মাশুল আদায় করে চিঠিখানা অন্ততঃ ডেলিভারি হয়।

পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক চালু হয়েছিল এর অনেক আগে অর্থাৎ ১৮৭০ সালে। কল-কারখানায় চাকুরী করার ফলে তখন যাদের হাতে দু চার টাকা জমত সেটা সঞ্চয় করবার একটা মস্ত বড় সুযোগ এসে গিয়েছিল। কলকাতার বড় বড় ব্যাঙ্ক ফেল করতে পারে কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেন্টের পরিচালনাধীন এই সমস্ত সেভিংস ব্যাঙ্ক কোনও দিন ফেল করে টাকা মারা যাবে না এই বিশ্বাস জন্মাবার ফলে তখন সকল শ্রেণীর লোকেই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে স্বল্প সঞ্চয়ের এই নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপন করেছিল। তার উপর আবার এই জমানো টাকার উপর তখন সুদ দেওয়া হত শতকরা তিন টাকা বারো আনা।

উপরোক্ত সব রকম সুযোগ সুবিধা চালু হলেও রিষড়ায় কোন পোষ্ট অফিস না থাকায় শ্রীরামপুরে গিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হত। আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহন করা তখন অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ও অসুবিধা জনক হয়ে পড়েছিল।

খাম পোষ্ট কার্ড বরং ডাকপিওনের কাছে কিনতে পাওয়া যেত কিম্বা কেউ কোর্ট কাছারি গেলে তাঁর মাধ্যমে আনিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু টাকা পাঠাতে বা টেলিগ্রাম করতে ছুটতে হত সেই শ্রীরামপুরের ডাক ঘরে।

সাধারণ লোকের মত ওয়েলিংটন ও হেষ্টিংস মিলের অসুবিধাও বড় কম ছিল না। বিলাতে পার্শেল পাঠাতে বা সেখান থেকে

'মেইল' আসতে অযথা দেরী হয়ে যেত। তার উপর আবার শ্রীরামপুর রেল গুদাম থেকে মালপত্র আনাতে হত। কাজেই উপরোক্ত দুটো অভাব পূরণের জন্যে মিল কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সচেষ্ট ছিলেন।

যতদূর জানা যায় ১৮৭৫/৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে রিষড়ার অধিবাসীরা এখানে পোষ্ট অফিস খোলার জন্যে আবেদন নিবেদন করতে থাকেন। দু দুটো মিলের শ্রমিক এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে লোক সংখ্যা তখন প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি। মাহেশ থেকেও চলতে থাকে ওখানে পোষ্ট অফিস খোলার প্রচেষ্টা। এই দোটানায় পড়ে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে যাবার মত অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করায় আবার চলতে লাগল নূতন ক'রে প্রচেষ্টা। জি, পি, ওর তদানীন্তন বিশিষ্ট কর্মচারী বিহারী লাল মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এখানকার উদ্যোক্তারা পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে গেলেন কোন তারিখে বিভাগীয় অফিসার সরেজমিনে তদন্তে আসবেন। উদ্দেশ্য, উভয় গ্রামের মধ্যে তুলনা মূলক ভারসাম্য যাচাই ক'রে দেখা।

রিষড়ার উদ্যোক্তারা তদন্তের পূর্বদিন মিল কারখানায় শ্রমিকদের এবং গ্রামবাসীদের দূর দূরান্তরের আত্মীয় স্বজনের নামে বহু চিঠি লিখে ডাক বাক্সগুলো ভরে দিলেন। মাহেশের অধিবাসীরা উক্ত কৌশল অবলম্বন করলে ফল কি দাঁড়াত বলা যায় না তবে দুটী বড় বড় মিলের শ্রমিকদের সংখ্যা এবং স্বদেশে টাকা পাঠাবার ও চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তার দৌলতে রিষড়ারই জয় জয়কার হল। ১৮৮৪/৮৫ খৃঃ রিষড়ায় পোষ্ট অফিস খোলা হল জি, টি, রোডের পূর্ব পার্শ্বে ৺ব্রজনাথ শ্রীমানির ভাড়াবাড়ীতে (প্রাক্তন আড়ৎ ঘর)। আর তখন থেকেই ডাক পিওন নিযুক্ত হয়েছিলেন রিষড়ার অধিবাসী ৺জহরলাল পাল। তিনি তখন একাই ঘুরে ঘুরে পাড়ায় পাড়ায়

চিঠি বিলি করে বেড়াতেন। এসম্বন্ধে লেখককে লিখিত বিভাগীয় অফিসারের নিম্নলিখিত চিঠিখানি উল্লেখযোগ্য।

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT.

No A-205

From : SUPDT. OF POST OFFICES.
HOOGHLY DN.
Dated Chinsurah, the 28th June, 1942.

Sir,

With reference to your letter dated 8-6-42, I have the honour to say that records relating to the opening of the post office having been destroyed it is not possible to trace the exact date on which the Rishra post office was started. It, however, appears from the available records that the post office was started between 1884 and 1885.

I have the honour etc.
Sd/- S K. Dasgupta.
For Superintendent.

শোনা যায়, রিষড়ার ডাক বাক্সগুলো ভরে তুলতে যত খাম পোষ্টকার্ড লেগেছিল তার দাম পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট নিবাসী ৺ধর্মদাস দত্ত মহাশয় একাই দিয়েছিলেন (তখন খামের দাম ছিল দু'পয়সা আর পোষ্টকার্ড এক পয়সা)। তিনি ছিলেন তখন ব্যবসায়ী এবং সেই সূত্রে কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত। যার ফলে ভারত বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী ৺বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ভূতনাথ পালের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা সুশীলা বালার। পরবর্তী কালে দত্ত মহাশয় এম, ই, স্কুলের হেড মাষ্টার হয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

থিয়েটার ক্লাব ও ব্যায়ামাগার।

কলকাতায় তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন বাংলা নাটক অভিনীত হচ্ছে। ছাত্রসমাজের দু'একজন সে থিয়েটার দেখেও এসেছেন। কলেজে পড়া ছেলেদের কাছে তার একটা সাড়া পড়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব মিলে গড়ে তুললেন একটা থিয়েটার ক্লাব। শোনা যায় ৺রামমদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন এই থিয়েটার ক্লাবে। 'রাবণ বধ,' 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি কয়েকখানা ভাল ভাল নাটক সুঅভিনয় করে-ছিলেন ক্লাবের সভ্যেরা। অনুকরণ প্রিয় বাঙালী জাতি; তাই এঁদের দেখাদেখি আরও দু'একটা ক্লাবের সৃষ্টি হয়েছিল অল্পকালের ব্যবধানে। তখন অবশ্য পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা তক্তাপোশ সাজিয়ে প্লাটফরম তৈরী করা হত। এখনকার মত ভাড়া পাওয়া যেত না।

থিয়েটার ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম সমিতি বা জিমন্যাষ্টিক ক্লাবও গড়ে উঠেছিল স্থানে স্থানে। দেওয়ানজী বংশের ৺চূণীলাল মুখোপাধ্যায়ের দলে ছিলেন অধরচন্দ্র দাঁ, ললিত মোহন দাঁ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ হড়, রামলাল পাকড়াশী, গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, মন্মথচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফকির চন্দ্র দাস, রামমদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এছাড়া আরও অনেক উৎসাহী যুবক ছিলেন এই সব জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের সভ্য। তখন অনেকে সকল রকম Bar Exercise এ বিলক্ষণ পটু ছিলেন। ৺পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে তিনি অধরচন্দ্র দাঁকে এক কালীন ৩০/৪০ টা Dead point দিতে দেখেছেন।

উপরোক্ত দলের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ৺নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, প্রবোধ মুখো, আশুতোষ দত্ত, প্রসন্ন দাস, যোগীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অপর একটি শক্তি সমিতি বা জিমন্যাষ্টিক পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। তখন প্রতিযোগিতা মূলক ব্যায়াম প্রদর্শনী ছিল না বটে, তবে একদমে

কে কতগুলো ডন, বৈঠক দিতে পারে সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বাজি রাখার প্রথা ছিল এবং সে বাজি রাখার মাধ্যম ছিল একসের সন্দেশ বা একসের রসগোল্লা। এই সমস্ত ব্যায়ামাগারের সভ্যরা নানা রকম গ্রাউণ্ড প্লেও আয়ত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

কুস্তির আখড়াও ছিল স্থানে স্থানে। সে সব আখড়ায় (আচ্ছাদন বিশিষ্ট) ওস্তাদ ধরে কুস্তির বিভিন্ন প্যাঁচ শিক্ষা করা হত ও তার নিয়মিত অনুশীলন করা হত। প্রায় এক হাত পুরু তেলপাটকরা হলুদ রংয়ের মাটির আসরে তখন ভোর থেকে কুস্তির লড়াইএর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আস্ফালনের ধুপ ধাপ শব্দ শোনা যেত। গুরুজীর নামে হাতের কব্জীতে বাঁধা হত কাল সুতোর রাখী।

চট্টোপাধ্যায় বংশ।

ইতি মধ্যে রিষড়ায় আরও যে কয়টি বিশিষ্ট পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের চট্টোপাধ্যায় বংশ অন্যতম। তাঁদের মুদ্রিত বংশ তালিকা থেকে জানা যায় যে কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষবংশ সম্ভূত রামহরির পুত্র কালী মোহন চট্টোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ২য় ভাগের শেষার্দ্ধে রিষড়ার জানকী জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনী বৈদেহী দেবীকে বিবাহ ক'রে এই গ্রামে বসবাস স্থাপন করেন। কালী মোহনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে ৪র্থ পুত্র ৺রসিক লাল মাহেশে বসু পাড়ায় পৃথকভাবে বাস স্থাপন করেন (পৃ: ৩৫৪)। পঞ্চম পুত্র অমৃতলাল ছিলেন নিঃসন্তান, আর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণলালের একমাত্র কন্যা বসন্ত কুমারী। বর্ত্তমান অধিবাসীরা জ্যেষ্ঠ প্রসন্ন কুমার ও তৃতীয় শ্যামাচরণের বংশধর। শ্যামাচরণের ছয় পুত্র-সুরথচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, হরিপদ ও নরহরি (কৈশোরে মৃত)। শ্যামাচরণের পত্নী চন্দ্রকালী দেবীই শ্বশুরালয়ে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। তখন অবশ্য চণ্ডীমণ্ডপেই

দেবীপূজা অনুষ্ঠিত হত। একবার বাজীর আগুনে চণ্ডীমণ্ডপের খড়ের চাল পুড়ে যাওয়ায় কিছুদিন পূজা বন্ধ থাকে। পরে আবার পাকা পূজার দালান (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) নির্মিত হলে উক্ত পূজা পুনঃ প্রবর্তিত হয় এবং অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

জ্যেষ্ঠ প্রসন্ন কুমারের দুই পুত্র — শরৎচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের পুত্রবধূ অর্থাৎ সতীশ চন্দ্রের স্ত্রী ৺হেমনলিনী দেবী (শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যয়ের মাতা) ১৯৪২ খৃঃ উক্ত পূজার দালানে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন। দুটি শক্তি পূজাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর যাবৎ হেমচন্দ্রের প্রপৌত্র শ্রীরমেশচন্দ্র (৺প্রফুল্ল কুমারের পুত্র) মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছানুক্রমে তাঁর নবনির্মিত অট্টালিকায় শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা পূজা সাড়ম্বরে সম্পন্ন করে আসছেন।

এই বংশের অপর এক সন্তান (অধুনা কালী ঘাট নিবাসী) ৺সুরেশচন্দ্র ছিলেন সরকারী পুলিশ বিভাগের একজন সুদক্ষ হস্তাক্ষর ও টিপসহি বিশেষজ্ঞ।

হেমচন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ডব্লুই, সি, ব্যানার্জ্জি) কন্যার সঙ্গে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অমূল্য কুমার ছিলেন এতদঞ্চলের বহু যাত্রা ও থিয়েটার পার্টির সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক।

রিষড়ার প্রসিদ্ধ অপেরা পার্টি (বান্ধব নাট্য সমাজ) কর্তৃক অভিনীত 'পার্থপ্রতিজ্ঞা' নাটকের অভিমন্যুর ভূমিকায় সুশ্রী গৌরকান্তি হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় অভিনয় ও তাঁর অকাল মৃত্যুর কথা আজও অনেকেরই স্মরণে আছে। এই ভূমিকায় পরবর্ত্তী অভিনয়কারী পঞ্চু দত্তর অকাল মৃত্যুর ফলে এই অভিশপ্ত ভূমিকায় অভিনয় করতে অপর কেউ সাহস করেনি। ১৩৩৭ সালে ৺পান্নালাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় যখন উক্ত নাটকটি নূতন আঙ্গিকে অভিনীত হয় তখন উক্ত চট্টোপাধ্যায় বংশের শ্রীঅভয় পদ চট্টোপাধ্যায় অভিমন্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সুখের বিষয় তিনি ভগবৎ কৃপায়

অদ্যাবধি সুস্থই আছেন। ২৬/৪/৪৯ খৃষ্টাব্দে রিষড়া পৌর সভা কর্তৃক চট্টোপাধ্যায়দিগের বাড়ীরপার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাটি, (দেওয়ানজী ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল থেকে) প্রফুল্ল কুমার চট্টোপাধ্যায় লেন নামে অভিহিত হয়। বলা বাহুল্য শ্রীরমেশচন্দ্র পিতার নামাঙ্কিত রাস্তাটির উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

মিল কারখানার দৌলতে দ্রুত রিষড়ার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। কি পল্লী অঞ্চলে, কি বস্তি অঞ্চলে ছোট বড় ব্যবসায়ীগণ বিপণী খুলতে আরম্ভ করেন। কলকাতা থেকে খরিদক্রীত মালপত্র সপ্তাহে দু'দিন অর্থাৎ সোমবার ও শুক্রবার নৌকা বোঝাই ক'রে রিষড়ার ঘাটে এসে পৌঁছত এবং দোকানে দোকানে সরবরাহ করা হত। এই উপলক্ষে কিছু সংখ্যক অবাঙালী মাঝি মাল্লাদের আগমন ও রোজগারের পথ খুলে যায়।

মহেন্দ্র নাথ শ্রীমানির পুত্র ৺তিনকড়ি শ্রীমানির বৃহৎ গোলদারী দোকান (বর্ত্তমান পুলিশ ফাঁড়ি) ছিল তখন এতদঞ্চলে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ২৪ পরগণার গরিফা (নৈহাটী) থেকে ৺যজ্ঞেশ্বর সাধুখাঁ রিষড়ায় এসে প্রথমে হেষ্টিংস মিলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বড় ফটকের সামনে একটি ছোট্ট দোকান ঘরে সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৯৭/৯৮ খৃ:) সেই সামান্য দোকানটি আস্তে আস্তে একটি বৃহৎ গোলদারী দোকানে পরিণত হয়। এই উন্নতির মূলে ছিল তাঁর সততা ও অধ্যবসায়।

তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি সুবৃহৎ পাকা আড়ত ও দোকানঘর নির্মাণ করান (যার সম্মুখভাগ পরে জি, টি, রোড ডাইভার্সানের

সময় সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়) এবং এতদঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত হন। ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি জীবনকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, বটকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ এই চারিপুত্র এবং দুইকন্যা রেখে পরলোক গমণ করেন। তাঁর পুত্রগণ পিতৃ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হন এবং কয়েকটি শাখা-ব্যবসায় স্থাপন করেন। তার মধ্যে মাহেশ রাইসমিল (১৯১৮) ভেদিয়া রাইস মিল, ফ্লাওয়ার মিল (১৯৩৮) নেতাজী ফ্লাওয়ার মিল (১৯৫৬) এবং যজ্ঞেশ্বর অয়েল মিল (১৯৫১) বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

১৩৩২ সাল থেকে তাঁর শ্যামনগর লেনে (বর্তমান শরৎচন্দ্র বসু লেন গঙ্গাতীরবর্ত্তী অট্টালিকায় পুত্রগণ কর্তৃক শ্রীশ্রী৺হর গৌরী মূর্ত্তির (শারদীয়া দুর্গা প্রতিমার পরিবর্ত্তে) পূজা প্রচলিত হয়। অদ্যাবধি নিষ্ঠাসহকারে সে পূজা প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

যজ্ঞেশ্বর সাধুখাঁর পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জীবনকৃষ্ণ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ১৩৬০ সালে অনাথ আশ্রমে 'জীবনকৃষ্ণ স্মৃতি মন্দির' নির্মাণ করে দেন তদীয় বংশধরগণ (শিলালিপি দ্রষ্টব্য)। কনিষ্ঠ রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে।

৺প্রাণ কৃষ্ণ সাধুখাঁ কৈলাস চন্দ্র লাহা ঘাট লেনে গৃহাদি নির্মাণ করে (কৃষ্ণভবন) ১৩৪০ সালে পৃথকভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তদীয় পুত্রগণ প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্বে উক্ত বাটীতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন করেন। সে পূজা অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে বিষয় সম্পত্তি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মধ্যে বিভাগ বণ্টন করে নেওয়ায় এক্ষণে সাধুখাঁ বংশধরগণ আপন আপন হিসাব মত ব্যবসায় পরিচালনা করছেন এবং নূতন নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করে পৃথকভাবে বসবাস করছেন।

তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে হরিদাস নন্দীর নামও

উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হাওড়া জেলায় বলুহাটি গ্রামে। ব্রহ্মা পূজার বারোয়ারী পরিচালন ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। গ্রামাধিষ্ঠাত্রী শ্রী শ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী-মাতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর তিনি নূতন মুকুট ও চাঁদমালা প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করে যান। তাঁর পুত্রগণ অদ্যাবধি সে ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

তাঁর দোকানের বিপরীত দিকে জি, টি, রোডের পূর্বপার্শ্বে ছিল রামকৃষ্ণ সাহার বৃহৎ দোকান। তিনি কয়েক বৎসর নিজ বাড়ীতে শ্রীশ্রীহরগৌরী পূজার অনুষ্ঠান করেন।

সতীশ চন্দ্র ও সুরেন্দ্র নাথ দত্ত এসেছিলেন জনাই থেকে। প্রথমে তাঁরা ভাড়া বাড়ীতে থেকে বস্তি অঞ্চলে জি, টি, রোডের পশ্চিমপার্শ্বে বেমেত্তি মশলা, ডাল ফড়াই ও গাছ গাছড়া জাতীয় ঔষধের দোকান করেন। কালক্রমে দুই ভায়ের কঠোর পরিশ্রম ও ও অধ্যবসায়ের ফলে সেই ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন এবং নবীন পাকড়াশী লেনে একটি পুরাতন বাটী ক্রয় করে উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি করেন।

কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র নাথ অপুত্রক বিধায় কয়েক বৎসর কার্তিক পূজা ও শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন করেন। তাঁর শ্যালক হলেন প্রসিদ্ধ সাঁতারু ও প্রশিক্ষক লোহিত কুমার দে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে ২৪/১১/৭৪ তারিখের 'যুগান্তরে' প্রশান্ত দাঁ লিখেছেন "বয়স সত্তর, কিন্তু চেহারা দেখে একেবারে বোঝবার উপায় নেই। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। নাম মোহিত দে, তবে ছোটদের কাছে আর পাড়ার ছেলেদের কাছে 'দাদু' বলেই অধিক পরিচিত।........অবসর সময়ে রিষড়ার বাড়ীর কাছে গঙ্গায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাঁতার শেখান।"

এই প্রসঙ্গে শুবোধ কুমার দাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। পূর্ণ চন্দ্র দাঁর প্রতিষ্ঠিত বড় বাজারে প্রবেশের মুখে তিনি যে ব্যবসার

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন সেটি ছিল সব রকম জিনিষ বিক্রির একটি নির্ভর যোগ্য বিপণী। বলা বাহুল্য কালক্রমে উক্ত দোকানটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর পুত্রদ্বয় সেই ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিলেন। অধুনা জ্যেষ্ঠ কালী কুমার দাঁ ৩নং ফটকের সম্মুখে কয়েকখানা দোকান স্থাপন করে পুত্রগণসহ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান আছেন। পুরাতন দোকানটি অপর পুত্র জগন্নাথ দাঁ পরিচংলনা করলেও অবাঙালী ক্রেতা মহলে এখনও কালী বাবুর দোকান বলেপরিচিত।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীকাত্তিক চন্দ্র মণ্ডলের পিতা ৺পরমানন্দ মণ্ডল কর্ত্তৃক রিষড়ায় একটি ব্যবসার প্রতিষ্ঠান। পূর্ব্বে কলকাতায় এঁদের কারবার ছিল। ৺তিনকড়ি শ্রীমানির প্রসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির পর সেই গৃহেই এঁদের ব্যবসায়ের সুত্রপাত। বর্ত্তমানে রাস্তার অপর পার্শ্বে সেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি, বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

হাটবাজারের কথা।

ছাই রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে (বর্ত্তমান গান্ধী সড়ক) তখন ক্ষেত্র মোহন সাহার বাজার বসত। এটা ছিল সাপ্তাহিক হাটের মত। কাপড়, গামছা, চাল, ডাল ও তৈজসপত্র প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হত। কল কারখানার সাপ্তাহিক বেতন প্রাপ্তির দিন অনুযায়ী এই হাটের জীবন-কাল নির্দ্ধারিত হত।

বার্কমায়ার ব্রাদার্স'ও (বর্ত্তমান শিবদাস ব্যানার্জি ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে) একটি বাজার বসিয়েছিলেন প্রধানতঃ মিলের শ্রমিকদের সুবিধার্থে কিন্তু সাধারণ লোকেও ঐ বাজারের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। Tarpaulin Deptt. খোলার সময় (মতান্তরে Septic Tank) বসাবার জন্যে উক্ত বাজার (কল বাজার নামে পরিচিত) স্থানান্তরিত

করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সুযোগে ৺পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয় বর্তমান টিন বাজার বা বড়বাজার স্থাপন করেন।

ওম্যালী সাহেব তাঁর হুগলী জেলা বিবরণীতে লিখেছেন :—

"Rishra is a thriving quarter with two large jute mills (Wellington & Hastings), which are connected with the Rishra Station by a siding. The majority of the mill-hands live on the other side of the Trunk Road in a Busti situated on 'Khas Mahal' land. They get their drinking from hydiants snpplied with filtered water by the mills and a large private market supplies them wlth provisions."

ইতিপূর্বে হ্যারিকেন ল্যাণ্টার্ণ ও কেরোসিন তেল আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্ধকারের রাজত্ব খানিকটা ফিকে হতে আরম্ভ করেছিল। জার্মাণীর তৈরী 'ডিজ' (DITZ) ল্যাণ্টার্ণের অবস্থান তখন ঘরে ঘরে। দোকানে দোকানে ঝুলতে থাকে গোল চাকার মত ঢাকনা দেওয়া ১৪ নং ঝুলন বাতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :— "সূর্য গেল অস্তাচলে, আঁধার ঘনালো ; হেথা হোথা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো জ্বলিতে জ্বলিতে যায়। ··· মুদির দোকানে টিম্ টিম্ ক'রে দীপ জ্বলে একথানে।" হ্যারিকেন লণ্ঠনের উপকারিতা এবং অবদানের কথা ঘন ঘন লোড শেডিংএর যুগে সকলেই বিশেষ ভাবে অনুধাবন করেছেন।

শ্রীরামপুর পৌর সভার দ্বিতীয় পর্ব।

বিহারী বাবুর পরে যাঁরা শ্রীরামপুর পৌর সভার নির্বাচিত সদস্য হিসাবে জনসেবা মূলক কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বামন দাস

বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।

বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের বংশ পরিচয় ও পিতৃ পরিচয় ইতি পূর্ব্বেই আলোচিত হয়েছে (পৃঃ ৩৪৩)।

১৮৯০ খৃঃ সিটি কলেজ থেকে আইন পাশ করার পর তিনি প্রথমে চুঁচুড়া কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরেই শ্রীরামপুর দেওয়ানি আদালতে যোগদান করেন এবং আজীবন এই আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর একখানি তিনচাকার সাইকেল ছিল, রিষড়া ষ্টেশন স্থাপিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সাইকেলে চেপে তিনি শ্রীরামপুর কাছারিতে যাতায়াত করতেন। দু'চাকার সাইকেলও তখন প্রচলিত হয়েছিল বটে কিন্তু তার দুটো চাকার আকার ছিল অত্যন্ত অসমান। পিছনের চাকাখানা হত খুব ছোট। এই কারণে সেই বাইসাইকেল চালানো খুব সহজসাধ্য ছিল না। অনিসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ উক্ত ধরণের দু'চাকার সাইকেলের প্রতিকৃতি দেখতে পাবেন ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' (প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়)।

পিতার ন্যায় ইংরেজি ভাষায় বামনদাস বাবুর ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান ও পারদর্শিতা। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি ছিলেন স্যর আশুতোষের সহপাঠী। উভয়ের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সহযোগ এবং অন্তরঙ্গ মেলা মেশা। লর্ড রিপনের সম্বর্দ্ধনা সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে যোগদানকারীদের মধ্যে তাঁরা দু'জনেই ছিলেন প্রধানতম।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর পৌর সভার নির্বাচনে তিনি ৩ নং ওয়ার্ড থেকে জয়ী হন। তখন এই ভোটের ব্যাপার নিয়ে মাহেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বেশ একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। পৌর সদস্য নির্বাচিত হবার পর থেকে তিনি রাস্তা, ঘাট, ড্রেন ও আলোর উন্নতি করে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অনেক দূরে দূরে কাঠের পোষ্টের উপর টিনের ফ্রেমের চারপাশে কাঁচের আবরণ এবং মাথায় চূড়াকৃতি টুপি লাগানো

কেরোসিন তেলের আলোগুলো মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলত। সে আলো আবার সারারাত জ্বলত না। মধ্য রাত্রের আগেই নিভে যেত। এই আলোর সাহায্যে পথ চলার খুব একটা সুবিধা না হলেও পল্লীর মধ্যে মনুষ্যবাসের অস্তিত্বের সম্বন্ধে চেতনা জাগার ফলে মানসিক ভয় খানিকটা দূরীভূত হত।

শোনা যায়, ১৮৯৩/৯৪ সালে কোরবানির ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রিষড়ায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রসার রোধ কল্পে বামনদাস বাবু জেলা শাসকের নিকট টেলিগ্রাম ক'রে মাহেশ ও রিষড়ার পার ঘাটগুলো সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেন যাতে করে খড়দহ, টিটাগড় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে লোক আমদানি ক'রে উক্ত দাঙ্গায় ইন্ধন যোগান সম্ভব না হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাহেশের শ্রীনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যুর ফলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন হেষ্টিংস মিলের হেড-ক্লার্ক রিষড়ার দাঁ বংশের ৺পূর্ণচন্দ্র দাঁ মহাশয়। উভয়ের একত্র সমাবেশ—সে এক যুগান্তকারী ঘটনা। লিখিয়ে পড়িয়ে এবং আইন কানুনে সিদ্ধ হস্ত বামনদাস বাবুর সঙ্গে, অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী নীরব কর্মী পূর্ণ চন্দ্রের কর্ম প্রতিভার একত্র মিলনে অসম্ভবও সম্ভব হতে চলল।

রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপন ব্যাপারে পূর্ণবাবু পৌর সদস্য নির্বাচিত হবার পূর্বে থেকেই বামনদাস বাবুর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন। মিল কর্তৃপক্ষের স্বার্থ ও ছিল এর সঙ্গে জড়িত। তাঁরাও চাইছিলেন রিষড়ায় রেলওয়ে ষ্টেসন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাইডিং যার মাধ্যমে তাঁদের প্রয়োজনীয় কয়লা এবং লোহা লক্কড় সরাসরি মিলের মধ্যে আনা যায়।

রিষড়া রেলওয়ে ষ্টেসন।

মাহেশের অধিবাসীরাও ৺প্রসন্ন কুমার দাসকে পুরোভাগে নিয়ে মাহেশের রথ, স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহু যাত্রী সমাগমের যুক্তিতে

মাহেশে রেলওয়ে ষ্টেসন স্থাপনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। রিষড়ার অধিবাসীদের পক্ষেও যুক্তির অভাব ছিল না। দু'দুটো বড় বড় জুট মিলের ফার্ষ্ট ক্লাশ ইউরোপীয়ান প্যাসেঞ্জার এবং নিত্য কলকাতায় সদাগরী অফিসে যোগদানকারী চাকুরিয়ার সংখ্যাধিক্য তার উপর আবার বস্তির মধ্যে রামধনি সার বিরাট চালের কারবার উপলক্ষে বাইরে থেকে চাল আমদানি এবং মিলে সাইডিংএর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ছিল তাঁদের স্বপক্ষে।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত গুজব রটে গেল যে ষ্টেসন হবে বটে তবে তার নাম রিষড়া না হয়ে হবে মাহেশ এবং প্লাটফরম হবে বর্ত্তমান ৪নং ফটকের কাছে। বামনদাস বাবুর দল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং বার্কমায়ার ব্রাদার্সের পরিচিত উপর মহলের সাহেব সুবার সুপারিশের জোরে শেষ পর্যন্ত রিষড়ার গৌরব অক্ষুন্ন রইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ট্রাফিক ম্যানেজার মিঃ ড্রিং সাহেব এসে খোঁটা মেরে দিয়ে গেলেন। মাহেশের অধিবাসীদের মনস্তুষ্টি এবং কথঞ্চিৎ সুবিধার্থে প্ল্যাটফরম ঠিক তিন নম্বর গেটের কাছে না হয়ে একটু উত্তর দিকে সরিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে অবশ্য রিষড়ায় ফ্লাগ ষ্টেশনে গাড়ী থামতে আরম্ভ করে। ১৯০১ খৃঃ ১লা জানুয়ারী রিষড়া ষ্টেসনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয় বহু গণ্যমান্য অতিথি ও সাহেব সুবার উপস্থিতিতে।

যতদূর জানা যায়, এই রেলষ্টেসন স্থাপন উপলক্ষে রিষড়ার বহু কৃতি সন্তানই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—স্বর্গীয় রামলাল পাকড়াশী, প্রিয়নাথ বন্দোপাধ্যায়, চারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং মিঃ হাচিসন্ (বার্ক মায়ার ব্রাদার্সের কলকাতায় হেড অফিসের বড়কর্ত্তা)। সহযোগিতায় ছিলেন ৺বিহারী লাল মুখোপাধ্যায় ও রেলের তদানীন্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। (৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতিক্রমে)।

এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন মহকুমা শাসক মিঃ জে, ক্রাভেন সাহেবের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ রিষড়ার স্বপক্ষে তাঁর যুক্তিপূর্ণ সুপারিশ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করেন পৌরসভার সদস্যবৃন্দ—হেষ্টিংস মিলের কাছ থেকে রিষড়া ওভারব্রীজ পর্যন্ত নূতন রাস্তাটি 'ক্রাভেন রোড' (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোড) নামাকরণের মাধ্যমে।

শোনা যায়, রিষড়া ষ্টেসন খোলার দিন রিষড়ার অধিবাসীদের (দীর্ঘ প্রতীক্ষিত) আনন্দের সীমা ছিল না এবং তদুপলক্ষে স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দিরে এবং কালীঘাটে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করা হয়। কোন্নগর স্কুলের প্রায় দেড়শত ছাত্র সেদিন ট্রেনে চেপে স্কুলে যোগদান করে। তখন রিষড়া থেকে হাওড়ার ভাড়া ছিল মাত্র দু' আনা। বাংলা ১৩০৭ সালে শ্রীরামপুর পঞ্জিকার ডাইরেক্টরীতে এবং রেলের এক পয়সা দামের চটি টাইম টেবলে রিষড়া রেল ষ্টেসনের নাম তখন থেকেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে।

গঙ্গায় হাঙ্গর কুমীরের উৎপাত।

গঙ্গায় তখন মাঝে মাঝে হাঙ্গর কুমীরের উৎপাতে কারও কারও 'হাত' 'পা' কাটা যেত। বিশেষ করে বর্ষারম্ভে মিলের কার্য শেষে সন্ধ্যার সময় যখন শ্রমিকরা গঙ্গার জলে স্নানাদির জন্যে অবতরণ করতেন তখন ঘটত এই সব জল জন্তুদের আক্রমণ। ১৮৮৮ সালে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় স্নানার্থীদের সাবধান ক'রে দেবার জন্যে নিম্নলিখিত মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়:— "SHARKS-Sharks (Hangars) in the River Hooghly have become a dread to the inhabitants of Chandernagore, Bhadreswar and other adjacent places."
—16. 5. 88.

জেলেদের জালে কখনও কখনও হাঙ্গর ধরা পড়ত কিন্তু বহু

চেষ্টাতেও কুমীর ধরা পড়ত না। শোনা যায়, হেষ্টিংস মিল কর্তৃপক্ষ কুমীর ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং মাহেশের জনৈক অধিবাসী বহু কৌশলে গঙ্গা থেকে একটা বড় কুমীর শিকার করে সেই পুরস্কার লাভ করেন। পল্লীর মধ্যেও সেকালে পুকুর ডোবায় মেছো কুমীরের উপদ্রব ছিল এবং শ্রীরামপুর পৌর সভা কর্তৃক বস্তির মধ্যে একজন মুসলমানকে মেছো কুমীর মারার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন বৈকালে যে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল তা ছিল যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমনই অভূতপূর্ব ক্ষতিকারক। সর্বংসহা ধরিত্রী থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিলেন, যার ফলে কেবলমাত্র জীর্ণ পুরাতন গৃহাদিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, স্থানে স্থানে গোশালা ভেঙ্গে পড়ায় খোঁটায় আবদ্ধ কিছু গবাদি পশুও বিনষ্ট হয়েছিল। পুষ্করিণীর জল এমন ভীষণ ভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল যে বড় বড় মাছগুলো ডাঙ্গায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতলের কতকগুলো গৃহও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। (শতবার্ষিকী পুস্তিকা।)

শতাব্দীর শীতলতম দিন।

এরপরই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তাপাঙ্ক নেমে গিয়েছিল ৬'৮ সেন্টিগ্রেডে। এরকম হাড় কাঁপানো শীত ইতিপূর্বে কেউ কখনও অনুভব করেন নি। সেকালে লোকে ঘরের চালে লাউডগার উপর খড়িগুঁড়োর মত এক রকম পদার্থ পড়তে দেখে-

ছিলেন, ইংরেজীতে যাকে বলে Frost. (আনন্দবাজার ৮/১/৭২)।

চায়ের প্রচলন তখন ঘরে ঘরে, বিশেষ ক'রে শীত কালে এক পয়সায় এক কাপ গরম চা শ্রমিক শ্রেণীদের মধ্যে নূতন শক্তির যোগান দিত। 'টি বোর্ডের' তরফ থেকে তখন চায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই প্রচার কার্য চালান হত। লোকে ভাবত 'চা' খেলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। চা সম্বন্ধে সেই জনপ্রিয় কবিতাটি প্রায় অনেকেরই জানা আছে :—

"প্রথম পিয়ালা মোর কণ্ঠ ভিজায়,
দ্বিতীয় আমার জড়তা নাশে ;
তৃতীয় পেয়ালা মশগুল করে,
মজলিশ ক্রমে জমিয়া আসে।" ইত্যাদি।

'চায়ের পেয়ালা'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

হেষ্টিংস মিল কর্তৃপক্ষ তাঁদের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্যে বড় ফটকের ভিতরে অনতিদূরে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্যে দুটী পৃথক চায়ের ষ্টল তৈরী করে দিয়েছিলেন। দেওয়ানজী বংশের ৺মাখমলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন দীর্ঘকাল এই 'টি-ষ্টলের' সর্বজন পরিচিত অধিস্বামী। মিলের ভিতরে ধূমপান ছিল নিষিদ্ধ, কাজেই বাবুরা এইখানে বসে গোপনে ধূমপান ও চা-পান উভয়ই সেরে নিতেন।

চায়ের দোকানের দক্ষিণে নিমগাছটার কাছেই ছিল তখন উক্ত মিলের ডিস্পেন্সারী। রিষড়ার লাহা বংশের কুঞ্জ লাহা মহাশয় কিছুদিন ডাক্তারী করেছিলেন বলে শোনা যায়। তারপর আসেন হিমাংশু শেখর ব্যানার্জ্জি (উত্তরপাড়া)। কম্পাউণ্ডার ছিলেন দাঁ বংশের ৺উপেন্দ্র নাথ দাঁ। (গোদা সার্জেন বলে পরিচিত)। এরপর আসেন রিষড়ার লাহা বংশের ডাক্তার প্রাণতোষ লাহা এল, এম, এস, সে হ'ল বিংশ শতাব্দীর কথা। তাঁর সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। (শ্রীনন্দলাল চন্দ্রের বিবৃতি ক্রমে)।

উপরোক্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর দিনগুলো শেষ হয়ে জন্মলাভ করে রিষড়ার ইতিহাসের বর্তমান বিংশ শতাব্দীর আলো ঝলমল দিন গুলো।

—:0:—

প্রমাণ পঞ্জী

১। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ--বিনয় ঘোষ।

২। শিবচন্দ্র দেবের জীবনী—ত্রিপুরা শঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

৩। সেকালের যান বাহন—যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪। হুগলী জেলার ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (বসুমতী)

৫। মাহেশ মঙ্গল—সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৬। জগদ্দল—সমরেশ বসু।

৭। স্মৃতি চারণা (পাণ্ডুলিপি)—পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ তালিকা (১নং)—৺সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

৯। প্রাচীন স্মৃতি। (বিবৃতি)—শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী—শ্রীমনোজ মোহন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

১১। প্রাচীন স্মৃতি। —শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।

১২। দ্বিতীয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ তালিকা—শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

১৩। প্রাচীন স্মৃতি,—শ্রীহবিচবণ বন্দ্যোপাধ্যায।

১৪। স্মৃতি চারণা (বিবৃতি)—শ্রীশিবদাস মান্না।

১৫। মুখোপাধ্যায় বংশ তালিকা। —শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েব সৌজন্যে।

১৬। পূর্বস্মৃতি—৺বসন্তকুমাব গড়গড়ী।

১৭। পুজা পার্বণ—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

১৮। পত্রাবলী—শ্রীললিত কুমার পাকড়াশী।

১৯। আত্মজীবনী—৺কালীচবণ পাকড়াশী (বোম্বে)

২০। হুগলী জেলার ইতিহাস—শ্রীসুধীব কুমাব মিত্র।

২১। Raja Digambar Mitra C. S. I.—Bhola Nath Chunder.

২২। বিবৃতি—অনিল সেন।

২৩। চট্টোপাধ্যায় ব'শ তালিকা। —শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাযেব সৌজন্যে।

২৪। ডাক টিকিটেব জন্ম কথা। —শচীবিলাস বায চৌধুবী।